চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

Persian Poet of Universal Method Hafiz Shirazi & His spiritual love

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আছমা আক্তার

এম. ফিল গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম

Persian Poet of Universal Method Hafiz Shirazi & His spiritual love

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

রচনা ও উপস্থাপনায়
আছমা আক্তার
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নম্বর : ২২০, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক আছমা আক্তার কর্তৃক "চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম"(***Persian Poet of Universal Method Hafiz Shirazi & His spiritual love)***শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি আছমা আক্তার-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবে রচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি পুরোপুরি পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড.কে এম সাইফুল ইসলাম খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে,"চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম"(***Persian Poet of Universal Method Hafiz Shirazi & His spiritual love)*** শীর্ষক এ এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও ডিগ্রি লাভের জন্য প্রকাশ করিনি।

(আছমা আক্তার)
এম.ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ১-৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : হাফিয পরিচিতি ৩৮-৮০

তৃতীয় অধ্যায় : হাফিযের অধ্যাত্মপ্রেম ৮১-১৭৯

চতুর্থ অধ্যায় : হাফিযের মূল্যায়ন ১৮০-১৯৬

উপসংহার ১৯৭

গ্রন্থপঞ্জি১৯৮-২০২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিজ শিরাজি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের তত্ত্বাবধানে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের এম. ফিল. গবেষণাপত্র রূপে রচিত। এর সামগ্রিক পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে তাঁর নির্দেশনা-অনুপ্রেরণা ছিল আমার পাথেয়স্বরূপ।

চিরায়ত ধারার ফারসি কবি হাফিয শিরাযি ও তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সর্বমোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এছাড়া রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ'। এতে সূচনালগ্ন থেকে কবি হাফিয শিরাযির সমকাল পর্যন্ত ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন যুগের কবি-সাহিত্যিকদের বিশেষত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও স্থান পেয়েছে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'হাফিয পরিচিতি'। এতে কবি হাফিয শিরাযির জন্ম, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, কর্ম ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণ এ-অধ্যায়ে রয়েছে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'হাফিযের অধ্যাত্মপ্রেম'। প্রকৃতপক্ষে, কবি হাফিয শিরাযির মূল সাহিত্যকর্ম *দিভা'ন* অবলম্বনে তাঁর অধ্যাত্মপ্রেমের স্বরূপ-নির্ণয় বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য। তাঁর কাব্যকর্মে প্রতিফলিত তাঁর জীবনদর্শনের বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য কবির সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে তাঁর কাব্যের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'হাফিযের মূল্যায়ন'। সৃজনশীল কাব্যকর্মের মাধ্যমে চতুর্দশ শতাব্দীর পারস্য-দেশ আলোকিত করা কবি হাফিয কালক্রমে বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদে পরিণত হ'ন। আজও তাঁর কাব্যরসের উপভোগ্যতা সর্বত্র দেদীপ্যমান। তাঁর সেই ঔজ্জ্বল্যের যে-মূল্যায়ন ও প্রশস্তি খ্যাতিমান সমালোচকদের এবং তাঁর উত্তরসুরীদের দ্বারা কীর্তিত হয়েছে তার একটি সারমর্ম উপস্থিত করা হয়েছে অধ্যায়টিতে।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার-লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। আমার শ্রদ্ধেয় গবেষণা-নির্দেশক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আমাকে তথ্য, বই ও পরামর্শ দ্বারা উপকৃত করেছেন আমার শিক্ষকমন্ডলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ড. আবদুস সবুর খান এবং ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক ড. মোঃ নূরে আলম ফারসি টাইপের ব্যাপারে বিশেষভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আহসানুল হাদী এবং মেহেদি হাসান এর পরামর্শ ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। আমার স্নেহের অনুজ রাশেদুল হাসান অশেষ শ্রম ও একাগ্রতা দিয়ে আমার সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে দিয়েছে। এঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

২২ জানুয়ারি, ২০১৬ আছমা আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

একটি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে সেই ভাষাগোষ্ঠির জনসংখ্যার পরিমাণের ওপর নয়, সে-ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মের সার্থকতার ওপর। পৃথিবীর এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নাম পারস্য সভ্যতা। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয় সভ্যতার ওপর পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তার করে সেই যে পারস্য সভ্যতার উত্থান তা কালক্রমে অগ্রগতি আর বিকাশমানতার গৌরবময় পর্যায়-পরম্পরার মধ্য দিয়ে বর্তমানের সমৃদ্ধিতে উপনীত হয়েছে। প্রকৃতি, শিল্প-সাহিত্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি নানা প্রতীকে পারস্য বা ইরানের বিশ্ব-পরিচিতি। দেশটিকে গোলাপ-বুলবুলের দেশ যেমন বলা হয়, তেমনি বলা হয় হাফিজ-রুমি-খৈয়াম-জামী'র দেশ। ফারসি ভাষায় রচিত সাহিত্য পৃথিবীর প্রধান-অপ্রধান ভাষাসমূহে অনূদিত হয়ে পারস্য সভ্যতার দিগন্তকে করেছে সুবিস্তৃত। বস্তুত ফারসি ভাষার উৎস হচ্ছে প্রাচীন এসিরিয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে যে-ভাষার লিপির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় তার সূত্র নিহিত আরও প্রাচীনতায়। (লাহিড়ী[৪৭] : ১৯৯৪, পৃ: ১১৮) ভাষাতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর ভাষাসমূহের আলোকে ফারসি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে যে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেন তাতেও এ-ভাষার বিন্যাস ও সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটই উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানি ফারসি ভাষা অনেক সময় অনেক দেশে রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার প্রভাব সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছায়। কিন্তু এটাও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের চর্চা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এ-ভাষা বিকশিত হয়েছিল। কাজেই ফারসি ভাষার যে অন্তর্গত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তাতে নানা শ্রেণির নানা মানুষের অবদান অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে চতুর্দশ শতকের সুলতানি আমল থেকে শুরু করে মুঘল-নবাবি আমল হয়ে কোম্পানি-যুগ এবং তারও বহুকাল পরে ব্রিটিশ শাসনামলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রযাত্রা বহমান। সম্রাট-রাজন্যবর্গ নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে রাজ্য দখল ও বিস্তার করেছেন কিন্তু ভাষা-সাহিত্য তার অনুপম নান্দনিকতা দিয়ে জয় করেছে জনসাধারণের মনোজগত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ-ভাষা শিখেছেন, এ-ভাষায় সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। ভারতবর্ষে কয়েক শত বছরের ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা ফারসি সাংস্কৃতিক প্রভাবের দিকটিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ব্রিটিশরাও অস্বীকার করতে পারে নি। তাই ১৭৫৭ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ারও প্রায় আশি বছর পরে ব্রিটিশরা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে প্রশাসনিক ভাষায় পরিণত করেছিল। সুলতানি আমলে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ধ্রুপদী ফারসি সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। অনেক ভারতীয়ই মূল ফারসি ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য-নিদর্শন রচনার মাধ্যমে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফারসি ভাষা-সাহিত্যের সুষমায় আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফারসি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশকরেন এবং রচনা করেন বহু গ্রন্থ। ভারত-খ্যাত বুলবুল-ই হিন্দুস্তান চন্দ্রভাণ ব্রাহ্মণ ছাড়াও ভীম সেন, সুজন রায় ভান্ডারী এবং ঈশ্বর দাসমুঘল যুগের স্মরণীয় কবি। (পাল[৩৪] : ১৩৬০ বাংলা, গোলাম মকসুদ হিলালী'র ভূমিকা)

ঐতিহাসিক-সামাজিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের রয়েছে এক বিশেষ সম্বন্ধ। সুলতানী আমল থেকে অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে বাংলার জনসাধারণ ফারসি ভাষার সঙ্গে পরিচিত। রাষ্ট্রীয়-প্রশাসনিক কারণে ফারসি ভাষা দীর্ঘদিন বাংলায় ও ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ-প্রভাব দৈনন্দিন জীবনের নানা উপলক্ষ ছাড়াও জীবনের বিশেষ প্রয়োজনেও পরিলক্ষিত হতো। বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রচুর পরিমাণ ফারসি শব্দ তারই প্রমাণ। এখনও বাংলাদেশ-ভারতে নামাজ, রোজা, খোদা, হারাম, দরবেশ, জবাই, সালিশ, জরিমানা, আসামী, কেচ্ছা, বাজীকর, চাকর, হজম, মজবুত এরকম অজস্র ফারসি শব্দে বাংলাভাষী মানুষের জীবনের কাজকর্ম চলমান। ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*-তে লিখেছেন– "এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় ইহাদিগকে বিদেশী শব্দ বলিয়া মনেই হয় না।" (শহীদুল্লাহ্[৫০] : ১৯৯৯, পৃ: ৬০) এ থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ফারসি ভাষার একটি ইতিবাচক প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো বহু বিখ্যাত বাঙালি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে মাতৃভাষার মত দক্ষতার ছাপরেখে গেছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলা যায় যাঁদের ফারসি ভাষায় জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ফারসি ভাষার কবিতার অনুবাদে বা ফারসি কবিতার আশ্রয়ে রচিত বাংলা কবিতা রচনায় দেখিয়েছেন বিশেষ কৃতিত্ব।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় শ্রী চৈতন্যদেবের প্রবর্তনায় যে বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয় তার সঙ্গেও ফারসি ধর্ম ও সংস্কৃতির যোগসূত্র নির্ণয় করেছেন ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ। চৈতন্যদেবের 'জীবাত্মা-পরমাত্মা'-নির্ভর তাত্ত্বিকতার সঙ্গে পারস্যের সুফিবাদী জীবনদর্শনের ('ফানাফিল্লাহ্-বাকাবিল্লাহ') তাত্ত্বিকতার সাদৃশ্য'র কারণে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পারস্যের সুফি সাহিত্যের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বস্তুত বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে পারস্যের সুফি মতবাদের যোগসূত্রের ফলে বাংলা অঞ্চলে এক নতুন ধারার সামাজিকতার সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ফারসি সাহিত্য-দর্শনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন পারস্য থেকে আসা পীর-দরবেশদের প্রভাবেবাংলার যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। (শহীদুল্লাহ্[৫০] : তদেব, পৃঃ ২০৩) এই ধর্মান্তর ও নব ধর্মের ফলে পারস্য দেশের প্রতি বাংলার সমাজে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সমাজ এবং সাহিত্য দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে পারস্যের প্রভাবের ফলে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের দিগন্তই বিস্তৃত হলো।বাংলা এবং ফারসি'র মধ্যকার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠলো এক সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহ্য। যেহেতু আমার গবেষণার বিষয় মহাকবি হাফিয ও তারঁ অধ্যাত্ম দর্শন সম্পর্কে এবং তিনি যেহেতু মোঘল ও তৈমুরীয় যুগের কবি ছিলেন, তাই তাঁর সময়কাল পর্যন্ত এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর পরবর্তী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হাফিযের কাব্যের প্রভাব নিয়েও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

কালের বিবর্তনে আমরা দেখতে পাই ফারসি ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ এর উৎপত্তিস্থল ইরান থেকে শুরু করে বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত। পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠিতে ফারসি ভাষার অবস্থান যেমন মর্যাদাপূর্ণ তেমনি ফারসি সাহিত্যের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও সাহিত্যের সমন্বিত আয়তনের মাধ্যমেই পারস্য দেশে এবং পারস্যের বাইরে অন্যান্য দেশে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রথমত ফারসি ভাষার বিকাশের বিষয়টি উপস্থাপনযোগ্য। ভাষা-প্রসঙ্গে বিশ্বের ভাষাবিশেষজ্ঞরা তাঁদের নানা মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের এসব আলোচনায় ভাষার ঐতিহাসিক-সামাজিক দিকগুলো স্পষ্টতা লাভ করে। তাছাড়া তাঁদের ভাষা-বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আমরা দেখতে পাই একটি ভাষার পরিপ্রেক্ষিত যথার্থই বিশাল ও বৃহৎ। কারণ একটি ভাষার বিবর্তনে কোনো একটি অঞ্চলের নিজস্ব সীমানা ও তার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠি, অঞ্চলটির নানা প্রতিবেশি, লোকসমাজের আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ফারসি ভাষার বিকাশ ঘটেছে সুদীর্ঘ কালের প্রেক্ষাপটে এবং ব্যাপ্ত অঞ্চলের পরিসীমায়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈচিত্র্য যুগপৎ ফারসি ভাষা ও ফারসি সাহিত্যকে পৃথিবীর বহুভাষা-ভাষী অবস্থানের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

পারস্য সভ্যতা যা বর্তমানে ইরান দেশের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই দেশটি ছাড়াও আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, পামির-মালভূমি অঞ্চল এবং এসবের বাইরেও উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত প্রভৃতি দেশেও ফারসি-ভাষী বিপুল জনগোষ্ঠি রয়েছে। বিস্তীর্ণ সীমানা জুড়ে এ-ভাষার অবস্থান থেকে অনুমান করা যায়, ফারসি ভাষার বিকাশ একরৈখিকভাবে ঘটে নি বরং বিভিন্ন ধারায় ঘটেছে। তবে পন্ডিতদের নানা মতকে সমন্বিত করে বলা যায় যে ইরানীয় ভাষাগুলির বিকাশ তিনটি পর্বে বিন্যস্ত– প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। (উইকিপিডিয়া) সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় আবেস্তা ভাষা এবং প্রাচীন ফারসি ভাষাকে। প্রাচীন ফারসি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছেন অনেক ভাষাতাত্ত্বিক। এই ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র পর্যবেক্ষণটি স্মরণ করা যেতে পারে। আর্য-শাখা'র দু'টি প্রধান প্রশাখা'র অন্যতম ইরানী ভাষা। (শহীদুল্লাহ্[৫০] : তদেব, পৃঃ ২৪) মূল শাখা যেহেতু সবচাইতে প্রাচীনতার

ছাপ বহন করে সেহেতু তাদের পরস্পরের মধ্যেও সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। ইরানী ভাষার বেশকিছু শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিল লক্ষ করা যায়। সপ্তম শতক পর্যন্ত মধ্য ফারসি ভাষার বিস্তার

বিদ্যমান ছিল। সাসানীয় সাম্রাজ্যের (২২৪-৬৫১ খ্রি:) সময় এই মধ্য ফারসি বা পাহলভী ভাষা ছিল সরকারি ভাষা। (উইকিপিডিয়া)সপ্তম শতকে আরবদের পারস্য বিজয়ের ফলে মধ্য ফারসি ভাষার বিকাশ ব্যাহত হয়। ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীতে পারস্য দেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশ একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে ফারসি ভাষার ক্রমবিকাশও পুনরায় গতি লাভ করে। নবম শতকের মধ্যেই বিকশিত হয়ে আধুনিক ফারসি ভাষা দেশটির সরকারি ও সাংস্কৃতিক ভাষায় পরিণত হয়। বর্তমান বিশ্বে ফারসি ভাষা একটি উন্নত-বিজ্ঞানসম্মত ভাষা হিসেবে বিবেচিত।

ভাষাবিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর ভাষাসমূহকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করেছেন। ভাষার শ্রেণিবিন্যাসে কখনও ঐতিহাসিক মানদন্ড, কখনও ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফারসি ভাষা-সাহিত্যবিদ ড. কে. এম. সাইফুল ইসলাম খান-এর মতে বর্তমানে ভাষার প্রচলিত তিন ধারাবিশিষ্ট শেণিবিন্যাসে ফারসি ভাষার অবস্থান উন্নত ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভাষাগুলির কাতারভুক্ত। (নিউজ লেটার[২৭] : ২০০২, পৃ: ২২) উল্লেখ্য, এই তিন ধারার প্রথমটি একাক্ষরিক শব্দ সমন্বয় বা Monosyllable Language, দ্বিতীয়টি যৌগিক শব্দ সমন্বয় ভাষা বা Aggulinantes Language এবং তৃতীয়টি সংযোজনকৃত ভাষা বা Fleetive Language। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের তুলনায় এই স্তরের ভাষাকে ভাষাবিদরা অগ্রসরমান বলে মনে করেন। আরবি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে ফারসি ভাষাও। ভাষার বংশগত সম্পর্ক, গঠন-রূপ, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে বর্তমানে ভাষাবিদগণ যে-বংশগত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন তারই আলোকে ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষা-গোষ্ঠির ভাষা-বৃক্ষ নির্মিত হযেছে। ফারসি ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম পন্ডিত শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষা-গোষ্ঠির আটটি প্রধান শাখার উল্লেখ করেছেন। (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ৬-৯) এগুলো হলো কেলতিক, ইতালিক, আর্মেনিয়ান, আলবানিয়ান, বাল্টিক-শ্লাভিক, গ্রীক বা হেলেনীয়, টিউটনিক বা জার্মানিক এবং আর্য বা ইন্দো-ইরানীয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা সম্পর্কে আনিসুর রহমান স্বপন তাঁর *বাংলাদেশে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রথমেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বর্তমান ইরান ও ভারত ভূ-খন্ডে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আকারে এবং অন্যত্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ করে। এ দু'টি অঞ্চলে এ ভাষা-গোষ্ঠী আর্য বা মহান, দেবতা, নেতা, প্রধান, সম্রাট প্রমুখদের ভাষাগোষ্ঠি নামে পরিচিত হয়।" (স্বপন[৫৪] : ১৯৯৫, পৃ: ১০) বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপিয় জনগোষ্ঠি বা আর্যরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সেই সময়ে, তারও আগে থেকে সিন্ধু-উপত্যকা ও গঙ্গা-অববাহিকা অঞ্চলে ভারতবর্ষীয় দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিবাসী অনার্যরা একটি উন্নত নগর সভ্যতার বিকাশ সম্ভব করেছিল। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা, খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০-৩২০০ অব্দে নব্যপ্রস্তর যুগের সিন্ধু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। (হাবিব[৬৭] : ২০০৭, পৃ: ৯) এই অনার্য সভ্যতাটি মেসোপটেমিয়, নীল প্রভৃতি উন্নত স্তরের সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয়। আর্য জনগোষ্ঠিরই একটি বৃহৎ অংশ বর্তমান ইরানে জাতিগত বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর্যদের সভ্যতার বহু দিক অনার্যদের চাইতে উন্নত থাকায় অনার্য-আর্য সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান হয় এবং এর মধ্য দিয়ে ক্রমসমৃদ্ধ নতুনতর সভ্যতার বিবর্তন ঘটে। আর্য সভ্যতার উপাদান ফারসি ভাষা-সংস্কৃতিও বিপুল অঞ্চল জুড়ে এর উত্তরাধিকার গড়ে তোলে। প্রাচীন পারসিক ভাষার 'অইরায়ানম' সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য্যানাম'। (স্বপন[৫৪] : তদেব, পৃ: ১২) ভাষাবিদগণ প্রচুরসংখ্যক শব্দের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন যে-শব্দগুলো সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় প্রায় সমরূপ। এ থেকে অনুমেয়, সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্য সভ্যতার বিপুল প্রভাবের দিকটি বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার শব্দভান্ডারের সাদৃশ্যের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়ম জোনস (Sir William Jones- ১৭৪৬-১৭৯৪ খ্রি:) সর্বপ্রথম বলেন যে, ল্যাটিন, গ্রিক ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষার উৎপত্তি একই ভাষা থেকে হওয়ার ফলে এ ভাষাগুলোর মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে। (সিরাজী[৫৯] : ২০১৪, পৃ: ২) বর্তমানে একাধিক দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ফারসি ভাষার প্রচলন এই ভাষার সুদীর্ঘ ভাষাগত ও সাহিত্যগত উভয় ধরনের প্রভাবের প্রমাণ। ইরান, তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ছাড়াও তুর্কিস্তান, ককেশাস

ও মেসোপটেমিয় অঞ্চলে ফারসি-চর্চা অব্যাহত রয়েছে আজও। এ ভাষায় সেখানকার লোকেরা কথা বলে, চিঠিপত্র আদান-প্রদান কওে এবং কাব্যকর্ম রচনা করে। (নিউজ লেটার[২৭] : তদেব, পৃ: ২২) ইরানি ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রভাবের

ভৌগোলিক পটভূমিটি ফারসি ভাষা-সাহিত্যবিদের দৃষ্টিতে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে– "ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৃহত্তরপ্রাচীন ইরান অর্থাৎ পশ্চিমে জার্মান থেকে তিব্বত এবং বালুকাময় চীনের তুর্কিস্তান, দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু, পারস্যউপসাগর ও ওমান সাগর, উত্তরে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে গ্রীস পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সিরিয়া, ইয়েমেনসহ আরব দেশগুলোতে বসবাসকারী অধিকাংশই একসময় এই ফারসি ভাষায় কথা বলত।" (নিউজ লেটার[২৭] : তদেব, পৃ: ২৩) এই ব্যাপ্তি আর বহুমুখিতার প্রভাব বর্তমান যুগেও অনিবার্যরূপে বিরাজমান।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ফারসি ভাষার যুগবিভাগ তিনটি। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই ফারসি ভাষার অভিযাত্রা। নানা যুগের নানা ঘটনা, যুদ্ধ ও রাজত্বের ইতিহাস, কাহিনি, পৌরাণিকতা প্রভৃতি পেরিয়ে পারসি ভাষা এর আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। বিখ্যাত ফারসি ভাষা-সাহিত্যতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড জি ব্রাউন তাঁর ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে (ব্রাউন[৭৮] : ১ম খন্ড, ১৯২৯, পৃ: ৭-৯) ফারসি ভাষার তিনটি যুগের উল্লেখকরেছেন– প্রথমত, হাকামেনিয় যুগ: খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দ থেকে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ-যুগের ব্যাপ্তি। এটি ফারসি ভাষার প্রাচীনতম যুগ। বস্তুত প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে নিজেদের আর্য পরিচয়ে চিহ্নিত করা একটি জনগোষ্ঠির ক্রম পর্যটনের মধ্য দিয়ে ইরানের পূর্বাঞ্চল হিরাত ও মারভে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ-অঞ্চলটির স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে। এ-যুগের লিপি মূলত চামড়া, ধাতু, প্রস্তর ও পর্বতের গাত্রে খোদিত লিপি। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৫) ব্যবহৃত উপকরণ-সামগ্রি এবং লিপির প্রকাশ থেকে আমরা এসিরিয় সভ্যতার প্রাচীনতার পরিচয় লাভ করি। মহাকবি ফেরদৌসি রচিত *শাহনামা* মহাকাব্যের পৌরাণিক কাহিনিতে এই প্রাচীন যুগের বিবরণাদি স্থান পেয়েছে। (নিউজ লেটার[২৭] : তদেব, পৃ: ২৩) দ্বিতীয়ত, সাসানিয় যুগ: ২২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ-যুগের ব্যাপ্তি। ব্রাউনি এ-যুগকে বিশেষভাবে পাহলভি যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন।পাহলভি ধারার লিপির বহুল এবং বিচিত্র ব্যবহারের ফলে এর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে এই লিপি'র পরিচয়ে ভাষারও পরিচিতি– সাসানিয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা ছিল পাহলভি ভাষা। (ব্রাউন[৭৮] : তদেব, পৃ: ৭) মধ্যযুগে ফারসি ভাষার বৈচিত্র্য থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন ইরানে একটি গতিমান-বিবর্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভৌগোলিকভাবেও আমরা দেখি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই প্রাচীন ভূমি আকৃষ্ট করেছিল দূর-দূরান্তের জনমানুষকে। শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল মধ্যযুগের পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত পাহলভি ছাড়াও সোগ্দীয় এবং শক্ বা কুশান্ বা প্রাচীন খোত্নী ভাষারও উল্লেখ করেছেন। (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২১) তৃতীয়ত, মুসলমান যুগ বা আধুনিক বা নব্য ফারসি যুগ: ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ যুগের ব্যাপ্তি। এ যুগকে মুসলমান যুগ বলার কারণ এ যুগে আরবদের পারস্য সাম্রাজ্যে অধিকৃতি এই পুরো অঞ্চলের জন্যেই একটি নতুন দিগন্তের সূচনা বলে গণ্য করা হয়। ফারসি ভাষা এর প্রাচীনতা নিয়ে বিকশিত হলেও আরবদেশীয় সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের প্রভাবের ফলে ফারসি ভাষার রূপও ক্রমশ নতুন আদল নিতে শুরু করে। আরবি ভাষার বিপুল প্রভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক পাহলভি ভাষা আধুনিক ফারসি ভাষায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এতে করে পাহলভি ভাষার অনেক প্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্তির শিকার হয়। ফারসি বর্ণমালার ক্ষেত্রেও আরবি প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। মূলত আরবি ভাষাবিদগণ পাহলভি বর্ণমালাকে আরবি বর্ণমালার ধাঁচে পরিবর্তন করেন। (বাংলা পিডিয়া[৩৭] : ৮ম খন্ড, ২০১১, পৃ: ১৩৫) ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যেরও ব্যাপক বিবর্তন সাধিত হয়। এর কারণ, আরবি বর্ণমালা ফারসি বর্ণমালাকে প্রভাবিত করলেও প্রাচীন পাহলভি সংস্কৃতির প্রভাবকে আরবের সংস্কৃতি সেভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। তাই আমরা দেখতে পাই আধুনিক যুগেও ফারসি সাহিত্য এর স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রেখেই বিকশিত হয়েছে।

আধুনিক ফারসি ভাষার ভৌগোলিক ঐতিহ্য এতটাই বিস্তৃত যে এর ভাষাগত ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধির বিশ্লেষণ সহজে সম্ভবপর নয়। একদিকে ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিস্তৃতির ফলে ফারসি ভাষাও পশ্চিম ও উত্তরে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়া হতে শুরু করে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রত্যন্ত এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক ফারসি ভাষা এই বৈচিত্র্যের ছাপ বহন করে। বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ফারসি ভাষার অন্ততপক্ষে ৩৪টি আঞ্চলিক কথ্যরূপ বা উপভাষা লক্ষ করা যায়। (স্বপন[৫৪] : তদেব, পৃ: ১৩-১৪) এসব

উপভাষার মধ্যে তাজিকী, দারী, আফগানী, কুর্দী, লোরী, বাখতারী, বালুচী, তানী, অসী বা অসেটি, তালসী, পশতু, গিলটি, তারাবী বা মাজেন্দারানী, সেমনানী, ওয়াঘী, সোগদী, আরাকী, ইস্ফাহানী, মেহেজাদী, আজারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এত অধিকসংখ্যক

এসব উপভাষার মূল যেহেতু ফারসি তাই ফারসি ভাষায় আরবি প্রভাব সত্ত্বেও ফারসি লিপির মৌলিকতা তাতে ক্ষুন্ন হয় নি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, পৃথিবীর অনেক দেশেই আরব দেশ থেকে আগত ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও বিস্তারের ফলে সেসব দেশের পূর্বতন ভাষা ও লিপি, হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা পূর্বাপর পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে। লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া এসব দেশে বর্তমানে আরবি লিপির একচ্ছত্র প্রাধান্য। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রসারের পূর্বে এসব দেশের প্রতিটির নিজস্ব আদি ভাষা ও লিপি প্রচলিত ছিল। এখানেই ফারসি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যের পরিচয় নিহিত রয়েছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, সপ্তম শতকে ইরানে সাসানিয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পারস্য সভ্যতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিন্ন সভ্যতার নিশান। তখন সেই উপপ্লবের ঢেউয়ে হারিয়ে যায় ফারসি ভাষা-সাহিত্যের বহু মূল্যবান রত্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে ফারসি ভাষা-সাহিত্য পুনরায় তার গৌরব ও আভিজাত্য নিয়ে পুণ:প্রতিষ্ঠিত হয়। আসলে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের শেকড়ে যে-শক্তি নিহিত ছিল এবং যা কিছুটা সময়ের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল আরব-বিস্তারের কালে তা কালক্রমে আবার তিলে-তিলে তার শক্তির সঞ্চয় নিয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে যার আভা আজও ছড়িয়ে রয়েছে খোদ পারস্য সভ্যতায় এবং বিশ্বের সভ্যতায়। আরবি ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও ফারসি এর অকৃত্রিমতা বিসর্জন দেয় নি বরং ফারসি সাহিত্যের ধ্রুপদী স্রষ্টারা ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষার সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর সমকাল-সংলগ্নতা। তাই সাহিত্যের অনেক সমালোচকই বলে থাকেন, সাহিত্য কখনও-কখনও সমকালের দর্পণ হয়ে উঠতে পারে। আমরা বাংলা সাহিত্যের বিপুল প্রতিভাবান বিদ্রোহীকবি কাজী নরজরুল ইসলামের কথা স্মরণ করতে পারি। তাঁর সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সমকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধেনানা প্রকারের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-দ্রোহের প্রকাশের মাধ্যমে শিল্পসাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেছে কিন্তু তাই বলে সেই সমকালের ভাবনির্ভর কাজী নজরুল ইসলামের দ্রোহ-বিক্ষোভের কবিতার মূল্য হারিয়ে যায় নি। কাজেই যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় কিংবা সাহিত্যের শিল্পমূল্য নিরূপণে সেই ভাষার নিজস্ব অঞ্চলের সমকালীন পরিস্থিতির গুরুত্ব অপরিসীম। এ. জে. আরবেরি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ক্ল্যাসিক্যাল পারসিয়ান লিটারেচর*-এ বলেছেন, ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাসকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়া চলে না। (আরবেরি[৭৫] : ১৯৫৮, পৃ: ৮) শুধু তা-ই নয় কখনও-কখনও ব্যক্তি রাজা বা রাজন্যবর্গও সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সমকালীন রাজসভা বা রাজপৃষ্ঠপোষকতা সেখানকার সাহিত্যের বিকাশ-অগ্রগতি নির্ধারণ করেছে কিংবা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজপৃষ্ঠপোষকতা নতুন সাহিত্যধারারও জন্ম দিয়েছে।বিশ্বখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপিয়রের অধিকাংশ নাটকই রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। বিশেষ করে রাণী এলিজাবেথ ছিলেন তাঁর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাল-সেন সম্রাটগণ এবং সুলতানি আমলের সুলতানরা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁদের অসাধারণ গৌরবজনক ভূমিকার কারণে। এমনকি বাংলার বাইরে আরাকান রাজসভায় আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাংলা রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী যে-কাব্যধারার জন্ম হয় তা সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত। ফারসি সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সমকালীন রাজনীতি, রাজনৈতিক পালাবদল, রাজরাজড়াদের ভূমিকা এবং রাজ্যবিজেতা ভিন্নদেশী সম্রাটদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য মূলত ফারসি সাহিত্যের যুগসমূহের চরিত্র-নির্ণয় ও সেসব যুগের প্রধান সাহিত্য-স্রষ্টাদের অবদানকে চিহ্নিত করা। যেহেতু আমার গবেষণা-অভিসন্দর্ভের উপজীব্য বিষয় 'মহাকবি হাফিয শিরাযির অধ্যাত্মপ্রেম' এবং তিনি চতুর্দশ শতাব্দী তথা মুঘল ও তৈমুরীয় উভয় শাসনকালের সময়সীমার কবি ছিলেন তাই আমার গবেষণায় মুঘল ও তৈমুরীয় যুগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে ইরান নামে খ্যাত যে-দেশ গর্বভরে বিশ্বসভ্যতায় দন্ডায়মান সেই দেশই মূলত ফারসি ভাষা-সাহিত্যের উৎসভূমি। এই বহুমাত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন একজন রচয়িতা–

> "পৃথিবীর ইতিহাসে নামিদামি সভ্যতাগুলোর মধ্যে পারস্য সভ্যতা একটি বিশাল অবস্থান দখল করে আছে। সভ্যতা প্রথম যেখানে চোখ মেলে, 'পুরনো পৃথিবী' নামে পরিচিত নিকট প্রাচ্যের সেই সুবিস্তীর্ণ জীবন-আঙিনারই একটি বিশেষ অঞ্চলের নাম হলো ইরান। দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগর ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী এই রাজ্য-এলাকার বর্তমান আয়তন ৬,৩৬,২৯৬ বর্গমাইল বা ১৬,৪৮,০০০ বর্গকিলোমিটার। বর্তমান জনসংখ্যা তিন কোটির ওপর।" (ইকবাল[৯] : ২০১৫, পৃ: ৯)

বিখ্যাত লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ইরান* নামক গ্রন্থে এই সভ্যতার আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেন, দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতটে উন্মেষ ঘটা এই সভ্যতার ওপর এরও আগেকার বাবুল ও অসুর (এসিরিয়) সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। সেই সময় ইরানের মধ্যভাগে যে উচ্চ মালভূমি ছিল সেখানে ভবঘুরে গো-চারণ সমাজের লোকেরা থাকতো। তারা কৃষিকাজ জানতো এবং তাদের জীবনে নাগরিকতার ছাপ পড়তে শুরু করেছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায়–

> "যারা এই দেশের নাম দিয়েছিল ইরান, সেই জাতি, ইন্দো-ইরানী জাতি গোষ্ঠীর পশ্চিমের শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই জাতি, প্রথমে মধ্য ইরানের সমতল ভূমিতে তাদেও বসতি গড়ে তোলে এবং পরবর্তীকালে তারাই ইরানী সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত হয়।" (সাংকৃত্যায়ন[৬১] : ২০১৪, তদেব, পৃ: ২১)

এই জাতিকেই আমরা আর্য জাতি হিসেবে মেনে নিয়েছি– "ছয় হাজারবছর পূর্বে আর্যদের আদিভূমি ছিল দক্ষিণ রুশ থেকে পামির অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন সমস্ত আর্যরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ছাগল-ভেড়া-গরু, ঘোড়া নিয়ে ওই অঞ্চলে বিচরণ করত। পাঁচ হাজার বছর আগেতারা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। এদের বংশধরেরাই ইরানী এবং ভারতীয় আর্য। চার হাজার বছর আগে এই পূর্বী আর্যরাও দু'ভাগে ভাগ হয়ে একদল ইরানে এবং অন্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।" (তদেব, পৃ: ২২) আদি আর্য জাতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাই এসিরিয় সভ্যতার এসব অঞ্চলের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই-সেই এলাকার জলবায়ু-পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো বিচিত্র সাংস্কৃতিক জীবনের নির্মাতা হয়ে দেখা দেয়। ঐতিহাসিকগণ এ-ব্যাপারে একমত যে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে আর্যদের যে শাখা দক্ষিণ রাশিয়া হতে পশ্চিম ইরানের যাগরূস পর্বতের মধ্যে এলাকা মিডিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করে। ভৌগোলিক সম্পর্কের কারণে এ-সমস্ত লোককে মাদ্দ বলা হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩], ৪র্থ খন্ড : ১৯৮৮, পৃ: ৫৯৫) মিডিসরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বস্তিতে থাকতে পারে নি। তাদেরকে এসিরিয়দের সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগি করতে হতো বলে এসিরিয়রা সুযোগ পেলেই সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকায় মিডিসদের আক্রমণ করতো। তবে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে সাহসী ডেইওকিস নিজ জাতির লোকেদের সংঘবদ্ধ করে এসিরিয়দের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হামাদানকে রাজধানী বানিয়ে মিডিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে। ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় মিডিস অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এর গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায় এবং মিডিসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে সকলেই সম্মান ও বীরত্বের বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু একপর্যায়ে মিডিসেরও পতন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালে কোরেশ-ই-আজম মাদ্দ জাতির সর্বশেষ বাদশাহ আসতিয়াগাসকে পরাজিত করে মিডিস রাজত্বেও পতন ঘটান। (নিউজ লেটার[২৭] : তদেব, পৃ: ২৩)

পারস্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ হাখামানশি রাজবংশ। ইনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী গোষ্ঠিপতি। তাঁর নামানুসারেই এ রাজবংশের নামকরণ করা হয়। এদের প্রথম বাদশাহ কোরেশ-ই-আজম (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০-৫২৯) এতটাই পরাক্রমশালী ও পারদর্শী যোদ্ধা ছিলেন যে তিনি মিডিসদের সাম্রাজ্যকে বিশাল অঞ্চলে পরিণত করতে সক্ষম হ'ন। রুশদের এলাকা জয় করে তিনি পুরো

এশিয়া মাইনরে কায়েম করেন তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব) সম্রাট কোরেশের রাজত্ব আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু নদ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ইরান* গ্রন্থে কোরেশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মহান সম্রাট হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর রাজ্যসীমা ভূমধ্যসাগর, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে রাহুল উল্লেখ করেন।

এইচ জি ওয়েল্‌স তাঁর *এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড* গ্রন্থে (ওয়েল্‌স[৮২] : ১৯৪৬) পারস্য সভ্যতার বিকাশে পারস্য ও গ্রিসের যুদ্ধের গুরুত্ব তুলে ধরেন।তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো আর্য জাতিভুক্ত মিডিস ও পারসিকরা যে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তা ছিল পৃথিবীর যে-কোনো সভ্যতার চাইতে আকারে ও প্রকারে বিশাল। পারসিকরা অনেক যুদ্ধেই হেরে যায় কিন্তু এতেও জাতি হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠতা কোনোভাবেই লঘু হয়ে যায় নি। এক যুদ্ধে পারস্যের সম্রাট জারেক্স গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে এমন আক্রমণ চালান যে ভীতসন্ত্রস্ত এথেন্সবাসীরা পুরো নগরী জনশূন্য করে পালিয়ে যায়। গ্রিস এবং পারস্য এই দুই সভ্যতার দ্বিবিধ আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারসিক জাতির জীবন ও সংস্কৃতিতে ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার সংযোজন হয় যা পরবর্তীকালেতাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিকতাতেও প্রভাব ফেলে। গ্রিস দেশের সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হাখামানশি যুগের শেষ সম্রাট ৩য় দারিয়ূশকে পরাজিত করেন এবং তার ঠিক পরপরই আলেকজান্ডারের সেনাপ্রধান সেলুকাস (৩৫৮-২৮১ খ্রি:পূ:)ইরানে প্রতিষ্ঠা করেন সেলুকী শাসনব্যবস্থা। সেলুকীদের আবার পরাজিত করে আশকানীরা, যারা পরবর্তী পাঁচশত বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। (সিরাজী[৫৯] : ২০১৪, পৃ: ২১)

পারস্য সভ্যতার ওপর গ্রিকদের প্রভাবের কথা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। সম্রাট আলেকজান্ডারের আধিপত্য বিস্তার এবং তাঁর সেনাপতি সেলুকাসের শাসনামলে গ্রিসের প্রভাব পড়ে ইরানের শাসনব্যবস্থা ও জনজীবনের ওপর। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সমান্তরালে চলতে থাকে আর্য-গর্বে গর্বিত ইরানীদের জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশচেতনার আন্দোলন। তারা সম্রাট আরশকের সময়েই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেলুকী শাসকদের ক্রম দুর্বলতার সুযোগে সম্রাট দ্বিতীয় আরশক দ্বিতীয় সেলুকাসকে পরাজিত করে আশকানী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। (সাংকৃত্যায়ন[৬১] : তদেব, পৃ: ৩৮) আশকানীরা যে কালক্রমে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছিল তা বোঝা যায় তাদের সম্পর্কে গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের উল্লেখ থেকে।

২২০ খ্রিস্টাব্দে সাসানী বংশের সূচনা ঘটে পারস্যে। এই বংশের রাজত্বকাল সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। সাসানী যুগ যে নানাভাবে ইতিহাসে প্রভাব রেখে গেছে তার প্রমাণ এ যুগের বিভিন্ন শিলালিপি। তাছাড়া পাহলভি ভাষায় রচিত বেশকিছু নিদর্শন থেকে এটা পন্ডিতগণ ধারণা করেন, ইরানে একটা নতুন উদ্যমের সূচনা ঘটেছিল এই সাসানী কালপরিধিতে। অনেকেই মনে করেন পাহলভি ভাষায় রচিত যারতুশ্‌তীয় ধর্মগ্রন্থ মাযদা ইয়াসনা সম্পর্কিত প্রাপ্ত মূল হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ এ যুগেরই। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ২২) সাসানী যুগের বেশকিছু গ্রন্থের নাম করা যায় যেগুলো পাহলভি ভাষায় রচিত এবং এসব গ্রন্থে ধর্ম ছাড়াও শাস্ত্রাদি ও বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোচনা রয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ – ভাতেননামেহা, দেনকার্ত, বুন্দিহিশান, আরদাভিরায়ানামে, কারনামায়ে আরদেশির বারেকান, খোসরু গোওয়াতান ও রিদাক, ইয়াদগারে যারির, রাইহায়ে মানুভিয়ে খেরাদ, দাদেস্তান, আনদারয় নামেহা, খোদাই নামে, দেরাখতে আশুরিক। সম্রাট নওশিরওয়ানের রাজত্বকালে (৫৩১-৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ) পারস্য ভাষা-সাহিত্য একটা নতুন মাত্রা অর্জন করে ফারসি ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার যোগাযোগের দ্বারা। গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষার বেশকিছু গ্রন্থ তখন অনূদিত হয় পাহলভি ভাষায়। গল্প, জ্ঞান, নীতিমূলক এবং বিভিন্নপ্রকার বিদ্যা ও শিল্পসম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ ছিল এসবের মধ্যে। তন্মধ্যে কালীলা ওয়া দিম্‌না নামক গ্রন্থটি পৃথিবীবিখ্যাত। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : পৃ: ৬১৭) ইতিহাসের আলোকেবলা যায়, সাসানী যুগে ফারসি সাহিত্যের জগতসাসানী সম্রাটদের রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সাম্রাজ্য শক্তিশালী না হলে এবং তাতে স্থিতাবস্থা না থাকলে তার সাহিত্য ও শিল্পজগতে বৈচিত্র্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা

জাগতো না। সাসানী যুগে তাই ফারসি সাহিত্য জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে আরব আধিপত্যের ফলে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয় এবং এতে করে নতুন ধরনের সাহিত্য রচনার কাজ শুরু হলেও ফারসি সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকা ঐতিহ্যচেতনা আর আগের মত থাকলো না।

৭

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে পারস্যে আরব-আগমন এবং আরব-প্রভাবের রাজনৈতিক পটভূমিটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।সাসানীদের দ্বারা ফারসি সাহিত্য ও জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ-ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কিন্তু৬৯১ খ্রিস্টাব্দে তাদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ৩য় ইয়াযগারদ আরবদের কাছে পরাজয় বরণ করলে ইরান সাম্রাজ্য আরব খলিফাদের আধিপত্যে চলে যায়।আরবরা তখন প্রচন্ড শক্তি এবং ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আরব দেশ ছাড়িয়েও চতুর্দিকে প্রসারিত করে চলছিল তাদের সাম্রাজ্য। অন্যদিকে ইরানীরাও অত্যন্ত উন্নত চেতনার অধিকারী ছিল। বিশেষ করে তাদের রুচি, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি আরবদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। আরব-আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইরানীরা তাদের পাহলভি ভাষার আশ্রয় থেকে সরে গেলেওএরাই আবার আরবী ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২৩) বলা যায় আরব-আধিপত্যের পরিস্থিতিতে দমে না গিয়ে পারস্যের লোকেরা নতুন উদ্যমে নিজেদের মেধা-মননকে প্রবাহিত করলেন ভিন্ন খাতে। আমরা একথাও বলতে পারি, সে-সময়ে পারস্যের লোকেরা বিজেতাদের ভাষাকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন যে আরবদের চাইতেও পারস্যের লোকেরাই হয়ে উঠলেন আরবি ভাষা-সাহিত্যের কান্ডারী। ফারসি সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে, আরবি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ছিল উত্তম এবং আরবি শব্দভান্ডারও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৪৭) এটাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, আবেগ-প্রকাশের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষা যে অত্যন্ত মধুর ও কার্যকর সেটা বিভিন্ন যুগের ফারসি কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত। ফারসি ভাষায় যুক্তিতর্কের কাজও সমানভাবে চালানো সম্ভব। কাজেই আরবির সঙ্গে ফারসিকে সমন্বিত করে ইরানী কবি-লেখকগণ দুই অঞ্চলের ভিন্নতাকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ আজও তাঁদের সেই কাজকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করে থাকেন। খোদ আরব দেশের লোকেদের কাছেই এসব ইরানী লেখক আদরণীয় হয়ে রযেছেন। সমালোচকের ভাষায়– "আরবি ভাষায় রচিত ফেকাহ্, ইতিহাস ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহের রচয়িতা ছিলেন খোদ ইরানি।" (সিরাজী : তদেব)

আরবি ভাষা-সাহিত্য ইরানে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে নিলেও আমরা দেখতে পাই একই সমান্তরালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন তরঙ্গ নিয়ে ধাবিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন ধরনের এ-কারণেই যে এতে পারস্যের নিজস্ব জাতিসত্তা, সংস্কৃতি, স্বদেশ এইসব ভাবনা নিহিত ছিল। আব্বাসি খেলাফতের সময়ে ইরান একটা গৌরবময় অবস্থানে পৌঁছায় যেখানে ইরানিদের স্বকীয়তা স্বীকৃতি পায়। ইরানি অবদান নানা ক্ষেত্রে ইরানিদের জাতিগত পরিচয়কে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে সফল হতে থাকে। ৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মুতাওক্কেল বিল্লাহর সময়ে ইরানে প্রচন্ড বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৫৩) এই বিদ্রোহের পরিণামে ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশি শাসন-ব্যবস্থা। এসব শাসন-ব্যবস্থায় ইরানের স্বকীয় সমাজ-ঐতিহ্য ইত্যাদির গুরুত্ব বেড়ে গেল। ইরানিরা আরব-নির্ভরতার পরিবর্তে তাদের নিজেদের সক্ষমতার ওপরেই অধিক আস্থাশীল হলো। ইরানি জাতীয়তা-স্বাদেশিকতাসচেতন এরকম কয়েকটি শাসনামলের নাম ইতিহাসখ্যাত– যেমন, তাহেরি যুগ, সাফফারি যুগ এবং সামানী যুগ। এসব যুগে ফারসি ভাষা-সাহিত্য তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে সমকালের জীবনচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ভাবধারার প্রচারক হয়ে দেখা দিল। এসব রাজবংশ সম্পূর্ণরূপে ইরানি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে এদের কাছে স্বদেশী ভাষা-সংস্কৃতি অধিক গুরুত্ব পেল। গদ্য-পদ্য দুই ধরনের রচনা নিয়ে আবির্ভূত হ'ন নতুন-নতুন লেখকগণ। বিশেষ করে ফারসি কাব্যে নতুন ভাব ও ভঙ্গির জাগরণ ঘটলো এই সময়ে। আমরা বলতে পারি ইরানিদের নিজস্ব পরিচালনায় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ইরানবাসীরা তাদের জাতিগত ভাবনায় একটা নতুন সংযুক্তির বোধ খুঁজে পেলেন। এর ফলে নিজেদের গৌরবময় অতীত ও ইতিহাস নতুন মূল্য বহন করে তাদের সামনে দাঁড়াল। কাব্যে যেহেতু জাগরণ ও উদ্দীপনাকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা সম্ভবতাই এ-সময় ফারসি কাব্যের জগতে মোড়-পরিবর্তনের সুর জেগে উঠলো। পরবর্তীকালে যে-নতুন ফারসি ভাষার অভিযাত্রা তা সম্ভব হয়েছিল এই স্বাদেশিকতাসম্পন্ন সচেতন কবিদের সৃষ্টির গুণেই।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে একটা বড় সহায়তা হয়ে দেখা দিতে পারে তার দৃষ্টান্ত পারস্য ইতিহাসের তাহেরি, সাফফারি এবং সামানী যুগ। এই তিন যুগের প্রায় দুইশত বছরের (৮২০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাস ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর। তাহেরি সাম্রাজ্যকে বলা যায় একটা মোড়-পরিবর্তনকারী যুগ, যেহেতু আরবদের ইসলাম ধর্মের আগমনের পর এটাই ছিল প্রথম স্বদেশী শাসকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। যেজন্যে অনেকেই তাহেরি সাম্রাজ্যকে প্রথম ইরানী

স্বাধীন সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেন। (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২৫) তাহেরি শাসকদের শাসনকেন্দ্র ছিল খোরাসান ও নিশাপুর। বস্তুত ইরানি সাহিত্যের ইতিহাসে খোরাসানের যে গৌরবময় অবস্থান তা তাহেরি আমল থেকেই স্বাতন্ত্র্যসহকারে চিহ্নিত হতে শুরু করেছিল। সমালোচকের দৃষ্টিতে খোরাসান একদিকে ইরানি জাতির উদ্যম ও উদ্দীপনার কেন্দ্রে পরিণত হয়, অন্যদিকে খোরাসান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লালনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। (সিরাজী[৫৯] :তদেব, পৃ: ৬৭) ইতিহাসের শাসকেরা কেবল যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমেই যে কেবল স্মরণীয়-বরণীয় হ'ন নি, অন্যতর কারণেও হয়েছেন তার প্রমাণ ইরানের এইসব শাসক ও তাদের শাসনামল। তাহেরি শাসনামলের বিখ্যাত কবি হানযালায়ে বাগদেইসির কারণেও অনেকের কাছে তাহেরি-যুগের গুরুত্ব। তাঁর একটি কাব্যসমগ্রকে ফারসি ভাষার প্রথম কাব্যসমগ্র বলে বিবেচনা করা হয়। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৬৭) তাঁর কাব্যে সাহসিকতা এবং বীরত্বের জয়গান আমরা লক্ষ করি। তাঁর কাব্যের এইসুর তাহেরি যুগের স্বদেশী জীবনচেতনাজাত। স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণা যে সঠিক আনুকূল্য পেলে ফলবান হয়ে উঠতে পারে তার সার্থক উদাহরণ সাফফারি যুগের ইতিহাস। সিস্তানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য বিস্তারকারী সাফফারি শাসকেরা খোরাসান, সিস্তান, ফারস, বোরমান, হেরাত, আহভাব, বালখ প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের হুকুমত চালু রাখে। এই শাসনামলে শাসকদের মধ্যেও অনেকে কাব্য রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। ফিরোয মাশরিকী, আমর বিন লাইছ, আবু সালিক গুরগানি'র নাম এ-যুগের স্মরণীয় কবি হিসেবে সমালোচকমহলে সমাদৃত। তাহেরি ও সাফফারিদের চাইতে সামানীরা ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রসার-পৃষ্ঠপোষকতায় আরও অগ্রগামিতা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই সময়কার ইতিহাস এবং কাব্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্টতরভাবে অনুধাবন করা যায়। বিখ্যাত ফারসি সাহিত্যতাত্ত্বিক ই. জি. ব্রাউন (ব্রাউন[৭৮] : ১৯২৯, *এ লিটারেরি হিস্ট্রি অব পারসিয়া*, প্রথম খন্ড, পৃ: ৩৪০-৩৪১)এই তিনটি যুগের চরিত্র নির্ণয়ে চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে যখন বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পারস্য-খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল খানিকটা আল্গা হতে শুরু করে তখন ফারসি সাহিত্য বিশেষ করে কাব্য তার প্রকৃত পারস্য জাতি ও প্রকৃতির নির্ভরতা নিয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো। পরবর্তীকালে গাযনাভী যুগে তা চূড়াস্পর্শী হয়ে দেখা দিল। পারস্যের ইতিহাস অনুসারে সামানি রাজবংশীয়রা পারস্যের ঐতিহ্যবাহী বংশের উত্তরাধিকার বহনকারী ছিলেন। ফারসি ভাষা-সাহিত্য তাঁদের কাছে যে কেবল নতুন মূল্যে হাজির হলো তা-ই নয়, ফারসি ভাষাকে তাঁরা রাজভাষা বলে ঘোষণা করলেন। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৭৪) সামানী রাজবংশের ঐতিহ্যপ্রীতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। একটি ফারসি কবিতায় এই বংশের সংখ্যা ও নামের তালিকা বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে–

نه تن بودند ز آل سامان مذکور

گشته بامارت خراسان مشهور

اسمعیلی و احمدی و نصری

دو نوح و دو عبدالملک و دو منصور

ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী'র অনুবাদে এর অর্থ দাঁড়ায়–

"সামানি রাজবংশের নয় ব্যক্তির নাম উল্লিখিত আছে

সকলেই খোরাসান রাজ্যের শাসক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন

ইসমাইলি, আহমাদি ও নাসারি হলেন প্রখ্যাত

দুইজন নুহ, দুইজন আব্দুল মালেক ও দুইজন মানসুর ।" (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ; ৭৪)

৯

সামানিরা বুখারাকেন্দ্রিক হলেও তাঁদের সময়ে সিস্তান, গায়নী, গোরগান, নিশাপুর, রেই ও সামারকান্দ সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতো ।

সামানি সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর প্রতিষ্ঠিত হয় গাযনাভী সাম্রাজ্য । এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট সুলতান মাহমুদ গাযনাভী'র(মৃত্যু: ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) নাম যোদ্ধা ও বিজেতা হিসেবেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ । কিন্তু সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তাঁর সুনাম ইতিহাসখ্যাত হয়ে রয়েছে । এ. জে. আরবেরি তাঁকে অসাধারণ গুণপনাসমৃদ্ধ একজন মহৎ শাসক রূপে বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে । তিনি লিখেছেন, রাজ্যজয়ের নেশায় মত্ত থাকলেওতিনি জ্ঞান এবং পান্ডিত্যের কদর করতে ভুলতেন না । (আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ৫৩) অনেক সমালোচক গাযনাভী যুগকে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা বলে অভিহিত করেন । সমগ্র ইরান, তুর্কিস্তান, সুদূর ভারতবর্ষপর্যন্ত রাজ্যের বিস্তার একদিকে, অন্যদিকে নিজের দরবারে কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ এসব ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়ে পারস্যের গৌরবকেই তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের মানচিত্রে । তাঁর রাজসভায় কবিদের উপস্থিতিই ছিল চার শ'র ওপরে । (সাত্তার[৫৩] : ১৯৮৭, পৃ: ১০) গাযনাভী যুগের আরেকটি বড় দিক ছিল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার । এর মাধ্যমে শুধু রাজ্যের বিস্তারই নয়, ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই ফারসি ভাষা-সাহিত্যেরও ভিন্ন দিগন্তে বিস্তৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল । ভারতবর্ষে ফারসি সাহিত্যের চর্চা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নিয়ে এলো বৈচিত্র্য এবং দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনের সুযোগ । মহাকবি ফেরদৌসি এ-যুগেই ইরানের জাতীয় কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রাখেন এক কিংবদন্তীতুল্য অবদান । তাঁর *শাহনামাহ*কাব্যে আমরা পাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা পারস্য সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস । সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইরানে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল গাযনাভী যুগে । (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব, পৃ: ৬২১)

গাযনাভী যুগের পর ৪২৯ হিজরি সনে (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তুর্কি বংশোদ্ভূত 'সালযুকি' রাজত্বের উদ্ভব ঘটে । ইতিহাস থেকে জানা যায়, সালযুকি সম্রাটরাও গাযনাভীদের মত শিল্পী-সাহিত্যিকদের কদর করতেন । যাঁরা সাম্রাজ্যের পারিষদ ও মন্ত্রি ছিলেন তাঁরাও ছিলেন পান্ডিত্যে-বৈদগ্ধ্যে উঁচু স্তরের । (তামীমদারী[২১] : ২০০৭, পৃ: ৪৯) এ-যুগে সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানসংক্রান্ত বহু কার্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । এরকম একটি গ্রন্থ হলো খাজা নেয়ামুল মুল্‌ক্ তুসি রচিত *সিয়াসাত-নামাহ* । সামাজিক কর্তব্যসমূহ, নানাবিধ আচরণ, নৈতিক কর্তব্যাদি, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, মন্ত্রিসভার কার্যাবলী, বিচারক ও বক্তাদের করণীয় ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে । এটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ যেটির আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি মৌলিকতাপূর্ণ । (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব, পৃ: ৬২৪) এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা সালযুকি-যুগের একটা সুষম ও সুবিন্যস্ত পরিস্থিতির দেখা পাই । সালযুকি শাসন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয় । সালযুকি সম্রাট সানজারের (১০৯২-১১৫৬ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুর পর সালযুকি রাজ্যসমূহ তাদের বিভিন্ন নেতার মধ্যে বন্টিত হয়ে গেলে একই সঙ্গে অনেকগুলো সালযুকি রাজত্বের আবির্ভাব ঘটে । পারস্যের ইতিহাসে এটা একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যায় । কেরমান, খোরাসান, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি বিচিত্র অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সালযুকি ব্যবস্থা । তবে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল সালযুকি সম্রাটদের মত উত্তরকালের এসব সম্রাটের অনুকূল পরিচর্যা থাকবার ফলে সালযুকি রাজদরবারগুলো বিরতিহীনভাবে মেধাবী-বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে দেখা দেয় । জ্ঞান ও সাহিত্যে বহুমুখিতার ঐতিহ্য সালযুকিদের শাসনকালে গড়ে ওঠে এবং তা সুদীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে পারস্যে । তাসাউফ, সুফিতত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, অধ্যাত্মপ্রেম এসব বিষয় নিয়ে রচিত হয় অজস্র কাব্য ও নানা গ্রন্থ । (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব, পৃ: ৬২২)এ যুগেই

আবির্ভূত হ'ন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি ফরিদউদ্দীন আত্তার। তাঁর আধ্যাত্মিক মসনবি ও গযল-গ্রন্থ *মানতেকুত্ তায়ের* এবং আধ্যাত্মিক গদ্যগ্রন্থ *তাযকেরাতুল আউলিয়া* ফারসি সাহিত্যে অনন্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। সালযুকি যুগের শেষে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের সাম্রাজ্য বিস্ময়কর সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। ফারসি সাহিত্য সমালোচকের পরিসংখ্যান থেকে সেটা স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। প্রায় সকল সাহিত্য-সমালোচকের মতে কাব্য-গীতি-গযল-গদ্য ইত্যাদি বিচিত্র আঙ্গিকের রচনায় এবং বিচিত্র ভাবনার সমন্বয়ে পারস্যের সাহিত্য সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে গর্ব করার মত অবস্থানে পৌঁছায়। ফারসি সাহিত্যের একজন সমালোচকের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য– "ফারসী সাহিত্যের অমর ভাষ্যকার আসাদীর 'তারিখ-ই-গুজিদা', 'গুরসাস্পনামা', আওফীর 'লুবাব', নিজাম-ই-আরোদীর 'চাহার মাকালা' ইত্যাদি সংকলন গ্রন্থে যেসব কবি-সাহিত্যিকদের সমালোচনা স্থান পেয়েছে তাতে তাঁদের সংখ্যা কয়েক হাজার।" (সাত্তার[৫৩]

: তদেব, পৃ: ১১) পরবর্তীকালে মুঘল-তৈমুর যুগের ইতিহাস ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই এক শাসনামল থেকে অন্য শাসনামলে মোড়-পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়েই ঘটেছিল। এর ফলে এক আমলে সঞ্চিত সম্পদ কখনও-কখনও অন্য আমলে এসে অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়। সেই সম্পদ অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয়ই হতে পারে। কোনো-কোনো দেশ ও জাতি মোড়-পরিবর্তনের সময়কার ক্ষতিকে আর সামলাতে পারে নি, আবার কোনো-কোনো জাতি সেই ধ্বংস ও ক্ষতিকে সামলে নিয়ে পুনরায় নতুন সৃষ্টির স্ফূরণে বিকশিত হয়েছে নতুন সম্ভাবনায়। পারস্যের ইতিহাস তারই সাক্ষী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচক। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাবের মাধ্যমে পারস্যে মোঙ্গল বা মুঘল আধিপত্যের সূচনা হয়। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পারস্য ভয়ানক বিপর্যয়ের শিকার হয়। পারস্যের অর্থ-বৈভব-বস্তুগত-মননগত-শিল্পগতইত্যাকার সব ধরনের ক্ষতিসাধন করে মোঙ্গলরা। তাদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় হাজার-হাজার গ্রাম-লোকালয়-জনপদ। গণহত্যায় নিহত হয় অসংখ্য মানুষ যাদের মধ্যে ছিলেন বিপুল সংখ্যক পন্ডিত-মণীষী। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বহু মূল্যবান গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাদি। ইসলামী বিশ্বকোষ অনুসারে (তদেব, পৃ: ৬২৫) যেসব মনীষী সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তাঁদের অনেকেই প্রাণরক্ষার তাগিদে জন্মভূমি ইরান ত্যাগ করে অন্যান্য জায়গায়, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজদরবারে আশ্রয় নেন, সংশ্লিষ্ট হ'ন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃত্তে।

মোঙ্গল আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের পরেও গৌরবময় পারস্য সাম্রাজ্যের পুনর্জাগরণ ঘটে। মোঙ্গলদের পরে তৈমুর যুগে ফারসি ভাষা-সাহিত্য এর সামূহিক ক্ষতির রেশ কাটিয়ে পুনরায় সৃষ্টিশীলতায় বিবর্তিত হতে শুরু করে। হিজরি অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে (খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দী) ট্রান্সঅক্সিয়ানা থেকে আসা আরেকজন মোঙ্গল শাসক রাজ্যজয়ী তৈমুরের আবির্ভাব হয়। কালক্রমে এই শাসক ট্রান্সঅক্সিয়ানা থেকে শুরু করে ইরান, বাগদাদ, ভারত, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে নেন। তৈমুর মুসলমান হওয়ার কারণে অধিকৃত অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্যের ওপর নমনীয়তা প্রদর্শন করেন তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী। সমালোচক এমন কথাও বলেন, তৈমুরের সন্তান শাহ্রুখ ইরানী বরং শিল্প-সাহিত্যের প্রভূত উন্নয়ন ও সুপরিবর্তনের জন্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাছাড়া তৈমুরের উত্তরসুরীরা হেরাত অঞ্চলকে একটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অঞ্চলে পরিণত করেন। হেরাত ও খোরাসানের মধ্যে তৈরি হয় সেতুবন্ধন যার প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। (তামীমদারী[২১] : তদেব, পৃ: ৫৭) তৈমুরযুগের এক জগদ্বিখ্যাত মহান কবির নাম মওলানা জালালউদ্দীন রুমী। মসনবি-গ্রন্থ রচনা করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। অধ্যাত্মবাদ ও সুফিতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বর্ণনা কওে রুমী সুফিতাত্ত্বিক কাব্য-রীতিকে সমৃদ্ধ ও গৌরবময় করেন। এ-যুগেরই আরেক বিখ্যাত কবি সাদী শিরাযী যিনি তাঁর *গুলিস্তান* ও *বোস্তান* কাব্যের জন্যে স্মরণীয়। এ-যুগে ফারসি সাহিত্য বহু কবি-লেখকের রচনায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে যাঁদের প্রভার আজও বর্তমান।

তৈমুর যুগ অবসিত হওয়ার পর ফারসি সাহিত্যের দু'টি ধারা দু'টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। এই ভিন্নতার প্রাথমিক কারণ ভৌগোলিক। একটি ধারার স্থানগত পরিপ্রেক্ষিত হলো পারস্য– সাফাভী রাজ-শাসনকে আশ্রয় করে এখানে বিকশিত হয় ফারসি সাহিত্য। আরেকটি ধারা ভারতবর্ষে সম্রাট বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল শাসনকেন্দ্রিক। মুঘল শাসকরা ভারতবর্ষে শিল্প-সাহিত্যের

পৃষ্ঠপোষকতা করে একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। আজও আমরা বিভিন্ন ঘরানা বলতে যে 'মুঘল ঘরানা'র উল্লেখ করি তা একদিনে হয় নি, এর পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘ-ধারাবাহিক সাধনা ও চর্চার ইতিহাস, শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে সেটা কখনও সম্ভবপর হতো না। ফারসি সাহিত্য সমালোচক লিখেছেন– "উভয় রাজশাসনই দেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৭৪) মুঘল সম্রাট আকবরের যুগে এসে মুঘল-ঘরানার সাহিত্য-শিল্পের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে। পৃষ্ঠপোষকতার দিক থেকে সম্রাট আকবর ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর নবরত্নখচিত রাজদরবার গুণিদের খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদাউনী উল্লেখ করেন যে প্রায় একশ' সত্তর জন পারস্যদেশীয় কবি ভারতে চলে আসেন। আসলে মুঘলদের সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তাঁরা পাড়ি জমিয়েছিলেন ভারতবর্ষে।

হিজরি দশম শতকে (ষোড়শ খ্রিস্টাব্দ) ইরানে সাফাভী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই শত বছরের সাফাভী যুগের পর আসে আফশারী রাজবংশের যুগ। তাদের পর প্রতিষ্ঠা পায় যান্দীয়ে শাসন। যান্দীয়দের পরে ইরানে শাসন চালায় কাজার রাজবংশ। ভারতবর্ষে আকবর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব– এই তিনজন মুঘল সম্রাটের দীর্ঘকালীন শাসনের ফলে সেখানে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের চর্চা একটা শক্ত ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যায়। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ফারসির প্রচলন থেকে যায়, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এসেও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ফারসির গুরুত্ব সঙ্গে-সঙ্গে হ্রাস পায় নি। কোম্পানির শাসন-মেয়াদের প্রায় আট দশককাল পরে বহু প্রক্রিয়া-সাধিত হওয়ার ফলেই কেবল ইংরেজি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাই বলা যায় মুঘলযুগেই ফারসি ভাষা-সাহিত্য ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী শেকড় বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। একই সমান্তরালে ইরানে বিভিন্ন রাজবংশীয় শাসন অব্যাহত থাকলেও ক্ষমতার বিচিত্র রদবদল এবং একেক সময়ে একেক অঞ্চলের উত্থান-পতনের ওপর নির্ভর করতে থাকে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের মূল মানচিত্রের বিবর্তনের রেখাচিত্র। এর মধ্যেও ফারসি সাহিত্য বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিপুষ্ট হতে থাকে। আরবি ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ, অলংকারবহুল ফারসি গদ্য সাহিত্যের বিস্তার, বীরত্বগাঁথা-ধর্মযুদ্ধনির্ভর কাব্য, আধ্যাত্মিক প্রেমের কাব্য, নতুন-নতুন বিষয়সমৃদ্ধ মসনভি, বিচিত্র অভিধানগ্রন্থ এরকম নানা প্রকারের সাহিত্যকর্ম ফারসি ভাষা-সাহিত্যকে ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। কালের ধারাবাহিকতায় ফারসি সাহিত্য বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে ফারসি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে গেছে। ফারসি সাহিত্যের আলোচনায় পারস্য ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একথাও সত্য কখনও-কখনও কবি-সাহিত্যিক তথা সৃজনশীল শিল্পীরাই একটা যুগের পরিচিতি তুলে ধরেন সেই যুগের প্রতিনিধি হয়ে। মওলানা জালালউদ্দীন রুমির জন্যে মানুষ শাসক তৈমুরকে স্মরণ করে, তৈমুরের জন্যে রুমীকে নয়।ফারসি সাহিত্যের অমর দিকপাল সাদী. রুমী, জামি, হাফিজ, খৈয়াম এঁদেরকে বলা হয় যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টা যাঁদেরকে যুগ সৃষ্টি করে নি, বরং যাঁরা নিজেরাই যুগের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ফারসি ভাষার ঐশ্বর্যকে নিজেদের রচনাকর্মে প্রকাশ করেছেন বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ে। নিজেদের সময়ের চরিত্রকে সাহিত্যে ধারণ করেছেন সার্থকতার সঙ্গে, একই সঙ্গে তাঁদের সাহিত্য হয়ে উঠেছে চিরন্তনতার অভিসারী। বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক সাহিত্যেরমানচিত্রে ফারসি সাহিত্যের অবস্থান অত্যন্ত গৌরবের। সেই গৌরব ও সমৃদ্ধি সঞ্চিত হয়েছে বহু ঘটনার তরঙ্গধারায়, বহু ব্যক্তিত্বের সংশ্লিষ্টতায়, বহু সৃজন-ঔজ্জ্বল্যের পরম্পরায়।

ফারসি সাহিত্য-সমালোচক এবং সাহিত্যেতিহাসকাররা বিভিন্ন আঙ্গিকে ফারসি সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। সমালোচকদের অনেকেই রাজনৈতিক তথা রাজবংশীয় যুগ-পরম্পরাকে বেছে নিয়েছেন ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগের মানদন্ড হিসেবে। অনেকেই প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক এই সরল বিন্যাসে যুগবিভাগ সাজিয়েছেন ফারসি সাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টিকে মূল্যায়ন করবার জন্যে। আবার কোনো-কোনো সমালোচক প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় এমন কালানুক্রমে ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন যুগকে সূত্রবদ্ধ করে সেসব যুগের সাহিত্য-বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। উইকিপিডিয়াতে শতাব্দী-পরম্পরা-পদ্ধতিতে ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগ লক্ষ করা যায়। তবে যেভাবেই যুগবিভাগের মানদন্ড নির্মিত হোক না কেন তাতে ফারসি সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূল্যায়ন ব্যাহত হয় না।

ফারসি সাহিত্যের বিকাশ পর্যালোচনা করবার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহের মূল্যায়ন উপস্থাপন করছি।

ফারসি ভাষা-সাহিত্যের মূল্যায়নে প্রথম বিশ্ববিখ্যাত যে-গ্রন্থটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হলো এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন বা ই. জি. ব্রাউন রচিত *এ লিটারেরি হিস্ট্রি অব পারসিয়া*– এটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯০২ সালে এবং এর সর্বমোট চারটি খন্ড প্রকাশিত হয়। (ব্রাউন[৭৮] : ১৯২৯, তদেব) ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্রাউন পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে পারস্যে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারের ঐতিহাসিক পটভূমিটিও তাঁর বিবেচনায় ফারসি সাহিত্য-বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাবাহী। তাই ব্রাউন তাঁর গ্রন্থে ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী যুগের ফারসি সাহিত্যের পর্যালোচনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইরানে ইসলামের আগমন এর ভাষা-সাহিত্যেও বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া রাজবংশীয় কালানুক্রমটিও তাঁর

বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সাসানি, সালযুকি, গাযনাভি, সানযার, মোঙ্গল প্রভৃতি যুগের নিরিখে ফারসি সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন ব্রাউন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল রচিত *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থটি। (পাল[৩৪] : ১৩৬০ বাংলা, তদেব) এটিও বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়নকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর বিবেচনায় রাজনৈতিক তথা রাজবংশীয় মানদন্ডটি ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। গাযনাভী, সালযুকি, মুঘল, তৈমুর, সাফারি, কাজারি প্রভৃতি যুগ-পরম্পরার শেষে 'বর্তমান যুগ'-শিরোনামে তিনি তখনকার সাম্প্রতিক পারসি সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। *ক্ল্যাসিক্যাল পারসিয়ান লিটারেচর* শীর্ষক গ্রন্থে এ. জে. আরবেরি ফারসি সাহিত্যের মনোজ্ঞ সমালোচনা রচনা করেছেন। এ-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৫৮ সাল। (আরবেরি[৭৫] : ১৯৫৮, তদেব)আরবেরি তাঁর গ্রন্থে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। একদিকে তিনি রাজবংশীয় এবং রাজনৈতিক মানদন্ডে (যথা: সালযুকি, গাযনাভী, মোঙ্গল, তৈমুর প্রভৃতি) এবং অন্যদিকে কালিক মানদন্ডে (যথা: ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ প্রভৃতি) ফারসি সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় আবদুস্ সাত্তার রচিত গ্রন্থ *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*। (সাত্তার[৫৩] : ১৯৭৯, তদেব) তিনি চার পর্বে ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন–সূচনাপর্ব ও ক্রমবর্ধমান যুগ, গৌরবময় যুগ, আধুনিক পূর্ব-যুগ এবং আধুনিক ফারসী সাহিত্য। তবে আবদুস্ সাত্তার কালানুক্রমিক মানদন্ডটিকে অনুসরণ করে তার পরিসীমায় একই সঙ্গে সেই-সেই কালের আয়তনে প্রাসঙ্গিক সম্রাট কিংবা শাসকদের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যের ক্রমবিকাশে সমকালীন রাজত্বের সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস সমান্তরালে বিবেচ্য। ১৯৯৮ সালে ইরানি সাহিত্য-সমালোচক ড. আহ্মাদ তামীমদারী রচিত *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় যেটি পরে ২০০৭ সালে তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী কৃত বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হয়। (তামীমদারী[২১] : ২০০৭, তদেব) ড. আহ্মাদ তামীমদারী'র গ্রন্থ থেকে ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুত তাঁর এ-যুগবিভাগ-পদ্ধতিটি ফারসি সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচনা করা যায়। খানিকটা দীর্ঘ হলেও ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়নের দিক-নির্দেশনায় তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য–

> "নিঃসন্দেহে ফার্সী সাহিত্যের উদ্ভব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এর অগ্রগতি ও চলার পথে রাজনৈতিক যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে সময় বা কালের এই স্তরগুলো 'সাহিত্যের যুগ' নামে পরিচিত। এই যুগে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক হুকুমাত বা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এসব হুকুমাতের অনুসারী সে অঞ্চলের যেসব সাহিত্যিক, মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। ফার্সী সাহিত্যের যুগগুলোকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। মুহাম্মদ তাকী বাহার সর্বপ্রথম ফার্সী গদ্য সাহিত্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। প্রথম যুগ হলো সামানী রাজত্বের সূচনাকাল থেকে অর্থাৎ হিজরী চতুর্থ

শতকের প্রথমার্ধ (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) থেকে শুরু হয় এবং তা হিজরী পঞ্চম শতকের শেষার্ধ (খ্রিস্টীয় একাদশ শতক) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় যুগ হিজরী ষষ্ঠ শতক (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম দিক) থেকে শুরু করে হিজরী অষ্টম শতক তথা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ধরা হয়। তৃতীয় যুগ হলো হিজরী অষ্টম শতক (খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক) থেকে শুরু করে হিজরী ত্রয়োদশ শতক (খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতক) পর্যন্ত। চতুর্থ যুগ হলো সাহিত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ– যা হিজরী দ্বাদশ শতক (খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) থেকে শুরু করে হিজরী চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তথা খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। উপরে উল্লেখিত চারটি যুগ ছাড়াও

যদি বর্তমান কালকে এর সাথে যুক্ত করি তবে ফার্সীসাহিত্যে দারী (প্রাচীন ফার্সী ভাষা) সাহিত্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মোট পাঁচটি যুগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

তামীমদারী'র ফারসি সাহিত্য-বিশ্লেষণেও আমরা দেখতে পাই, পারস্য সাম্রাজ্যে বিভিন্ন রাজত্বকাল এবং পারস্য, সেখানকার বিভিন্ন প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বিস্তৃত ফারসি সাহিত্যিক তৎপরতাকে সমন্বিত করে ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেসঙ্গে তিনি বিভিন্ন যুগে ফারসি সাহিত্য কাব্য ও গদ্যে যেসব শৈলী বা আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটেছে সেসবেরও পর্যালোচনা করেছেন। যদিও এটা দেখা যায়, যেসব শৈলীর আলোচনা তিনি করেছেন সেসব শৈলী কোনো না কোনো কবি বা গদ্যশিল্পীরই উদ্ভাবনা তবু তামীমদারী'র বিশ্লেষণে সেসবের ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটও উঠে এসেছে। এতে করে ফারসি সাহিত্যের বিকাশের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গ্রন্থে। অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী রচিত *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। এ-গ্রন্থে ২২৬ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফারসি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। তাঁর আলোচনায় মূলত তিনটি পর্বে ফারসি সাহিত্যের যুগবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে প্রাচীন ফারসি সাহিত্যের বিকাশের ধারা, দ্বিতীয় পর্বে সাসানি যুগ ও ইসলাম-পরবর্তী যুগে ফারসি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং তৃতীয় পর্বে সামানি যুগের নিরিখে ফারসি সাহিত্যের বিবর্তন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ফারসি সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজত্বকালের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে ফারসি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গির সম্পর্কও অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিভাবান-যুগন্ধর কবি-সাহিত্যিকদের স্ফূরণও ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দিক। তাছাড়া পারস্যে ইসলাম ধর্মের আগমনের ফলে আরবি-ফারসি ভাষা-সাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগের ফলেও ফারসি সাহিত্য প্রভাবিত হয়। আরবি ভাষার সাহিত্যশৈলীরঅনুকরণে বেশ কিছু ফারসি সাহিত্য রচিত হওয়ার নজীরও আমরা পাই। রাজনৈতিক তথা বিভিন্ন রাজত্বকালের প্রেক্ষাপটে যুগবিভাগের ক্ষেত্রে ফারসি সাহিত্যের কালানুক্রমটিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যই একটা প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নততর অবস্থানে পৌঁছায়। ভাষার প্রাথমিক স্তরের যেসব নমুনা মেসোপটেমিয়, এসিরিয়, মিশরিয়, গ্রিক প্রভৃতি সভ্যতায় পাওয়া যায় সেগুলো এতই বিচ্ছিন্ন ও আদি উপকরণে উৎকীর্ণ যে তাতে সেই সভ্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রাচীন পারসি যুগের যেসব ভাষার কথা পন্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন– মাদি, সেকায়ি, প্রাচীন ফারসি, আভেস্তায়ি– এগুলো চামড়া, ধাতু, প্রস্তর ও পর্বতের গায়ে খোদিত হতো। প্রাচীন শিলালিপিতে ফারসি ভাষার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন পাহলভি ভাষা যাকে আভেস্তায়ি ভাষা বলা হয় তা-ও সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিলুপ্তির কবলে পড়ে। কিন্তু এই ভাষা ফারসি জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা বিশাল অবলম্বন হিসেবে ফারসি ভাষা-সাহিত্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। ইরানি ভাষার ভৌগোলিক মানচিত্রের ব্যাপ্তি থেকে বোঝা যায়, ফারসি সাহিত্যের রসবৈচিত্র্য এবং জীবন ও সমাজের বহু প্রকারের প্রতিফলন এক সুদীর্ঘ জীবনপ্রবাহের বহিঃপ্রকাশ। যিশুখ্রিস্টের জন্মের তিনশ' বছর পরে বা তৃতীয় শতক থেকে ফারসি সাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ বলে সমালোচকেরা মনে করেন। রাজনৈতিকভাবে এটি সাসানি যুগ (২২৯-৬৫২ খ্রিস্টাব্দ)

নামে পরিচিত। সম্রাট আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেক গ্রিক শাসক পারস্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। সাসানি আমলে প্রকৃত পারস্য ভাবধারার লালন-পালন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চলমান থাকে। অনেক সমালোচকের ধারণা, পাহলভি ভাষায় রচিত যারতুশ্‌তীয় ধর্মগ্রন্থ *মাযদা ইয়াসনা* সম্পর্কিত প্রাপ্ত মূল হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ এ-যুগেরই। (সিরাজী[৫৯] : ২০১৪, তদেব, পৃ: ২২)সাসানি'রা ইরানের প্রাচীন পাহলভি সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, যেজন্যে সেসময়ে পাহলভি ভাষায় অনেক রচনার সৃষ্টি হয়েছিল যার অনেকখানিই কালের নেপথ্যে চলে যায়। কিন্তু যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে সমালোচকেরা মনে করেন, পারস্যে ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বেও একটি সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারা বিদ্যমান ছিল। পাহলভি ভাষায় রচিত নিদর্শনসমূহ তারই স্বাক্ষর। শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল লিখেছেন, "সাসানীয়দের রাজত্বকালে কবিতা ও গানের চর্চাও যে ছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। গায়হ 'বার্‌বুদ্'এর নাম চির প্রসিদ্ধ। তিনি 'বর্‌বুদ্' (বীণা) ও চঙ্ এর সাহায্যে সুমধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া সাসানী দরবার মুখরিত করিয়া গিয়াছেন।" (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২০-২১০) সাসানি যুগের রচনাসমূহকে ধর্ম ও নীতিকথামূলক রচনা বলে সাহিত্য-সমালোচকেরা বিবেচনা করে থাকেন।

১৪

ফারসি ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে আরব প্রভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পারস্যে আরব তথা ইসলাম ধর্মের আগমনের ফলে ইরানের প্রচলিত সংস্কৃতি অনেকখানি বদলে যেতে শুরু করে। এর প্রভাব রাষ্ট্রে-সমাজে-সংস্কৃতিতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। সাহিত্যও এর বাইরে থাকে না। এসময়কার সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ফারসি ভাষা-সাহিত্যে আরবি প্রভাব সত্ত্বেও ফারসি সাহিত্য এর নিজস্বতার প্রতিফলনেও পিছিয়ে থাকে নি। বলা যায় ফারসি ভাষা-সাহিত্যে আরবি প্রভাব ফারসি ভাষা-সাহিত্যের শক্তি ও সম্ভাবনার একটি ক্ষেত্র হয়ে দেখা দিল। সপ্তম শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত প্রায় আড়াই শ' বছর এই ধারা বজায় থাকে। এ-প্রসঙ্গে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসকার যথার্থই বলেন যে– "মুসলমান কর্তৃক পারস্য জয়ের পরও অগ্নি উপাসকদের ধর্মীয় কর্মকান্ড যেমনি থেমে যায়নি তেমনি পাহলভি ভাষায় তাদের লেখালেখির ধারাবাহিকতাও বাধাগ্রস্ত হয়নি।" (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৩৬) বর্তমান অধ্যায়ের গোড়ার দিকে ইসলামোত্তর ইরানে আরবি-ফারসি উভয় ভাষার আন্তর্মেশামেশির প্রসঙ্গে পারসি ভাষার একটা নতুন চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত পারস্যবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন আরবি ভাষা গৃহীত হয় তেমনি আরবি ভাষার প্রভাবে ফারসি ভাষার প্রচলিত রূপও ক্ষেত্রবিশেষে পাল্টে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আরবি-ফারসি সমন্বিত ভাষা-চর্চা সাহিত্যে নানারকম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে পারস্যের রাজদরবারে আরবি এবং ফারসি উভয় ভাষাতে কাব্যচর্চা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। দুই ভাষার মধ্যে যোগসূত্রিতা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে যার ফলে অনুবাদকর্মের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এসময় পাহলভি ভাষা থেকে বিভিন্ন গ্রন্থের আরবি অনুবাদ ফারসি সাহিত্য-বিকাশের ইতিহাসে তাৎপর্যপপূর্ণ ঘটনা। শাসকগণও অনুবাদকর্মকে প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করেছেন।

ফারসি সাহিত্যের সমালোচক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পালের মতে আরবি আধিপত্যের পর ফারসি সাহিত্য নতুনতর চরিত্র অর্জন করলেও ফারসি কাব্যের চর্চা পারস্যে আগে থেকেই ছিল এবং সেটা সম্রাটদের দ্বারা প্রশংসিতও হয়েছিল। (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২৮) ফারসি সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-সমালোচক ব্রাউন এর মতে, ফারসি কবি রূদকি'র কবিতা ফারসি সাহিত্যের আদি যুগের সম্পদ। (ব্রাউন[৭৮] : ১ম খন্ড, তদেব, পৃ: ১৭) তিনি তাঁর কবিতাকে সুর করে যন্ত্রযোগে গাইতেন এবং সামানি রাজদরবারের তিনি ছিলেন অলংকারের ন্যায় ।ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মতে সাসানি যুগেই ফারসি কবিদের কবিতা অত্যন্ত রসগ্রাহী ও আবেদনসৃষ্টিকারী হতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিভাবান ফারসি কবিরাই আবার আরবিতে বা পাহলভি-আরবি সাহিত্যের অনুবাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সেই সময়কার এমন ফারসি কবির রচনার নিদর্শনও পাওয়া যায় যাঁর ভাবনা ও দর্শন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিকের বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এরকম একজন কবি ছিলেন আবু শুকর্ বল্‌খি। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পালের মতে, তিনিই প্রথম 'মসনবী' বা দুই পংক্তিযুক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতার রচয়িতা যেসব কবিতায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনির আশ্রয় মুখ্য। তাঁর একটি কবিতার উদ্ধৃতি–

تا به آنجا رسید دانشئ من

کی بدانم همی کی ندانم

[অনুবাদ: আমার জ্ঞান এমন স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে আমি বুঝছি যে আমি (কিছুই) জানি না ।] (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ২৮)

বল্‌খি'র কাব্যে বিধৃত ভাবনার সঙ্গে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় । সক্রেটিস বলেছিলেন, আমি একটা জিনিসই জানি যে আমি আসলে কিছুই জানি না । বস্তুত বিলুপ্তির কারণে এরকম আরও অনেক মহৎ সাহিত্যকীর্তি কালের অতলে চলে গেছে । যেসব ইরানি কবি আরবি-ফারসি উভয় ভাষাতে কাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের আরবি ভাষার সাহিত্যের প্রচার-প্রসার ঘটেছে বেশি । প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরবিভাষীদের অধীনে থাকায় ফারসির পরিবর্তে আরবি'র পৃষ্ঠপোষকতা গুরুত্ব পায় । তথাপি বেশ কয়েকজন ফারসি কবির নাম করা যায় যাঁদের উল্লেখ করে থাকেন ফারসি সাহিত্যের সকল ঐতিহাসেকেরাই । এঁরা হলেন– আবদুল্লাহ বিন মুকাফফা, আবু শূকর বল্‌খি, আবুল হাসান শহিদ বল্‌খি, আবু আবদুল্লা জাফর বিন মহম্মদ রুদকি, আবু মনসুর

মহম্মদ বিন আহমদ দকিকী তুসী । অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পর্যানুক্রমিকভাবে তাঁরা সাহিত্যে নিবেদিত ছিলেন ।(জওহর[২০] : ২০১৩, পৃ: ৫৬-৬১) এঁদের মধ্যে রুদ্‌কি'র কথা পূর্বে বলা হয়েছে । তিনি 'ক্বাসিদ', 'রুবাই', 'মসনবী' ইত্যাদি রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত । পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতা ও ঐতিহ্যপন্থী ইরানি শাসকদের রাজত্বকালে ফারসি সাহিত্য বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে প্রতিভাবান-মেধাবী কবিদের বহুমুখি রচনায় ।

ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা দেখবো প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবেরও পূর্ব থেকে পারস্যে আর্য জনগোষ্ঠি উন্নত স্তরের সভ্যতার জন্ম দেয় এবং তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি এবং বিভিন্ন দেবতায় বিশ্বাস করতো । ইসলাম ধর্মের আগমনের পর তাদের মধ্যেপ্রতিষ্ঠিত হলো একত্ববাদ । কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আচার-আচরণ-অভ্যাস এবং চিন্তা-ভাবনায় পারস্যের লোকেরা ছিল আরবদের চাইতেস্বতন্ত্র । ইসলাম ধর্মও তাদের সেই স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারে নি । আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন যুগে পারস্যে যেসব মহান চিন্তাবিদ-দার্শনিক এবং কবি-সাহিত্যিক তাঁদের ভাবনা ও কর্মের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাঁদের ভাবনা ও কর্মের মূলে নিহিত একটি বিশেষ জীবনপ্রণালী । সেই জীবনপ্রণালীটি একান্তভাবেই পারস্যদেশীয় । বর্তমানে বিশ্বে যে সুফিবাদের ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা তার মূল পারস্য সভ্যতায় নিহিত । ফারসি কবিদের কবিতায় প্রকৃতি-প্রেম-নারী-অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতির যে-প্রকাশ আমরা লক্ষ করি তা পারস্য সভ্যতা ও জনগোষ্ঠির জীবনের গভীর থেকে নিষ্কাষিত হয়ে আসা প্রবাহ যা যুগ-যুগ ধরে বহমান । পূর্বে উল্লেখকৃত ড. আহমাদ তামীমদারী'র গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, আল-কিন্দী, আহমাদ বিন তাবিব সারাখসী, আবু মায়াশার বালখী, আবু নাস্‌র ফারাবী, মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া রাযী, আবু সুলায়মান সেজিস্তানী, আবু আলী সীনা, আবু রায়হান আল-বিরুনী এঁদের চিন্তা-দর্শন-তত্ত্ব যে সময়টাতে বিস্তৃতি লাভ করছে তখন ইরানে স্বদেশ এবং স্ব-সংস্কৃতিসচেতন শাসকগণ নিজেদের জীবনচেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছিলেন রাষ্ট্রে এবং সমাজে । কাজেই সেই সমান্তরালে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের কারিগর তথা কবি-সাহিত্যিকগণও তাঁদের রচনায় পারস্যের স্বকীয়তাকে তুলেধরার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন ।

তাহেরি, সাফফারি এবং সামানি যুগের সর্বমোট প্রায় দুইশ' বছর ফারসি সাহিত্যের জন্যে একটা ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । পরবর্তীকালে তার পথ ধরেই ফারসি সাহিত্য আরও গৌরবের শিখরে পৌঁছায় । পারস্য সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানি, খোরাসান এবং নিশাপুর এই দু'টি অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবেই ইরানে আলাদা মর্যাদা ও গুরুত্ব বহন করে । অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম এসব অঞ্চলে । তাছাড়া বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বের ইতিহাস থেকেও দেখা যায়, অঞ্চলদু'টিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাটা শাসকদের কাছেও ছিল বিশেষ মান-মর্যাদার বিষয় । তাহেরি যুগের কবি হানযালায়ে বাগদেইসির কাব্যে পারস্য জাতির উদ্দীপনার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় । হানযালায়ে মূলত আফগানিস্তানের বাসিন্দা হলেও তাহেরি সম্রাট আবদুল্লাহ বিন তাহেরের শাসনামলে (৮২০-৮৭২ খ্রি:) তিনি নিশাপুরে বসবাস করতেন । তাঁর একটি কবিতার অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী কৃত অনুবাদের উদ্ধৃতি–

مهتری گر بکام شیر دراست

شو خطر کن ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و غز و نعمت و جاه

یا چو مردانت مرگ رویاروی

"নেতৃত্ব আর মহত্ত যদি সিংহের থাবার মাঝেই থাকে,

তবে যাও ঝুঁকি নিয়ে সিংহের থাবা থেকে তা কেড়ে নিয়ে আস।

হয় তুমি মান-মর্যাদা, বড়ত্ব ও নেয়ামতের অধিকারী হবে,

অথবা বীরত্বের ন্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি হবে।" (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৬৮)

হানযালা বাগদেইসির এই কবিতাটিতে যেসব প্রতীক ও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তাতে জীবনের মহত্ব ও বিশালতার সন্ধান মূল বিষয়। একজন কবি তাঁর কাব্যের ভাষায় এমন ওজস্বিতার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, কবির চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতিকেই তিনি বাণীরূপ দিচ্ছেন কবিতায়। সেই সময়কার স্বাদেশিকতার প্রেক্ষাপটে কবি হানযালায়ের কবিতার 'ঝুঁকি', 'সিংহের থাবা' এবং 'কেড়ে' প্রভৃতি শব্দ বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে। এসব শব্দ পারস্য জাতিসত্তার মহিমার প্রচারক।

তাহেরি যুগের পরে সাফারি যুগে স্বাদেশিকতার ধারা আরও জোরালো হয় এবং এই সময়ে সমাজসচেতন কবিতার ক্ষুরধার প্রকাশ ফারসি কবিতায় বিশেষভাবে আবেদন সৃষ্টি করে। সামাজিক নানা অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলাকে আক্রমণ করে কবিতা রচনা কাব্যের সামাজিক ভূমিকার বিষয়টিকে অনেককাল আগেই ফারসি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেয়। অনেক কবির মধ্যে চারজন কবির নাম করা যায় যাঁরা সমালোচকদের দৃষ্টিতে পৃথকভাবে মনোযোগের দাবীদার। এ-চারজন হলেন– ফিরুয মাশরেকি, আমর বিন লাইছ, আবু সালিক গুরগানি এবং মুহাম্মদ বিন ওসিফ সিস্তানি। আবদুস্ সাত্তারের অনুবাদে ফিরুয মাশরেকি'র কবিতাংশ–

"তীরটা যেন একটা পাখী;

সে কেবল জীবন শিকার করে।

ঈগলের পাখার একটি পালক–

মৃত্যুর উৎসবে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যই

ঈগল তার পালকটি নিয়োজিত রেখেছে।

শিকারী ঈগলের পালক

তীরটা; সেও এক পাখী।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৪)

আবু সালিক গুরগানির কাব্যে তীব্র ভাষায় সমাজ-সমালোচনামূলক ভাষার জন্যে প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাঁর একটি কবিতাংশ থেকে উপলব্ধি করা যায়, ফারসি সাহিত্য বহু যুগ আগেও বক্তব্য প্রকাশে কতটা নির্ভীক ছিল। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পারস্যের সমকালীন জীবনে সামাজিক অন্যায়-বৈষম্য ইত্যাদি যেমন ছিল তেমনি এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ক্ষোভ প্রকাশের ঐতিহ্যও ছিল। আবু সালিক গুরগানি'র কবিতাংশ–

"ভাঁড়ামী করে আত্মসম্মান কুড়ানোর চেয়ে

আত্মরক্ত ধুলায় লুটানো ঢের ভারো।

তোষামোদ-নীতি আর মনুষ্য পূজার চেয়ে

মূর্তি পূজাকেই আমি উচ্চে স্থান দেই।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৪)

পারস্যে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের পর সেখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ ইতোমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে। খোদ আরব দেশেও প্রচলিত সংস্কার-ভাবনা এবং আচার-আচরণের সঙ্গে ইসলাম পরবর্তী জীবনধারার ফারাক সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের এই সময়টাতে আরবে এবং ইসলাম-প্রভাবিত অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নবোদ্ভূত পরিস্থিতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে যেসব শাখা-উপশাখার সৃষ্টি হয় তার প্রভাব চিন্তা ও সৃজনের মধ্যেও প্রতিফলিত হতে থাকে। খারেজি, শিয়া, মুতাজিলা প্রভৃতি মতবাদ আরব দেশে এবং পারস্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মুতাজিলা মতবাদে আকৃষ্ট হ'ন অনেক শিক্ষিত ও পন্ডিত ব্যক্তি। ই. জি. ব্রাউন বলেন যে দশম আব্বাসিয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় থেকে (৮৪৭ খ্রি:) মুতাজিলাদের প্রভাব কমে এলেও তা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে আবারও শক্তি অর্জন করেছিল। (ব্রাউন[৭৮] : ১ম খন্ড, তদেব,পৃ: ২৮৯) এখানে লক্ষ করার বিষয় ইসলাম ধর্মে এসব শাখা-উপশাখাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হলেও পারস্য সভ্যতার মৌলিক অবদান সুফিবাদ এমনই এক ভাবধারা বয়ে আনলো যেটি এসব দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা বড় আশ্রয় হিসেবে দেখা দিল। চিন্তায়-দর্শনে এবং জীবনের সাধনায় সুফিবাদের লালন আকৃষ্ট করলো অসংখ্য মানুষকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি-সাহিত্যিকেরাও। ইসলাম-পরবর্তী ফারসি সাহিত্যে সুফিবাদের প্রসঙ্গটি তাই অনিবার্য হয়ে আসে। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

"ফারসী সাহিত্যে সূফী তত্ত্ববাদ যথেষ্ট আলোচিত হযেছে। সূফী ধর্মমত পারস্যের প্রায় সকল কবির মধ্যেই অল্প-বিস্তর

প্রভাব লাভ করেছিল। ... ...

প্রাচীন যুগে ইরানীয়দের মধ্যেই সূফীমতের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে ছিল। পরে আরব আধিপত্য এই ধর্মমতবাদকে কোনঠাসা

করে দেয়। সূফী ধর্মমত ইরানীয়দের মজ্জাগত জিনিষকেই চিহ্নিত করেছে।" (জওহর[২০] : তদেব, পৃ: ৬২)

বস্তুত মিশর, সিরিয়া, আরব ইত্যাদি দেশে সুফিবাদের চর্চা হলেও ইরানেইএটি ব্যাপকভাবে পরিগৃহীত হয়। স্বাদেশিকতাপন্থী ইরানী শাসনকালে ক্রমশ ইরানের প্রাচীন চিন্তা-দর্শন নানাভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। পরবর্তীতে গাযনাভি ও সালযুকি যুগে এসে সেইসব চিন্তাধারার আরও বিস্তার ঘটে। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে পরিগণিত।

ইতঃপূর্বে ইরানের রাজনৈতিক কালক্রম প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, সামানি সাম্রাজ্যে (৮৭৪-১০০০ খ্রি:) ফারসি সাহিত্যের বিকাশ দৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করেছিল। সামানিদের শেকড়গাঁথা ছিল প্রাচীন ইরানে, যার ফলে এঁরা নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাছাড়া পারস্য, তৎসন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চল ও অন্যত্রও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের দিগন্তও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তখন থেকে সৃষ্টি হতে শুরু করে। সামানি যুগের এ-অগ্রগতির ফলে ফারসি সাহিত্যজগতে বিভিন্ন ধারার সাহিত্য রচিত হতে থাকে এবং কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। স্বয়ং রাজপৃষ্ঠপোষকতা ও সম্রাটদের সুদৃষ্টির ফলে কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তাঁদের সকলেরঅবদান সমান সাফল্যমন্ডিত না হলেও তাঁদের অনেকের

রচনাই কালের বিবর্তনে আজও ফারসি সাহিত্যের গৌরব ও মহিমাকে বহন করে চলেছে।*লুবাবুল আলবাব* শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে সাতাশ জন ফারসিভাষী কবি-সাহিত্যিকের নামোল্লেখ রয়েছে। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৭৬) অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী'র পূর্বে উল্লেখকৃত *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেসব স্বনামধন্য কবিরা সে-যুগকে আলোকিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– রুদাকি, আবু মনসুর দাকিকি তুসি, আবু শাকুর বাল্‌খি, মাসউদ মারভাযি, রাবেয়া বিনতে কা'ব কুযদারি বাল্‌খি, আবুল হাসান শাহিদ বাল্‌খি, আবু শোয়াইব হেরাতি, আবু ইসহাক জুয়বারি, খোব্বাজি নিশাপুরি, আম্মারা মারভাযি, কাসায়ি মারভাযি, আবু তাইয়্যেব মাসয়াবি, আবুল ফাতাহ বাস্‌তি, মানতেকি রাযি, খসরুয়ে সারাখসি ও আসাদি তুসি। গদ্যসাহিত্যেও অনেকেই ছিলেনযাঁরা ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়– যেমন: আবু মনসুর বিন আবদুল্লাহহিল আমারি, আবু আলী মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বালয়ামি, আমেরী নিশাপুরি, মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারি, মানসুর বিন নুহ, আবুল মুয়াইয়্যেদ বাল্‌খি, আবুল হাসান শাহিদ এবং আবু রাইহান আল বিরুনি।

উপর্যুক্তকবি-সাহিত্যিকেরাতাঁদের রচনার মাধ্যমে সমকালীন মন ও মানসকে আলোড়িত করেছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের

ঐতিহাসিকদের নিকটে তাঁদের রচনার মূল্য আজও কমে নি। আবু শাকুর বালখি'র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যিনি প্রথম মসনবি (দ্বিপদী)আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছিলেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। *অফারিননামে* শীর্ষক তাঁর মসনবি আঙ্গিকের একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। (সিরাজী[৫৯] ; তদেব, পৃ: ৭৮) তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য নীতিধর্মিতা ও শিক্ষামূলকতা। একইভাবে প্রথম *শাহনামা*-রচয়িতা হিসেবে স্মরণীয় আবুল মুয়াইয়্যেদ বাল্‌খি। *লুবাবুল আলবাব*-এ বলা হয়, তিনি প্রাঞ্জল গদ্যে যে-*শাহনামা* রচনা করেন সেটা মহাকবি ফেরদৌসির পূর্বসূরী। প্রসঙ্গত বলা যায় তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক রচনার অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর সমকালীন পারস্যের স্বাদেশিকতাপন্থী শাসকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই। এ-যুগের কবিদের বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা নিজেদের স্বাধীন চিন্তার আশ্রয়ে বহুমুখি ভাবের সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শাকুর বাল্‌খি ও মুয়াইয়্যেদ বাল্‌খি'র কথা আমরা বলেছি। আবুল হাসান শাহিদ বাল্‌খি ছিলেন কবি, ক্যালিগ্রাফার এবং দার্শনিক। অনেকের ধারণা কবি শাহিদ বাল্‌খিই প্রথম গযল রচনা করেছিলেন। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৮৬) তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম-বিরহ, জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা এসবের গভীর প্রকাশ রয়েছে। আম্মারা মারভাযি প্রকৃতির বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ইত্যাকার বিভিন্ন উপজীব্য বিষয়াশ্রয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলি তাঁর প্রকৃত কাব্যমেধার ছাপবাহী। হাকিম কাসায়ি মারভাযি'র কবিতায় মানবজীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রভাবের নানা দিক উন্মোচিত হযেছে। তাঁর কাব্যরীতিতে কলাকৌশলের অবলম্বন তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। ড. তারেক সিরাজীকৃত অনুবাদে তাঁর একটি চমকপ্রদ কবিতার উল্লেখ করা যায় যে-কবিতাটির কথা ফারসি সাহিত্যের অনেক সমালোচকই স্মরণ করে থাকেন–

به سیصد و چهل و یک رسید نوبت سال

چهار شنبه و سه روز باقی از شوال

بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم

سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال

"হিজরি তিনশত একচল্লিশ সালের পালা ঘনিয়ে এসেছে

বুধবার, শাওয়াল মাসের এখনো তিনদিন অবশিষ্ট রয়েছে

পৃথিবীতে কী করতে এবং কী বলতে এসেছি?

সম্পদ আর খোদায়ী অবদানের কারণে গান গাবো ও আনন্দ করবো।" (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৯২)

কবি হাকিম মারভাযি রুবাঈয়াৎ-খ্যাত ওমর খৈয়ামের চেয়ে বয়সে বড়। উদ্ধৃত কবিতাটির সুর অনেকটা আত্মগত আর হেঁয়ালিময় যা ওমর খৈয়ামকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও তাঁদের দু'জনের কাব্যের ভাব-আঙ্গিক পারস্পরিক ভিন্ন। ফারসি সাহিত্যে আলো ছড়িয়েছেন এমন মহিলা কবির কথাও বলা যায়। *লুবাবুল আলবাব*-এ রাবেয়া কুযদারিকে অত্যন্ত ধার্মিক ও সুফি কবির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাবেয়া কুযদারির দৃষ্টান্ত থেকে আমরা ধারণা করতে পারি চিন্তা-দর্শন এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে পারস্যের অবস্থান ছিল অনন্য। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মেধা-প্রতিভাকে সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের ঘটনায় সেটাই প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত কবি রুদাকি'র অন্ধত্ব (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ৯৯) সত্ত্বেও তাঁর কাব্যশক্তিকে সম্মান ও কদর করবার ক্ষেত্রে পারস্যবাসীকে কার্পণ্য প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। অনেকে অবশ্য তাঁর অন্ধত্বকে শেষ বয়সের পরিণতি বলে মনে করেছেন। তথাপি রুদাকি'র জীবনী ও সাহিত্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রকৃত সাহিত্যের কদর পারস্যের সাহিত্যজগতে ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। যে-কারণে যুগে-যুগে ফারসি ভাষা-সাহিত্যে যথেষ্টসংখ্যক কবি-সাহিত্যিকের আগমন ছিল অব্যাহত। রুদাকি ছিলেন নবম শতাব্দীর শেষ দিককার একজন প্রতিভাবান কবি। তিনি বহু বিষয়ে ও বহু প্রকারে কাব্য রচনা করেছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষ ও দশম শতাব্দীর আরম্ভ এই

দুই শতাব্দীকে স্পর্শ করেছিল তাঁর জীবন। কেবল একজন রুদাকি'র অবদান সম্পর্কে সমালোচকের মূল্যায়ন থেকেই ফারসিসাহিত্যের সমৃদ্ধিকে উপলব্ধি করা সম্ভব–

> "গবেষকদের মতে তাঁর খন্ড কবিতা, দীর্ঘ-কবিতা, গীতি-কবিতা ইত্যাদির সংখ্যা তেরো লক্ষের মতো। ... ...
>
> আরবী ভাষায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। বিশ্বখ্যাত আরবী লেখক আবদুল্লাহ্ ইবন আল মুকাফ্ফার 'কালিলা ওয়া
>
> দিমনা' গ্রন্থটিও তিনি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাছাড়া আরবী 'আলিফ লায়লা
>
> ওয়া লায়লা'র ফারসী অনুবাদ করেও ফারসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পথ তিনি উন্মুক্ত করেন।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৬)

ফারসিসাহিত্য-সমলোচক ড. তারেক সিরাজী'র মতে, রুদাকির খ্যাতির মূল কারণ তাঁর কাসিদা রচনা। (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ১০৪) তথাপি আমরা তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারকে সামনে রেখে বলতে পারি, রুদাকি যে দরবারের সভাকবি ছিলেন সেটির মর্যাদা তিনি যথার্থই উচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজের সৃষ্টিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন, রাজ-দরবারের আনুকূল্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ রেখে গেছেন এবং সর্বোপরি একটি বিশেষ কালের ফারসি পরিপ্রেক্ষিতকে দিয়েছেন চিরন্তনতা। ফারসী কাব্যের এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন মেধাবী-সংবেদনশীল পারস্যের সাধারণ মানুষ, আর তাকে স্মরণীয় করে রাখবার আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন রাজরাজড়ারা। এভাবেই যুগে-যুগে ফারসি ভাষা-সাহিত্য বিকশিত হয়েছে বৈচিত্র্যের পথ অনুসরণ করে। ফারসি সাহিত্য-সমালোচক যথার্থই মূল্যায়ন করেন ফারসি ভাষা-সাহিত্যের এই গৌরবময় অভিযাত্রার ইতিহাসটিকে। রাজপৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রুদাকি, দাকিকি তুসী, বালয়ামি, ফারাবী নিজেদের প্রতিভার বিচ্ছুরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। কালক্রমে পারস্যে কাব্য-চর্চা যে একটা অত্যন্ত সম্মানের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল তার প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং সম্রাটরাও কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি রচনায় সচেষ্ট হতেন। ইতিহাসে এরকম অনেক পারস্য-সম্রাটের নাম রয়েছে যাঁরা নিজেরাও সাহিত্যচর্চায় উদ্যমী ছিলেন। ফারসি সাহিত্য-সমালোচক তামীমদারী আলে যিয়ারের রাজবংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাদশা শামসুল মা'লী কাবুস বিন ভাশামগীর নিজেও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। (তামীমদারী[২১] : তদেব, পৃ: ৪৭) পারস্যে কবি এবং কবিতার স্থান কতটা উচ্চে ছিল তা রুদাকি'র একটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসবিদ আরবেরি লিখেছেন, কবি শাহিদ বাল্‌খি মৃত্যুবরণ করলে (আনুমানিক ৯৩৭ খ্রি) স্বয়ং রুদাকি তাঁর জন্যে শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন। আরবেরি'র গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতাটি (আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ৩৭) অনুবাদ করলে দেখতে পাই এক কবির প্রতি আরেক কবির শ্রদ্ধাবোধের গভীরতাকে–

> "শাহিদের শবের শকট ঐ চলে যায়:

চোখের আড়াল করো, যেনবা আমারও ধায় ।

দৃষ্টি দিয়ে গুণে দেখি, মৃতদেহ শুধু এক;

মন দিয়ে গুণি, তবে ক্ষতি সহস্র গুণিতক ।"

সামানি যুগের (৬৫২-১০০০ খ্রি) পর থেকে ফারসি সাহিত্যের যে-অগ্রগতির ধারা সে-ধারা পরবর্তীতে আরও বেগবান হযেছে। সংখ্যা-প্রকার-শৈলী সব বিচারেই ফারসি সাহিত্য উন্নীত হয় একটা মজবুত অবস্থানে। বলা যায় ফারসি সাহিত্য কালক্রমে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে অন্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নয়, অন্যতর সাহিত্যকেই প্রভাবিত করতে শুরু করে। বিশেষ করে ফারসি কাব্যের মহিমা পারস্য ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। সামানি যুগের পর থেকে আমরা দেখবো, আরবি প্রভাবের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে ফারসি সাহিত্য এর প্রাচীনতা-ঐতিহ্য-সমকাল প্রভৃতিকে আশ্রয় করে যুগান্তরের অভিমুখী। *পারস্যপ্রতিভা*-খ্যাত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ'র মূল্যায়ন থেকে ফারসি সাহিত্যের গৌরবময় বিকাশের চমৎকার ইঙ্গিত লাভ করা যায়–

"পারস্য সাহিত্যের সৌন্দর্য ও লালিত্য এতই চিত্তাকর্ষক যে দুর্বৃত্ত তাতারগণও ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুস্তান-বিজেতা সম্রাট বাবরশাহ নিজ মাতৃভাষা পশ্চাতে ফেলিয়া ফারসিকে ভারতের রাজভাষার গৌরবময় আসন প্রদান করেন। তদীয় পূর্বপুরুষ মহাতেজা তৈমুরের প্রলয়ঙ্কর হস্তে একদিন হাফেজের জন্য আশীর্বাদের খেলাত ও অগণিত মণিমুক্তা উঠিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় মহম্মদ যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন তাঁহার এই বিজয়োন্মত্ততার ভিতরও তিনি মহাকবি জামীর কবিতার আদর করিতে বিস্মৃত হন নাই।"

(বরকতুল্লাহ[৩৫] :২০০০, পৃ: ১৫)

প্রসঙ্গত আমরা একথা বলতে পারি, পারস্য ছাড়িয়ে যখন সেই ভাষা-উচ্চারণকারী লোকেরা বাস্তবে অনুপস্থিত তখনও ফারসি সাহিত্যই পারস্য-সভ্যতার ভাষার সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ভারতবর্ষের সম্রাট বাবর যখন ফারসি সাহিত্যের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হচ্ছেন সেই সময়টাতে সামানি-পরবর্তী গাযনাভি-সালযুকি যুগের সাহিত্য বিশ্ববাসীকে সচকিত করে ফারসি সাহিত্যের বিজয়নিশান উর্ধ্বাকাশে তুলে ধরেছিল। দিকে-দিগন্তরে আভা ছড়িয়ে পারস্যের কবি-সাহিত্যিকেরা বিস্তৃত করে দিচ্ছিলেন যুগপৎ ফারসি ভাষা এবং ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে। এমনকি নবম-দশম শতাব্দী জুড়ে পারস্য-ইরাক-মিশর-সিরিয়া-আরব প্রভৃতি অঞ্চল নানা রাজনৈতিক মতবাদ ও তোলপাড়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও ফারসি সাহিত্য এর সৃজনের লক্ষ্যে থাকে অবিচল– ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের অমিত সৃজনী-প্রতিভা সব প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে অব্যাহত রাখে প্রকৃত সৌন্দর্যের সঞ্জীবনীকে।

ই. জি. ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (পূর্বে উল্লেখকৃত *এ লিটারেরি হিস্ট্রি অব পারসিয়া*) গ্রন্থে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর পারস্য ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় মিশর-ইরাক-তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ছিল বাগদাদের পূর্ববর্তী খলিফা আল-মামুনের উদারপন্থী শাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রাউন-এর মতে খলিফাদের শাসন-বিরোধী ফাতেমি তথা ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্রসারের কারণেই এমনটি ঘটেছিল। সেই সময়টাতে বাগদাদ থেকে দূরবর্তী পারস্যের খোরাসান, সিস্তান, বোখারা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ফারসি ভাষা-সাহিত্য এর নিজের শক্তি-সক্ষমতা নিয়েই বিকশিত হতে থাকে। স্বাদেশিকতাপন্থী ইরানের শাসন এই পরিস্থিতিতে এলো বিপুল আশীর্বাদ হয়ে। ব্রাউন তাই বলেন, তাহেরি (৮২০-৮৭২ খ্রি:), সাফারি (৮৬৮-৯০৩ খ্রি:) এবং সামানি (৮৭৪-৯৯৯ খ্রি:)যুগ হয়ে গাযনাভি যুগে যখন ফারসি সাহিত্য প্রবেশ করলো ততদিনে ফারসি সাহিত্য তার নিজের পরিচয়ে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখানে ড. তারিক সিরাজীর মন্তব্যটি (তদেব, পৃ: ১২৩) স্মর্তব্য। তিনি ফারসি সাহিত্যের তিনজন কবির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যাঁরা পূর্ববর্তী সামানি এবং পরবর্তী গাযনাভি এই দু'টি যুগকে সন্ধিবদ্ধ করেছেন– এঁরা

হলেন, ফেরদৌসি, উনসুরি এবং আসাদি ।সমকালীন আরও অনেক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই তিনজন তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কারণে স্মরণীয় । এঁদের সাহিত্যের পটভূমি হচ্ছে ফারসি সাহিত্যের পুরনুত্থানের সামানি যুগ এবং পরিব্যাপ্তির গাযনাভি যুগ ।

মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির আগমন এ-যুগের নির্যাসকে ধারণ করে আছে ।সমালোচক তামীমদারীর ফেরদৌসির মূল্যায়ন তাঁর সম্পর্কে মূল কথাটাই প্রকাশ করে । তিনি লিখেছেন– "ফেরদৌসীর গুরুত্ব কেবল তাঁর ভাষার লালিত্য, মাধুর্য ও দৃঢ়তার মধ্যেই নয় বরং জাতীয়তাবাদের চেতনা ও ধর্মীয় অনুভূতিতেও তাঁর অবদান রয়েছে ।" (তামীমদারী[২১] : তদেব, পৃ: ৭৭) তাঁর রচিত *শাহনামা* ধারণ করে আছে শুধু কোনো বিশেষ একটি যুগের নয়, বহু-বহু যুগের স্বর ও স্রোতকে । যে-চেতনা পারস্যে পুঞ্জীভূত হতে-হতে বিশাল রূপ পরিগ্রহ করবার অপেক্ষায় ছিল তাকেই ভাষায়িত করে তুললেন ফেরদৌসি । স্বয়ং ফেরদৌসি তাঁর সারা জীবনের সাধনাকে নিয়োজিত করেছিলেন এ-কাব্য রচনার জন্যে । সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের একাগ্রতায় তিনি গড়ে তোলেন তাঁর মহাকাব্যের অনুপম সৌধ । আরবেরি'র মতে ফেরদৌসি ষাট হাজার মুতাকারিব দ্বিপদী'র আশ্রয়ে তাঁর *শাহনামা* রচনা করেন । (আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ৪৪) আবু মনসুরের একই শিরোনামের গদ্যগ্রন্থটির আশ্রয়ে রচিত ফেরদৌসির কাব্য এর কাব্যিব ঐশ্বর্য-সম্পদে ইরানের জাতীয়

গৌরবে পরিণত হয়েছে । বিশ্বের অনেক সমালোচক এ-মহাকাব্যকে *ইলিয়াড*, *ওডেসি*, *ঈনিড* প্রভুত মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন । পারস্যের অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে ফেরদৌসির মহাকাব্য । যুগে-যুগে যে-অপরিসীম ত্যাগ-আত্মদান আর বীরত্বের মহিমার জন্যে পারস্য সভ্যতা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় পরিণত হয়েছে তার সাহিত্যিক চিত্রণ নির্মাণ করেছেন তিনি । ফেরদৌসির আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ আমরা ধ্বনিত হতে দেখি তাঁর মহান সৃষ্টিতে–

> "যখন ইরান থাকবে না, তখন আমার মৃত্যু ঘটবে
>
> এই দেশ, মাটি এমনকি একটি প্রাণীও বেঁচে থাকবে না । (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ১২৮)

ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক এ. জে. আরবেরি তাঁর পূর্বে উল্লেখকৃত গ্রন্থে *শাহনামা*-কে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে মত দিয়েছেন । তিনি এ-ও বলেন রুমি, সাদি, হাফিজ-এর কাব্য ও সৃষ্টি নি:সন্দেহে মূল্যবান কিন্তু ফেরদৌসিরমহাকাব্যটির তুলনা কোনো কিছুর সঙ্গেই চলে না । তামীমদারীর মতেও ফেরদৌসির ন্যায় এমন অসাধারণভাবে পারস্যের বীরত্বগাঁথা আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হ'ন নি । ড. সিরাজী'র গ্রন্থে বলা হয়েছে, *শাহনামা* কাব্যগ্রন্থ বিশ্বের ২৭টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে । এ-থেকে বোঝা যায় এ-মহাকাব্য কেবল পারস্যের নয় বিশ্বসভ্যতার গৌরবের মর্যাদা লাভ করেছে । ফেরদৌসির মূল কাব্যটি পাঠ করলে আমরা দেখবো, প্রাচীন পারস্যকে তিনি শব্দের পর শব্দ গেঁথে ইমারতের নান্দনিকতায় হাজির করেছেন । কেবল ইতিহাস নয়, মানব-চরিত্র, বীরত্ব, জ্ঞান-পান্ডিত্য এসবকিছুকে তিনি এমনভাবে সমন্বিত করেন যে একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদানকে আলাদা করা যায় না । ড. তারেক সিরাজী যথার্থই বলেন যে, "কিন্তু *শাহনামার* বড় পরিচয় হচ্ছে ফারসি ভাষার অস্তিত্বের সনদ হিসাবে ।" (সিরাজী[৫৯] : তদেব, পৃ: ১২৭)

গাযনাভি যুগে পারস্য এবং তৎসন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনেক সম্রাটের শাসনে শাসিত হলেও মূলত সুলতান মাহমুদই এই যুগের সমার্থক হয়ে রয়েছেন ইতিহাসে । তিনি যে শাসক হিসেবে অনন্য ছিলেন তা-ই নয়, সাহিত্য-শিল্পের একজন সমঝদার হিসেবেও তিনি ইতিহাসখ্যাত । তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং রচনা করেছেন কাব্যকর্ম । বিভিন্ন সমালোচক তাঁর রাজদরবারে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের বর্তমানতা সম্পর্কে লিখেছেন । কারও-কারও মতে (জওহর[২০] : তদেব, পৃ: ৬০) তাঁর রাজদরবারে চার শতাধিক কবির উপস্থিতি ছিল । উনসরি ছিলেন তাঁর দরবারের প্রধান কবি । তাছাড়া ফেরদৌসি, ফররুখি, আসজাদি, গজারি এবং মনুচেহেরিও ছিলেন প্রসিদ্ধ । ইতোপূর্বে আলোচিত মহাকবি ফেরদৌসি দুই যুগের সন্ধিতে অবস্থিত হলেও *শাহনামার* মাধ্যমে তিনি গাযনাভি যুগেরও গৌরবে বৃত হয়েছেন । গাযনাভি যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য যুগটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে । সুলতান মাহমুদের অমিতবিক্রম রাজ্যজয়ের কিংবদন্তী অবশ্যই যুগটির সবচাইতে বড় রাজনৈতিক অর্জন । সমগ্র ইরান, তুর্কিস্তান, সুদূর ভারতবর্ষ করতলগত করেছিলেন তিনি । এ-যুগেই পারস্য-সভ্যতার স্বকীয় পরিচয়বাহী জীবনদর্শন সুফিবাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে । বিশেষ করে বিভিন্ন দর্শন ও

মতবাদের প্রচলন সত্ত্বেও সুফিবাদ অধিকসংখ্যক সৃষ্টিশীল মানুষকে আকৃষ্ট করে। এর প্রভাবে রচিত হয় মরমি ও মানবমুখি ধর্মস্পৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য। সুফিবাদের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ পন্ডিতের ধারণা এটি পারস্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক অবদান যেটি ইসলাম ধর্মের আগমনের পর সেই ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই গৃহীত হয়েছিল। পারস্যের রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি গাযনাভি যুগে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের দিগন্ত সুবিস্তৃত হয়। আজারবাইজান থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া'র বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শেকড় ছড়িয়ে ক্রমশ মহীরূহে রূপ নিতে থাকে। গাযনাভি যুগে সাহিত্য বিশেষভাবে আদরণীয় হওয়ার ফলে কাব্য ও বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম রচনার ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছিল। কাব্যরচনার মাধ্যমে রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভের ঔৎসুক্য অনেককেই সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ করে তোলে। গাযনাভি-রাজদরবারে প্রচুর সংখ্যক কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতি সেটারই বহিপ্রকাশ।

সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই গাযনাভি যুগকে পারস্যের রেনেসাঁস-যুগ বলে অভিহিত করেছেন। মহাকবি ফেরদৌসি ছাড়াও এ-যুগকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আরও অনেকেই। তাঁদের একেকজন একেকটি রত্নের মত খচিত ছিল গাযনাভি-দরবারে। পারস্যের

কবিদের সৃষ্টি-সংবলিত যেসব গ্রন্থ পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় সেগুলোতে তাদের অবদানের গুরুত্বকে দেওয়া হয় যথোচিত স্বীকৃতি। ই. জি. ব্রাউন তাঁর*এ লিটারেরি হিস্ট্রি অব পারসিয়া*-তে (ব্রাউন[১৭] : তদেব, ২য় খন্ড) 'লুবাবুল আলবাব' 'চাহার মাকালা' প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থে ফারসি ভাষার বিভিন্ন কবির বিচিত্র বিষয় ও আঙ্গিকের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত অবদানেই ফারসি কাব্য ও সাহিত্যের শৈলি গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পারস্যে আরবি প্রভাবের ফলে আরবি-ফারসি'র মধ্যে ঘটেছে পারস্পরিক আদান-প্রদান। কিন্তু তাতে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের প্রভা আরও বিকশিত হয়েছে। যেসব আঙ্গিকের নির্ভরতায় ফারসি সাহিত্যের শৈলি ক্রমবিকশিত হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ আমরা ব্রাউন-এর গ্রন্থানুসারে করতে পারি। মসনবি, গযল, কাসিদা, তাশবিব, কিতা, রুবাই, মর্সিয়া, মুসাম্মাৎ, মুরাব্বা, মুখাম্মাস ইত্যাদি বিচিত্র আঙ্গিকের চর্চা ফারসি সাহিত্যকে বহুমাত্রিকতা দিয়েছে। কখনও-কখনও বিশেষ-বিশেষ কবি বিশেষ-বিশেষ আঙ্গিক বা শৈলিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁদের কাব্যকর্মের মাধ্যমে। মসনবি'র জন্যে রুমি, রুবাইয়ের জন্যে খৈয়াম কিংবা দিওয়ানের জন্যে হাফিজকে সর্বদা স্মরণ করা হয়। গদ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিন ধরনের গদ্যশৈলির আশ্রয় নিয়েছেন ফারসি সাহিত্যিকেরা– যেমন: আরি, মুরাজ্জাজ ও মুসাজ্জা ।এসব আঙ্গিকের অধিকাংশই ফারসি সাহিত্যের মৌলিক আঙ্গিক বলে সাহিত্য-সমালোচকদের স্বীকৃতি পেয়েছে। ফারসি সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে এসব আঙ্গিকের সম্পর্কসূত্র বিষয়ে ফারসি-ভাষী সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> "হিজরী চতুর্থ শতকে (খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী) ধীরে ধীরে সুফী কবিরা আবির্ভূত হয়েছেন এবং সে-যুগের সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য হলো রোবাঈ আকৃতির কবিতার মধ্য দিয়ে সুফী ভাবধারার বর্ণনা তুলে ধরা। কিন্তু কবিতার কাঠামোগত দিক থেকে এ যুগে সাধারণত কাসিদা (স্তুতিমূলক কবিতা) ও মাসনাভীর (দ্বিপদী কবিতা) ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং হিজরী চতুর্থ শতকে (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী) হামাসে তথা বীরত্বগাথা সাহিত্য কবি ফেরদৌসীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ও উচ্চমার্গে এসে পৌঁছে।" (তামীমদারী[২১] : পৃ: ৪৭)

ফেরদৌসি'র কাছাকাছি সময়ে কাব্যচর্চা করা আসাদি তুসি এবং উনসুরি'র কথা বলা যায় যাঁরা ফেরদৌসির মত বিশাল কাব্যসৃষ্টি না করলেও স্বতন্ত্র চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন। দশ সহস্র'র কাছাকাছি শ্লোকবিশিষ্ট আসাদি তুসি'র মহাকাব্য *গারশাসবনামে* একাদশ শতাব্দীর ফারসি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। অসাধারণ প্রশস্তিগাথা বা কাসিদা রচনা করে একই শতাব্দীতে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে গেছেন কবি উনসুরি। এখানে তাঁর একটি কাসিদার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল যা থেকে শব্দ-ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির আভিজাত্য উপলব্ধি করা যায়:

کار خواهی کار بخشی کار بندی کار ده

کار بینی کار جویی کار سازی کاردان

شادی و شاهی تو داری، شادبشا و شادزی

جامه ی شادی تو پوش و نامه ی شادی تو خوان

"(যদি হও) কর্মপ্রত্যাশী, কর্মে উৎসাহী, কর্মব্যস্ত

কর্মদ্রষ্টা, কর্মসন্ধানী, কর্মনিপুণ, সিদ্ধহস্ত;

(তবেই) আনন্দ ও বাদশাহী তোমার জন্য রয়েছে,

আনন্দে বেঁচে থাকো, আনন্দের পোশাক তুমিই পরিধান করো

আর রাজচরিত তুমিই পাঠ করো।" (সিরাজী[১৯] : তদেব, পৃ: ১৩১)

গাযনাভি যুগের পরাক্রমশালী সম্রাটদের শাসনস্থিতির ফলে ফারসি কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষে নিরুপদ্রবভাবে সাহিত্যচর্চা সম্ভবপর হয়েছিল। তাছাড়া পারস্যের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকেও আমরা দেখতে পাই সম্রাটদের রাজ্যবিস্তারের পরিণামে ফারসি ভাষা-সাহিত্যেরও প্রচার-প্রসারের ধারা চলতে থাকে সমান্তরালে। একসঙ্গে অনেক কবি-সাহিত্যিকের নাম উচ্চারিত হওয়ার সুযোগ ঘটে গাযনাভি যুগে। হাসান আলি বিন জুলুখ আসজাদি (ফররুখি) প্রচুর সংখ্যক কবিতার রচয়িতা। তাঁর কাসিদা, গযল, মাসনাভি, দিওয়ান প্রভৃতি পারস্য-সম্রাট সুলতান মাহমুদের শাসনামলের ঐশ্বর্যকে উপস্থাপন করে। তাঁর কাব্যের উপমাগুলোকে অত্যন্ত গভীর ব্যঞ্জনাবাহী বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য ক্ষুদ্রাকার উদ্ধৃতি থেকেও অনুধাবনযোগ্য–

"নর আমদ্ নীলগুন আরবী জরুর নীলগুন দরিয়া

চুরায়ে আশীকান গরদান চু ত্বর-ই-বীদিলান শরদা।"

ভাষান্তর: নীল সমুদ্র থেকে একটি নীলাভ মেঘ উত্থিত হল। এ যেন প্রেমিকের ন্যায় অস্থিরবুদ্ধি এবং প্রেমিক স্বভাবের ন্যায়

উন্মত্ত।" (জওহর[২০] : তদেব, পৃ: ৬১)

একইভাবে মনুচেহেরি, আবু সাঈদ আবুল খায়ের, নাসির খসরুএঁদের রচনাও সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে গাযনাভি শাসনের অবসান হলেও ফারসি সাহিত্যের গৌরবের সমাপ্তি ঘটে না বরং তা গতিপথ বদলে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। হিজরী ৪২৯ সালে (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ইরানে সূচিত হয় তুর্কি বংশোদ্ভূত 'সালযুকি' শাসনামল। রাজনৈতিক এই পট-পরিবর্তন নতুন যুগের সূচনা করলেও ফারসি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাকে আমূল পরিবর্তন বলা যায় না। এর কারণ সালযুকিরা পূর্ববর্তী গাযনাভিদের ন্যায় ইরানি স্বকীয়তাকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখতেন। সমালোচকের ভাষায়– "সালজুকীরাও গাযনাভীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকার কারণে শিল্পী-সাহিত্যিক ও কবিদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। কেননা ইরানী সাহিত্য ও সভ্যতার সহযোগিতা নিয়েই তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা বা রাজত্বের বিধি-বিধান নির্ধারণ করতেন।" (তামীমদারী[২১] : তদেব, পৃ: ৪৮-৪৯) সালযুকিদের দরবারেও পন্ডিত-জ্ঞানীদের কদর ছিলযাঁদের মধ্যে নেযামুল মুল্‌ক্ ইতিহাসখ্যাত। বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তির প্রসঙ্গে নেযামুল মুল্‌ক্-এর নাম স্মর্তব্য। সালযুকি ইতিহাসে ক্ষমতার পালাবদলে শাসনকালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বৃহত্তর অর্থে সালযুকি ভাবধারার প্রবহমান ঐক্যের কারণে ফারসি সাহিত্যের সমালোচকেরা সবটাকেই সালযুকি যুগের

আওতায় মূল্যায়ন করে থাকেন। এমন অনেক কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন যাঁরা গাযনাভি এবং সালযুকি উভয় পর্বেই নিজেদেরকে প্রকাশ করে গেছেন সাবলীলভাবে। ব্রাউন তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে (তদেব, দ্বিতীয় খন্ড) সালযুকি যুগের সাহিত্যে প্রারম্ভিক এবং মূল সালযুকি যুগের পটভূমিতে সেই সময়কার সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে তুঘরিল বেগের অভিষেক থেকে মালিক শাহ্-এর যুগ পর্যন্ত প্রারম্ভিক সালযুকি যুগ এবং সানযার এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গের কাল পর্যন্ত মধ্য বা মূল সালযুকি যুগ। প্রারম্ভিক যুগের সাহিত্যে নেযামুল মুল্‌ক্, নাসির-ই-খসরু, ওমর খৈয়াম, বাবা তাহির উরয়ান হামাদানী, আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ের, শায়খ আবদুল্লাহ আনসারী, আওফি, দওলত শাহ, আসাদি, ফখরুদ্দিন আসাদ গুরগানি, আল গাজ্জালি এঁরা ব্রাউন-এর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছেন।পরবর্তী সালযুকি সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্রাউন যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজন সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন– আবুল মাজদ মাজদুদ (সানাই), শায়খ ফরিদউদ্দিন আত্তার এবং জালালউদ্দিন রুমি। সালযুকি যুগের শেষ দিকে আবির্ভূত হওয়া চারজন কবির সাহিত্যকর্মকে বিশেষভাবে মূল্যায়নযোগ্য বলেছেন ব্রাউন। এই চারজন হলেন– আন্‌ওয়ারি, খাকানি, নিজামী এবং দাহিরউদ্দিন ফারাবী। এখানে লক্ষণীয়, উল্লেখকৃত সকলেই তাঁদের সাহিত্যকর্মের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেও সমালোচক তামীমদারী নাসির খসরুকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টির

জন্যে। তামীমদারীর মতে (তদেব, পৃ: ৪৯), হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে নাসির খসরুর সাহিত্যকর্ম ধর্মীয় ও কালামী (ধর্মতাত্ত্বিক) ভাবধারাকে সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। ফলে তাঁর কাসিদা ও কবিতাগুলোর মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট। মূলত নাসির খসরুর মাধ্যমেই এই ধারার প্রসার ঘটেছিল। বিখ্যাত ফারসি সাহিত্য সমালোচক আরবেরি (তদেব) সালযুকি-পর্বের সাহিত্যালোচনায় পাঁচজন কবিকে পৃথক মর্যাদার দাবীদার বলে বিবেচনা করেছেন। এ-পাঁচজন হলেন– মুইজ্জি, আন্‌ওয়ারি, খাকানি, নিজামী এবং আত্তার। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, গাযনাভি যুগের সাহিত্যের প্রবাহ সালযুকি যুগে এসে সংখ্যায় ও শৈলীতে প্রবৃদ্ধিমুখী হয়েছিল। তাছাড়া ততদিনে পারস্যের কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার ফলে পারস্যের জাতীয় সত্তা পারস্য-সভ্যতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে স্বকীয় পরিচয়ে সগর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।সম্রাটদের রাজ্যবিস্তার ও কুশলী শাসনের ফলে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের মানচিত্রেরও বিস্তৃতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সালযুকি যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধির কারণেই খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, এই সময়েপারস্যের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস ছিল অত্যন্ত জটিল ও ঘটনাবহুল। ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তৎপরতা পরিস্থিতিকে আরও ঘোরতর দুর্যোগপূর্ণ করে তোলে। ফাতেমিয়-ইসমাইলিরা সমগ্র পারস্যে এবং পারস্যের বাইরে মিশর ও তুরস্কেও তাদের কর্মকান্ডের পরিধি প্রসারিত করে। অর্থাৎ গোটা সালযুকি শাসনকালটাই অতিক্রান্ত হয় প্রবল ঘটনাতরঙ্গের মধ্য দিয়ে। সে অবস্থায়ও ফারসি সাহিত্যের নানামাত্রিক বিকাশ অব্যাহত থাকাটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। ফারসি ভাষা-সাহিত্যের নিজস্ব শক্তি এবং এর প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ-ভালবাসার কারণেই এরকমটি সম্ভবপর হয়েছিল। এই ঘটনাপ্রবল যুগের মধ্যেও, আমরা দেখতে পাই ফারসি সাহিত্যে নতুন ধরনের হাওয়া বয়ে গেছে। সুফীবাদী সাহিত্য-ভাবধারায় আলোড়িত ফারসি কবিরা তাঁদের অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা দিয়ে এক নিজস্ব কাব্যপ্রতিমা গড়ে তোলেন যা পারস্যকে এক অন্য মাত্রায় উপস্থাপন করে বিশ্বসভ্যতার সামনে। তাই আমরা লক্ষ করি ফারসি সাহিত্যের আলোচনায় অপ্রতিরোধ্যভাবে এসে পড়ে সুফীবাদী সাহিত্যের কথা। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকেরা বাবা তাহির উরয়ান হামদানী, আবু সাঈদ বিন আবুল খায়ের, আবুল হাসান আলি বিন উসমান বিন আলি বিন আল্ করনভী আল্‌জুল্লাবী আল্ হুজরিবী আল্ লাহোরী, খাজা আবদুল্লাহ বিন মহম্মদ আনসারী,আবুল মাজদ মাজদুদ বিন আদম সানায়ী, হেকিম নাসির খসরু বিন হাবিস কবদিয়ানী, মহম্মদ বিন আবদুল মালিক বুরহানী, অহিদুদ্দিন মহম্মদ আন্‌ওয়ারী, আফজালুদ্দিন ইব্রাহীম বিন শিরওয়ানী এরকম বেশ কিছু সুফিবাদী কবির নাম উল্লেখ করে থাকেন। এঁদের মধ্যে বাবা তাহির উরয়ান হামদানীকে প্রথম সুফী কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। (জওহর[২০] : তদেব, পৃ: ৬৩) তাঁর কবিতায় মানবমনের প্রেমিক সত্তাকে বিশ্বের বিশালতার মধ্যে উপলব্ধি করবার বিশেষ প্রণোদনা লক্ষণীয়। সুফি মৌলানা মোবারক করীম জওহরের উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে কবির একটি রুবাঈ-এ বিধৃত তাঁর নিজের এবং ফারসি কাব্যের মাধুর্য অনুভব করা যাবে–

"দিলী দীরম খরিদার-ই-মহব্বৎ

কজ উগরমস্ত বাজার-ই-মহব্বৎ

লবাসী বাফতাম বরকামৎ-ই-দিল

জ-পুদ-ই-মেহনৎ ওয়া তার-ই-মহব্বৎ ।"

(মৎকৃত অনুবাদ:হৃদয় আমার প্রেমেতে পাগল,

প্রেমের হাটেতে চলি উচ্ছল ।

মনের শরীরে শ্রমের আবরণ,

পরনে পোশাক প্রেমেতে বয়ন ।)

২৫

ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান সমালোচক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পালের দৃষ্টিতে (তদেব) আবু সাঈদ বিন আবুল খায়ের ফারসি সুফী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি । এছাড়া সানায়ী'র *হদীক্বতুল হক্বীক্বৎ*একটি সুফীতত্ত্ব-প্রভাবিত মসনবি কাব্য । পরবর্তীকালের কবি ফারসি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফীবাদী কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি আবুল মাজদ মাজদুদ সানায়ী সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে লিখেছিলেন (শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্রের গ্রন্থ থেকে (পাল[৩৪] : পৃ: ৫৯) মূল মসনভিটির উদ্ধৃতি–

"তরক্-জুশী করদ্-অন্ নীম খাম্ ।

অজ হকীম ঘজ্নবী বশন্ তমাম্ ॥"

(মৎকৃত অনুবাদ: প্রেমোন্মাদনা নেই আমাদের লেখনিতে,

সার্থক সেই রূপ গযনি'র সানায়ী'তে ॥)

সানায়ী'র উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে ফরিদুদ্দিন আত্তার, জালালুদ্দিন রুমি এবং শেখ সাদী'র মধ্যে আরও বাঙ্ময় ও বর্ণিলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে ।বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও সুফিবাদী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ সাহিত্য বলা যাবে । কেননা, একেকজন কবির প্রকাশভঙ্গি তাঁদের কবিতাকে একই সুফিবাদী দর্শনাশ্রিত করেও পারস্পরিক পৃথক করেছে । তাঁদের প্রত্যেকের ধর্মবোধ-অধ্যাত্মবাদ-সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা স্বকীয় বোধে উজ্জ্বল । হামদানীর কবিতায় আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেমাস্পদের জন্যে আকুতি, আবদুল্লাহ আনসারীর কবিতায় কাব্য-গদ্যের সংমিশ্রণে বিধাতার অনুকম্পা-প্রার্থনা, সানায়ীর কবিতায় আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতিসাধন, আন্ওয়ারীর কবিতায় সাধারণ মানুষের জন্যে সহমর্মিতার বোধ এসব ফারসি কাব্যের বিবর্তনে নতুন-নতুন ভাব ও চিন্তার উদ্রেককারী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে । তবে বিষয় এবং তার প্রকাশের মধ্যে সমন্বয় ও সামগ্রিক কাব্যিক আবেদনের নিরিখে সালযুকি যুগের বেশ কয়েকজন কবি সমালোচকদের নিকটে বিশেষ মনোযোগ লাভ করেছেন । সমালোচকভেদে সেসব কবির নামোল্লেখে খানিকটা মতভিন্নতা সত্ত্বেও সালযুকি-পর্বের অন্তত কয়েকজন কবি যে অবিস্মরণীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই । এঁরা হলেন– খৈয়াম, আন্ওয়ারী. খাকানি, নিজামী এবং আত্তার । পরবর্তীকালের ফারসি মানস ও সৃজনশীল ভাবনায় অর্থাৎ ফারসি সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে উপর্যুক্ত পঞ্চকবির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য ।

কেবল ফারসি সাহিত্য নয় বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১২৩ খ্রি:) তাঁর মৌলিক জীবনদৃষ্টির সৃষ্টি রুবাইয়াৎ-এর জন্যে চিরায়ত কবিদের কাতারভুক্ত হয়ে আছেন । তাঁর কবিতার অনেক পংক্তি প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণে পরিণত হয়েছে । সমালোচকেরা তাঁর মুক্ত-সাবলীল ও আত্মনিবেদিত কাব্যের জন্যে খৈয়ামকে উঁচু স্থান দিয়ে থাকেন । তাঁর কাব্যে প্রকটিত দর্শন

বিষয়ে আজও আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত। তাঁর রুবাইয়াৎগুলো এতই ঐশ্বর্যময় যে একটি-দু'টি পংক্তির মধ্যেও বিশালতার বোধ অনুরণিত হয়ে ওঠে। যেমন–

"ইন নকদ বগিরে দাস্ত আয আন নসিয়ে বদার"

(মৎকৃত অনুবাদ: নগদ যেটা সেটাই রাখো, বাকির ফাঁকি যাক টুটে।)

ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণকারী এ-কবির স্বাতন্ত্র্যকে বিচার করতে গিয়ে সাহিত্যসমালোচক লিখেছেন– "তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিনায়ক। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইমামদের ভন্ডামী এবং মিথ্যার বেসাতি তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এবং এই জীবন-যন্ত্রণাই তাঁর সমগ্র কাব্য-কর্মে প্রতিফলিত।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ২৬) খৈয়ামের কাব্যের প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। একটি রুবাইয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক–

"ইমশব মেই জাম মনী খোহাম কর্দ

খুদরা বদো জাম মেই গনী খোহাম কর্দ

আওয়ালে সে তালাস আকল ব'দীন খোহাম দর্দ

ঈস দুখতর রযরা বযায়ী খোহাম কর্দ"

(মৎকৃত অনুবাদ: করেছি উজাড় একমনী-ভান্ডের মদ আজ রাতে,

ধনী হয়ে যাই করে পান দুই মনী পেয়ালাতে,

দিয়েছি তালাক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রথমা বধূকে–

নতুন বধূ এনেছি ঘরে আঙুর-লতার কন্যাকে।)

ওমর খৈয়ামের কাব্য এবং কাব্যে আভাসিত দর্শন নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলেন, তিনি ক্ষণবাদী; আবার কারও-কারও দৃষ্টিতে তিনি নাস্তিক। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে ঈশ্বরভাব ততটা মুখ্য না হলেও তিনি নাস্তিক নন। কোনো-কোনো সমালোচক তাঁকে সামাজিক নীতি-শৃঙ্খলা এসব বৈষম্যেরও কাব্যিক সমালোচনাকারী বলে মনে করেন। তবে ওমর খৈয়াম এমনই একজন কবি যিনি তাঁর স্বল্পসংখ্যক রুবাইয়ের দ্বারাই সারা বিশ্বে অসংখ্য অনুরাগীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানী সত্তা, গণিতবিদ্যার পারদর্শিতা এসব আজ গৌণ হয়ে গেছে– কবিতাই তাঁকে দিয়েছে অমরতা। তাই এর গৌরব কবি খৈয়ামের যেমন, তেমনই ফারসি সাহিত্যেরও।

ওহিদুদ্দিন মহম্মদ আন্ওয়ারীকে (মৃত্যু: ১১৯০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ কাসিদা-রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ফারসি সাহিত্য-সমালোচক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল। (তদেব, পৃ: ৭৬) ইরানের সাহিত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান খোরাসানে তাঁর জন্ম। খৈয়ামের মত তিনিও বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন– গণিত এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *আঁসু-ই-খোরাসান* (খোরাসানের কান্না) কাব্যের কবিতাগুলো তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক প্রকাশ। (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ২৯) আরবেরির গ্রন্থে (তদেব) তাঁকে সম্রাট সানযারের সভাসদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি কবি আন্ওয়ারী সম্রাট সানযারের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য আর দেশ-জাতির দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন তিনি– কবি আবদুস সাত্তারের বঙ্গানুবাদে আন্ওয়ারী'র কবিতায় সেটি মূর্ত হয়ে উঠেছে:

"হায়রে ঝড়ের তান্ডবলীলা এ সমরখন্দে;

এখানের লোক একদা ছিল যে মহা আনন্দে।

খোরাসানী-সুখ ডুবেছে এবার দু:খের সাগরে–

তুরানী রাজার দু:সহ আঘাত দেশের উপরে।

অজগরী-শ্বাস ছিল যে তাদের নাসারন্ধ্রে,

অত্যাচার আর অনাচার আনে তারা স্কন্ধে।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ২৯-৩০)

আফজালুদ্দিন ইব্রাহীম বিন আলী শিরওয়ানী (১১০৬-১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সংক্ষিপ্ততর খাকানি নামেই খ্যাতিমান। তাঁর জন্মস্থান ইরানের গঞ্জ। আরবি ভাষা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতিতে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শিরওয়ানের সুলতান খাকান

মানুচেহ্‌র তাঁর কাব্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'খাকানি' অভিধা প্রদান করেছিলেন। তাঁর কাসিদাগুলোতে ধর্মসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা উদারচিত্ততার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। তাছাড়া সমাজজীবনের নানা মন্দ ও দৃষ্টিকটূ দিক নিয়ে তিনি লিখেছেন এমন সব কবিতা যেগুলোতেব্যঙ্গের তীব্রতা সুস্পষ্ট। তাঁর *তোহ্‌ফাতুল ইরাকাইন*গ্রন্থটিতে কবিতা, হজ্বের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির চমকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। এটি একটি অভিনব গ্রন্থ। তাঁর কবিতায় বিধৃত হৃদয়াবেগ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। নিম্নে তাঁর বিখ্যাত ফারসি কবিতা*তোহফাতুল ইরাকাইন* নামক দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ প্রথমে আরবেরির গ্রন্থ থেকে ইংরেজি অনুবাদে (তদেব, পৃ: ১২০) এবং পরে মৎকৃত বাংলা অনুবাদে অনুসরণ করা যাক– উভয় ভাষাতেই খাকানি'র কাব্যাবেগ মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম:

"I have no equal on the face of the earth,

No one in the world possesses words like mine;

henceforth let all ask the Word for words, but

ask me for the secrets of word-spinning.

I became a sun in the shadow of reason.

I am the world-ruling Sun of Speech

And all these poetasters are like moons;

they are my inferiors by three degrees

and have augmented their capital from me.

Though they show some talent when I'm not there,

They are nothing when they come near me--

though the moon sheds light when the sun is hidden,

in the presence of the sun it flees away."

(বাংলা অনুবাদ: এই পৃথিবীর অবয়বে আমার সমতুল নাই,

আমার সমকক্ষ নয় ভুবনের কারও শব্দই;

তাই শব্দের বাসনায় শব্দকেই সবাই শুধাক, তবে

আমাকে শুধাও সে-মন্ত্র– কী করে শব্দ বুনতে হবে।

কিছু নয় কেবল যুক্তির একটি কণিকা মাত্র ছিলাম;

যুক্তির ছায়ায় সূর্যতে পরিণত হলাম।

আমি সেই বাণীর সূর্য যে বিশ্ব শাসনরত

আর এই যে এসব কবিটবিরা সব চন্দ্রের মত;

তিন গুণিতক হীন তারা আমার চেয়ে

বাড়িয়েছে পুঁজি সকলেই আমার কাছ থেকে পেয়ে।

যদিও তারা খানিক দেখায় প্রতিভা আমার অনুপস্থিতিতে,

কিছুই তারা নয় বলবার মত আমার সন্নিহিতিতে–

যদিও চন্দ্র ফেলে যায় আলো সূর্য আড়াল হলেই,

সূর্যের সামীপ্যে পালায় সে-আলোক অচিরেই।)

একজন কবি এবং নিজের শক্তিতে অবিচল আস্থায় দৃঢ় খাকানির এ-কবিতা ফারসি ভাষা-সাহিত্যের সমস্ত কবির সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনজন নিজামী'র সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম জন *চাহার মাকালা* (আলোচনা চতুষ্টয়)-এর লেখক সমরখন্দের নিজাম-ই-আরোদী, দ্বিতীয় জন *সিয়াসাৎনামা*-র লেখক নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌ এবং তৃতীয় জন গঞ্জ-এর অধিবাসী কবি নিজামী যাঁর পুরো নাম শায়খ নিজাম উদ্দিন আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ (১১৪১-১২০৩ খ্রিস্টাব্দ)। আমরা জানি,বিশ্বসাহিত্যে ফারসি ভাষার অমর কবিদের প্রসঙ্গে নিজামী'র *পাঁনচ গঞ্জ*-এর নামটিও অনিবার্য উল্লেখের তালিকায় থাকে। সমালোচক সি. ই. উইলসনের (উদ্ধৃতি– আরবেরি[১৫] : তদেব, পৃ: ১২২-১২৩) মতে, নিজামীর কবিতা চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কাব্যালংকারের কুশলী প্রয়োগে সমৃদ্ধ। বহুকাল আগেকার কবি হলেও উইলসন তাঁর মধ্যে আধুনিক ইউরোপিয় কবিদের কাব্যিক বৈশিষ্ট্যাদি লক্ষ করেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *মাখজানুল আসরার*-এ আল্লাহতায়ালা ও রাসুল (দ:)-এরআলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ একটি ভিন্ন ধরনের গ্রন্থ। নিজামী একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাব্য রচনায় পারদর্শিতার নজীর রেখে গেছেন। *মাখজানুল আসরার*-এ তিনি ভাবগম্ভীর ও দর্শনস্পৃষ্ট। ঠিক তারপরেই আমরা পাই তাঁর রোমান্স-কাব্য *খসরু ওয়া শিরিন*। অনেক সমালোচক তাঁর এ-কাব্যকে ফেরদৌসির *ইউসুফ জোলায়খা* কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেন। এছাড়া রয়েছে তাঁর খন্ড কবিতার সমষ্টি *দিওয়ান*, দ্বিতীয় রোমান্স-কাব্য *লায়লা ওয়া মজনুন*, কাব্যোপাখ্যান *সিকান্দারনামা*এবং রোম্যান্টিক কাহিনিকাব্য *হপ্ত পয়কর*। শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পালের দৃষ্টিতে নিজামী

ফেরদৌসির ভাবশিষ্য এবং তাঁর প্রভাব নিজামীর ভাব ও শৈলীতে প্রতিফলিত। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল নিজামী সম্পর্কে লিখেছেন– "নিজামীর ভাষা অতি সুললিত ছন্দে লিখিত; লেখার ভঙ্গি অতি সরল ও ঋজু।" (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ৮৩)

সুফী কবি-দার্শনিক শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (১১২৬-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) এমন একজন কবি যাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন তাঁর আরেক মহান উত্তরসূরী কবি মওলানা জালালউদ্দিন রুমি। ফারসি সাহিত্যের সব সমালোচকের দৃষ্টিতেই আত্তার একজন মহান সাধক-কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য *মুনতেকুৎ তায়ের*। এছাড়াও তাঁর *মুসিবতনামা*, *ইলাহিনামা*, *রিয়াজুল আরফিন*, *লিসানুল গায়্যাব*, *মাদহারুল আজায়েব*, *দীওয়ান*প্রভৃতি কাব্যও তাঁকে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। আত্তারের কবিতায় কাহিনি-কিংবদন্তী-উপকথা ইত্যাদি এক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। *মুনতেকুৎ তায়ের*-এ গল্প-গাথা-পুরাণের বয়ন এটিকে এক অনুপম শিল্পভাষ্যে পরিণত করেছে। ফারসি সাহিত্যে বিভিন্ন শৈলীর প্রয়োগে একেকজন কবি-সাহিত্যিক একেক অভিনবত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এক্ষেত্রে আত্তারের গ্রন্থটি তাঁর স্বকীয় উদ্ভাবনার বহিপ্রকাশ। তাঁর কাব্যে কথকতা-সংলাপভঙ্গি-স্বগতোক্তি প্রভৃতির সার্থক ব্যবহার রয়েছে। স্বতস্ফূর্ত ও পরিমিত বাগভঙ্গি তাঁর কাব্যকে করেছে অতিকথন-দোষ থেকে মুক্ত। যেজন্যে তাঁর সব কবিতাই বিষয়নিষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবাহী। বাংলা অনুবাদে আত্তারের একটি কবিতার উদ্ধৃতি–

"তার প্রেমে মগ্ন হয়ে কখনো বলো না,

'এটা কোন কাল?'

যদি তুমি ভালোবাসো কখনো বলো না,

'আছে কিবা নাই।'

প্রারম্ভ অথবা শেষ কোনোটাই হৃদয়ে এনো না।

চোখ মেলে চাও

তার আলো হাসে

এবং তোমার চারপাশে।" ('*তার প্রেমে*', দ্রষ্টব্য: সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৩৮)

তামীমদারী যথার্থই বলেছেন (তদেব : পৃ: ৫২) যে আত্তার তাঁর আধ্যাত্মিক মসনভি এবং গযলের মধ্য দিয়ে ফারসি সাহিত্যে একটা মোড় পরিবর্তন করে দেন যা পরবর্তীতে মাওলানা রুমির কাব্যস্পর্শে আরও বহুমাত্রিকতা অর্জন করে।

এভাবে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের বিচিত্র ধরনের রচনায় সমৃদ্ধি লাভ করে গাযনাভি ও সালযুকি যুগ-বাহিত ফারসি সাহিত্য। যুগ-পরম্পরায় প্রকৃষ্ট শাসন অব্যাহত থাকাটাই শুধু নয়, পারস্যের প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক অবদানের সুফল-ই হচ্ছে ফারসি সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির হেতু। এই সমৃদ্ধির সীমা পারস্যকে ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পারস্যের প্রতিবেশী আজারবাইজান ও অন্যান্য অঞ্চলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশেও ফারসি সাহিত্যের চর্চায় নিরত ছিলেন অনেক কবি-সাহিত্যিক। কাব্য-গদ্য-আখ্যান-ব্যঙ্গ-রম্য-ভ্রমণ-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানা ধরনের সাহিত্য একটি সভ্যতার মন ও মননের সার্থক প্রতিনিধিরূপে গণ্য। কালের পরিক্রমায় বহুযুগ আগেকার পারস্যের সেসব সাহিত্য আজ চিরায়ত ধারায় বহমান। ফারসি সাহিত্যের পুঞ্জীভূত সম্পদ যে-শক্তি ও সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল সেটাই গাযনাভি-সালযুকি-উত্তর পারস্যের প্রচন্ড উত্তাল কালপ্রবাহের তোড়েও ফারসি সাহিত্যের গতিপথকে গন্তব্যের লক্ষ্যে অবিচল রেখেছিল। এমনকি প্রবল প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও প্রতিভাবান ফারসি কবি-সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের সাক্ষ্য বহন করছে ইতিহাস আর সেই রচয়িতাদের অমর রচনাবলী।

ত্রয়োদশ শতকের পারস্যের ইতিহাস ক্রমাগত জটিল-কুটিল আর অস্থির ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্মত্ততারও ইতিহাস। বস্তুত সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি সৃজনশীল কর্মের বিরোধী পরিবেশের মুহুর্মুহু উদ্ভাসনে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল পরিপ্রেক্ষিত। কেবল পারস্য নয়, ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য সমস্ত অঞ্চলেই সাম্রাজ্য-সংশ্লিষ্ট ওঠানামা বাস্তবকে একের পর এক দুঃসহ করে তুলছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগেই ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে 'ঘোরী'দের উত্থানের সূচনা। পরবর্তীতে তারা তাদের মিত্রগোষ্ঠির সঙ্গে একজোট হয়ে ইরানে আধিপত্য বিস্তার করে। এই কালপরিধিকে ইরানের জন্যে দুর্যোগপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষ[৩](তদেব : পৃ: ৬০১) অনুসারে– "সামষ্টিকভাবে গু'রীগণ এবং তাহাদের সাময়িক মিত্রগণ যে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায় তাহা উত্তর-পূর্ব ইরানে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পতনের সূচনার চিহ্ন বিবেচিত হইয়া থাকে।" এই সূচনাকে প্রলম্বিত করে তাতারিদের আক্রমণ। ফারসি সাহিত্য সমালোচকের যথার্থ বিবরণ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য–

> "১২১৯ সালে চেংগীজ খান তুর্কীস্তান, খোরাসান, সেইস্তান এবং আজারবাইজানে অভিযান চালান এবং ১২২৭ সাল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত লুঠতরাজসহ অভিযান অব্যাহত থাকে। ফলে স্কুল, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদি তো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়ই, তদুপরি চলে নৃশংস হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ডের শিকারে বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, কবি-

> সাহিত্যিক অনেকেই নিপতিত হন এবং অনেকে প্রাণরক্ষায় দেশত্যাগ করেন। সমগ্র ইরানীয় ভূখন্ড তখন শ্মশানে পরিণত হয়।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৪৮)

সুপ্রাচীন এসিরিয় সভ্যতার গৌরব যা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হয়ে দ্বাদশ শতকের মুখোমুখি এসে উপস্থিত হয় তাকে এমন ভয়ংকর ক্ষতির শিকার হতে হবে তা ছিল অকল্পনীয়।ঘোরীদের আরম্ভ থেকে পরবর্তী একশ' বছর এবং তারও পরের কালপর্বে ইরান রাজনৈতিকভাবে এতদঞ্চলে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কেননা, "এইসব রাজনৈতিক ঘটনা পশ্চিমাঞ্চলের ইসলামী কেন্দ্রসমূহের সহিত (মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি) ইরানের সম্পর্ক দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।" (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব, পৃ: ৬০১)। এমন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা ফারসি সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে বাধা-প্রতিবন্ধকতারূপে হাজির হওয়াটাই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে ঘটল এর বিপরীত। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও উচ্চাঙ্গের সৃজনশীল সৃষ্টির বিকাশ রুদ্ধ না হয়ে বরং আরও ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির রশ্মি ছিটকে পড়তে লাগল পারস্যের মানচিত্রে। ফলে, গাযনাভি-সালযুকি যুগের পরে মোঙ্গোল-তৈমুরীয় যুগ ফারসি ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে নতুনতর গৌরবের নিশান বয়ে আনলো। সৃজনশীল সম্পদের ইরানের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ইরানবাসীদের সামগ্রিক জীবনচেতনার শক্তিতেই জাগরুক ছিল সে-দেশ ও জাতির ধারাবাহিকতার বীজমন্ত্র। যেজন্যে সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে ফারসি জীবনধারা স্রোতোস্বর হয়ে এগিয়ে যায়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় ১২৫৬ সালে চেংগীজ খানের পৌত্র হালাকু খানের সময়েশাসকবর্গের চেতনায় পুনরায় ইরানের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার বোধ জাগতে শুরু করে। এটাও অনুমান করা অসঙ্গত নয়, ততদিনে মোঙ্গোলরা পারস্যে যেহেতু স্থায়ী ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের পক্ষে দেশীয় চেতনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ইরানের জনগণের চেতনায় সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের প্রতি, বিশেষ করে কাব্যের প্রতিতাদের সহজাত ভালবাসা ইতিহাসখ্যাত। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার দীর্ঘ পটভূমি সত্ত্বেও বিজয় ঘটে ইরানবাসীদের জীবনচেতনার। তাই আমরা দেখতে পাই মাওলানা রুমি, শেখ সাদী এবং হাফিয শিরাযি প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক ইরানের সমুন্নত গৌরবের ধ্বজাকে আশ্রয়স্বরূপ রেখে যান উত্তরসূরীদের জন্যে।

মোঙ্গোল-আধিপত্য ও তৈমুর যুগে উদিত যেসব নক্ষত্র আজও অম্লান তাঁদের মধ্যে জন্মসালের নিরিখে ইরানের শিরায নগরের শায়খ মুসলেহ্উদ্দিন সাদী আশ-শিরাযি'র (১১৮৪-১২৮৯ খ্রিস্টাব্দ) নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। সাদী নামেই তিনি বিশ্বপরিচিত। তিনি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং রচনা করে গেছেন অমর সাহিত্যকীর্তি। সমালোচকগণ তাঁর দীর্ঘ-বর্ণিল জীবনকে শিক্ষা-ভ্রমণ-

সাহিত্য এই তিন পর্বে বিভক্ত করে মূল্যায়ন করে থাকেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সিরিয়া, হিজায, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ছাড়াও অনেকবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের জবানিতে রয়েছে চমৎকার উক্তি–

"ভ্রমণ করেছি আমি পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে,

সকলের সাথে কথা বলেছি নির্বিঘ্নে প্রাণ ভরে।

আমার লাভের অঙ্ক সর্বত্র বেড়েছে বহু গুণে,

নতুন কানের জন্ম হয়েছে তাদের কথা শুনে।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৫১)

সাদীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল স্পষ্ট, সহজ-সরল। সারল্যের ভেতর দিয়ে তিনি বহু গূঢ় দর্শন ও জিজ্ঞাসাকে উপস্থাপন করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আরবি-ফারসি উভয় ভাষায় পান্ডিত্যের সাক্ষ্য তাঁর রচনাবলী। তিনি উপদেশধর্মী বহু গল্প-কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো বর্তমানের রসগ্রাহীদেরও মুগ্ধ করে। *গুলিস্তাঁ*, *বোস্তাঁ*, *কাসিদা*, *গযল*, *গযলিয়্যাৎ*, *কাদিমা*, *খাওয়াতিন*, *কুল্লিয়াৎ*, *আল-খাবিসাৎ* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। বস্তুত সাদীর মত বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে বিভিন্ন গল্প পরিবেশন করার দক্ষতা খুব কম সাহিত্যিকই দেখাতে পেরেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাসকে অনুপম দক্ষতায় তিনি হাজির করেন– *গুলিস্তাঁ* থেকে উদ্ধৃতি (দ্রষ্টব্য: আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ১৮৯):

"I fled from men to mountain and to plain,

For I had nothing from mankind to gain;

How is my case? Regard me in this den,

Where I must sweat with men that are not men"

মৎকৃত অনুবাদ: মানুষকে ছেড়ে আমি পালিয়েছি পর্বতে-সমতলে,

মানবের কাছে আমার পাওয়ার কিছুই ছিল না বলে।

আমার ব্যাপারটা কী? আদাব জানাও আমায় এই আস্তানায়,

গলদঘর্মই হবো মানুষের মাঝে যারা আর মানুষ নাই।"

একটি ক্ষুদ্র-তুচ্ছ জিনিসের মধ্যেও সাদী পর্যবেক্ষণ করেন অপরিমেয় সম্ভাবনা আর সেই গল্পকে কাব্যরূপ দেন তাঁর অননুকরণীয় শৈলীতে। *বোস্তান*থেকে উদ্ধৃতি (দ্রষ্টব্য: আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ১৯৬):

"Crush not you ant, who stores the golden grain :

He lives with pleasure, and will die in pain :

Learn from him rather to secure the spoil

Of patient cares and persevering toil."

মৎকৃত অনুবাদ: পিঁপড়েটাকে মেরো না, সোনালি শস্য সে সঞ্চয় করে,

আনন্দে সে বাঁচে, মরে যাবে বেদনাভরে ।

বরং তার কাছে শেখো, ধৈর্য-যত্ন আর সহিষ্ণু শ্রম দিয়ে

কীভাবে চলতে হয় নিজেকে বিলিয়ে ।"

কথকতা আর গীতলতার ঝংকারে সাধারণও অসাধারণ হয়ে ওঠে সাদীর কাব্যস্পর্শে– এটা তারই একটি নমুনা । সমালোচক তামীমদারী[২১] (তদেব : পৃ: ৫৪) তাই বলেন, সহজকে উচ্চে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাদী অনন্য । নীতি এবং শিক্ষার মত গুরুগম্ভীর বিষয়কেও নিজের কাঙ্খিত সামাজিকতার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিতে পারেন অবলীলাক্রমে । সাদী'র আবির্ভাব পারস্যের ইতিহাসের এক নিদারুণ গোলযোগপূর্ণ কালে । কিন্তু কালের মলিনতা সাদীকে জীবনীশক্তিশূন্য করতে পারে নি । আধ্যাত্মিকতা-দর্শন-মরমিবাদ নরনারীর প্রেম, জীবনের সুখ-দু:খ এবং মানবতার জয়গানে ভাস্বর শেখ সাদীর সাহিত্য তাই পরিণত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সম্পদে ।

ফারসি সাহিত্যের সর্বকালের এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩) পারস্যের রুম-এ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জীবনী সম্পর্কে একটি কাহিনির উল্লেখ করেছেন ব্রাউন[১৯] (তদেব : পৃ: ৫১৫) যেটি তাঁর প্রায় সব জীবনীকারের রচনাতেই রয়েছে । ফলে এটিকে প্রামাণ্য বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে । ১২১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে পিতা শায়খ

বাহাউদ্দিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিশাপুর এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁরা সেখানকার এক সুফিসাধক ফারসি সাহিত্যের অন্যতম সেরা কবি ফরিদউদ্দিন আত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান । রুমির পিতাও ছিলেন একজন নামকরা সুফিসাধক-দার্শনিক । আত্তার বালক রুমিকে আলিঙ্গন করে বলেন, একদিন এই বালক সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করবে । শিক্ষা-সাধনা এবং সাহিত্যচর্চা যে জীবনের অবিশ্রান্ত শ্রম ও ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়েরই নাম মাওলানা রুমিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । পিতৃভূমি কোনিয়া-অঞ্চল ছেড়ে সিরিয়ার দামেস্ক, আলেপ্পো প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে জীবনের অশেষ কষ্ট সয়ে বসবাস করেন তিনি । জগতের আরেক বিখ্যাত সুফিদরবেশ শামস তাব্রিজের কাছে রুমি আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের শিক্ষা নেন কোনিয়ায় । সমালোচকগণের দৃষ্টিতে তাব্রিজের জীবনের প্রভাব রুমির মনোজগতে এবং তাঁর সাহিত্যে একটি বিশাল অধ্যায় । ফারসি সাহিত্য সমালোচক সাত্তার তাঁর গ্রন্থে (তদেব : পৃ: ৪২-৪৩) রুমির জীবনে তাব্রিজের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন । তাব্রিজের সঙ্গে রুমির সংশ্লিষ্টতা, দু'জনের গুরু-শিষ্য সান্নিধ্য, তাব্রিজের অন্তর্ধান, রুমির তাঁকে অন্বেষণ করে ফেরা, তাব্রিজকে চিরজীবনের জান্যে হারিয়ে ফেলা, অন্তিমে রুমির চিরসত্যের সন্ধান-লাভ– এসব রুমির নিজের সুফিবাদ ও সাহিত্যে অর্থপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে ।

সত্যের আলোকরশ্মিতে নিজেকে পূর্বাপর পবিত্র করতে পারাই জীবনের অন্বিষ্ট । সত্যের সেই আলোকধারাই হচ্ছে প্রেম এবং রুমির সমগ্র রচনার প্রাণবিন্দু হচ্ছে প্রেম । প্রেমের নানা রূপ, নানা বর্ণ, নানা প্রকাশ তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি *মসনভি*, *দিওয়ান*ও অন্যান্য কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে । ২৬,৬৬০টি শ্লোকের সমন্বয়ে ৬টি খন্ডে রচিত *মসনভি* গ্রন্থটির মূল্য ব্রাউন-এর একটি মন্তব্যেই উপলব্ধি করা যায় । তিনি লিখেছেন (ব্রাউন[১৭] : ২য় খন্ড, তদেব, পৃ: ৫১৯), পারস্যের লোকেদের কাছে *মসনভি* হলো পহ্লভি বা ফার্সি ভাষার 'কোরআন শরিফ' । গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, সাধন-পদ্ধতি, সত্যের সন্ধান, পরম ঈশ্বরের উপলব্ধি– এসব রুমির কাব্যে মানবমনের গভীর জীবনজিজ্ঞাসার চিরায়ত উপাদান । মাওলানা রুমির ন্যায় জীবনের গভীর-ব্যাপক পরিমাপ-কে শিল্পের আঙ্গিকে উপস্থাপন করবার এমন দু:সাধ্য কর্ম সম্পাদন খুব কম সৃজনপ্রতিভার পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছে । তাঁর গদ্যরচনা *মজলিশ-ই-সাবা*, *ফীহি মা ফীহি*-তেও তাঁর অসাধারণ বাচনিকতা-দার্শনিকতা-জীবনাভিজ্ঞতা এসবের মেলবন্ধন প্রতিফলিত হয়েছে । তবে যুগ-যুগ ধরে বিশ্বের সাহিত্যরসপিপাসুরা তাঁর *দিওয়ান* এবং *মসনভি*'র অনুরাগী পাঠক । রুমির কবিতার জোরালো হৃদয়ার্তি আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাঁর স্বাতন্ত্র্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । এখানে উদ্ধৃত তাঁর একটি কাব্যাংশ থেকে সেটি অনুভব করা যায় । তাঁর গুরু শামস্ তাব্রিজ-কে কেন্দ্র করে তাঁর জীব ও পরম সত্ত্বার উপলব্ধির অসাধারণ প্রকাশের এটি একটি দৃষ্টান্ত :

"তাব্রীজের কি গৌরব শামসের দীপ্ত মুখচ্ছবি,

আলোক বিকীর্ণ করা কি উজ্জ্বল তেজোদ্দীপ্ত রবি।

সে সূর্যের চারপাশে অজস্র মেঘের আনাগোনা,

রুমি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি কবি-দার্শনিক হিসেবে সর্বত্র আদরণীয়। মানুষের জীবনের অনন্ত সম্ভাবনাকে অপরিমেয় জীবনের আনন্দে পরিণত করবার সাধনায় মানুষ যাতে প্রাণিত হতে পারে তার জন্যে রুমি মানবপ্রেমের বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সুরের আাধারে। সেই বাণী ও সুর আজ ভাষান্তরের বদৌলতে গীত হয়ে চলেছে সারা বিশ্বে। এত মহৎ সব কীর্তি আর অবদানকে নগণ্য ভেবে এই পৃথিবীর বিশালতায় স্রষ্টার মহত্বের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দেন নিজেকে– আরবেরি'র (আরবেরি[৭৫] : তদেব, পৃ: ২৪১)অনুবাদে তাঁর একটি কাব্যোচ্চারণ :

"I died as mineral and became a plant,

I died as plant and rose to animal,

I died as animal and I was man.

Why should I fear? When was I less by dying?

Yet once more I shall die as Man, to soar

With angels blest; but even from angelhood

I must pass on :*all except God doth perish.*"

মৎকৃত অনুবাদ:খনিজ হয়ে মরে জন্মেছি চারাগাছরূপে,

চারাগাছ মরে জন্মেছি প্রাণীর স্বরূপে,

মরেছি প্রাণী আমি, এসেছি এই মানবে।

আমার কিসের ভয়?মৃত্যুতে তুচ্ছ কেন হবো?

ফের মানুষ আমার মরণ হবে, আমি পৌঁছাবো

ফেরেশতার মূর্ততার শিখরে; তবু দেবত্ব নিয়ে আমি গাইবো :

কেবল স্রষ্টা ছাড়া আর সব বিলীন হয়ে যাবে।

মানুষের জীবনের সাধারণ বিষয়ভাবনাকে আশ্রয় করে পর্যবেক্ষণের ও উপলব্ধির গভীরতা দিয়ে মাওলানা রুমি ফারসি আবেগ ও মননকে বিশ্বের উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সেই উচ্চতায় রুমির অবস্থান চিরকালীন।

পারস্য, খোরাসান, আজারবাইজান, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, মেসোপটেমিয়া – এরকম দিক থেকে দিগন্তরে যাঁর কাব্যের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি কবি শামসুদ্দিন মহম্মদ হাফিয শিরাযি (১৩২৫-১৩৯১ খ্রিস্টাব্দ)। প্রেম এবং অধ্যাত্মবাদকে এক নতুন মাত্রা দিয়ে

নিজের কাব্যে চিরযৌবনের পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়েছেন হাফিয। শৈশবে পিতামাতার কষ্টের সংসারে প্রবল আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনি ইতিহাসখ্যাত। অল্প বয়সে পবিত্র কোরআন শরিফ মুখস্থ করবার কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি অর্জন করেন 'হাফিয' উপাধি। ধর্মের পারঙ্গমতার সেই নাম কাব্যের অমরতার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের সাহিত্যের গগনে তিনি চিরকালের নক্ষত্রে পরিণত হয়েছেন। আমরা ইতিহাসের কালপঞ্জির মুখোমুখি হলে দেখবো কবি হাফিযের সমকালীন পারস্যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবল পাকচক্রের মধ্যে যেখানে সুস্থির থাকাটাই দুরূহ সেখানে মৌনী তাপসের মত ধ্যানে নিমগ্ন সাধক হাফিয– শুধু তাই নয়, ফেরদৌসি, আত্তার, খাকানি, নিজামী, সাদী, রুমি এইসব উজ্জ্বল নক্ষত্রোপম ফারসি প্রতিভার পর তিনি আরেক নতুন শিখা নিয়ে জ্বলে উঠলেন চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে। শব্দ, ছন্দ, উপমা, অলংকার, ভাব-দর্শন সবকিছুকে করে তুললেন আপন স্বতঃস্ফূর্ততার অধীন। তাঁর কবিতার অসংখ্য পংক্তি ফারসি প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছে। ফারসি সাহিত্যের ঐতিহাসিক তামীমদারী তাঁর গ্রন্থে[২১] (তদেব : পৃ: ৯৭) হাফিযের এরকমকয়েকটি কাব্য-প্রবাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন: 'রাহে খাব যাদান' (নিজের অথবা অন্য কারও ঘুম ভাঙ্গানো), 'খাত বার আব যাদান' (অনর্থক কাজ করা), 'কাসে গেরেফতান' (নাচের তালে-তালে পেয়ালার উল্টোপিঠ দিয়ে তবলা বাজানো) 'বরুন রাফতান আয কাওল' (কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দর্শনে চৈতন্য হারিয়ে নিজের বক্তব্য-প্রসঙ্গ থেকে ছিটকে পড়া) ইত্যাদি। ইংরেজি সাহিত্যের অমর কবি শেক্সপিয়রের নাটকের অনেক উক্তি পরবর্তীতে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। হাফিযের কাব্য-পংক্তির প্রবাদ-প্রতিমতা থেকে তাঁর সাহিত্যের পঠন-পাঠন এবং তাঁর জনপ্রিয়তার বিষয়টি অনুমানযোগ্য।

জীবৎকালেই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে একেবারে শীর্ষ স্তরে অধিষ্ঠিত থাকা মানুষের শ্রদ্ধা-সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের স্ফুলিঙ্গ কবিকে এই পাওনা আদায় করে এনে দিয়েছে রসভোক্তাদের নিকট থেকে। অনেক সম্রাট তাঁর

কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁদের রাজদরবারে পদধূলি দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এমনকি সুদূর ভারতবর্ষ থেকে হাফিযের বিমুগ্ধ অনুরাগী বিভিন্ন সম্রাট বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করেন ভারতবর্ষ সফর করে যাওয়ার জন্যে। ফারসি সাহিত্য-সমালোচক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল তাঁর গ্রন্থে (তদেব : পৃ: ১২৪-১২৫) এসব কাহিনির উল্লেখ করেছেন। ই. জি. ব্রাউন-এর গ্রন্থেও (ব্রাউন[৭৯] : ৩য় খন্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৭) এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের সম্রাট মাহমুদ শাহ বিন হাসান (১৩৭৮-১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ) হাফিযকে তাঁর রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হাফিয ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রওয়ানাও দিয়েছিলেন কিন্তু পারস্য উপসাগরে আকস্মিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে যাত্রা স্থগিত করে তিনি ফিরে যান। তবে হাফিয সম্রাটের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর গযল রচনা করে পাঠান। ১৩৮৭ সালে স্বয়ং তৈমুরের সঙ্গে হাফিযের সাক্ষাতের কিংবদন্তীটি ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে, যেখানে প্রিয়তমার তিলের জন্যে বোখারা-সমরখন্দ দান করে দেবার উপমাটি কবি ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্-এর সঙ্গেও হাফিযের পত্র ও কাব্য-যোগাযোগের কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

ই. জি. ব্রাউন তাঁর গ্রন্থে (ব্রাউন[৭৯] : ৩য় খন্ড, তদেব, পৃ: ৩৫৬) বিখ্যাত ফারসি কবি এবং পন্ডিত মাসুদ ফারযাদ-এর একটি বক্তৃতার উল্লেখ করেন যেটি তিনি প্রদান করেছিলেন ১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি লন্ডনের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে ('*হাফেয এ্যান্ড হিজ পোয়েম্স*শিরোনামে')। সেই প্রবন্ধে মাসুদ ফারযাদ বিশ্বের সাতটি কাব্যাশ্চর্য সম্পর্কে বলেন যে বিশ্বে সাতটি কাব্য-আশ্চর্য রয়েছে। তাঁর মতে সেগুলোর মধ্যে রোমান কবি দান্তের *ডিভাইন কমেডি*, জার্মান কবি গ্যেটে'র *ফাউস্ট*, ফারসি কবি রুমি'র *মসনভি* এবং হাফিযের *দিওয়ান* থাকবেই। মাসুদ ফারযাদের উক্তিটি মূল্যবান এজন্যে, তিনি মূল ফারসি ভাষা-বিশেষজ্ঞ এবং স্বয়ং কবি। সমগ্র ফারসি সাহিত্যের মধ্যে তিনি যে-দু'টি কাব্যকর্ম বেছে নিয়েছিলেন সেগুলো আজ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে গেছে। *দিওয়ান* হাফিযের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি মসনভি, কাসিদা, রুবাই সব শৈলীতেই লিখেছেন কিন্তু গযল বা প্রেমগীতিতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিস্মরণীয়। সুফিবাদ, অধ্যাত্মবাদ, তাত্ত্বিকতা সব ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন তিনি অনবদ্য ভাষা ও শৈলীর মাধ্যমে। কবিতায় তিনি ভাল-মন্দ, দু:খ-আনন্দ, মুগ্ধতা-ক্ষোভ সবই ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁর শব্দের কারুকাজেঅভব্য-অসামাজিক প্রসঙ্গও শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, শুঁড়িখানা, ভন্ডামিসর্বস্বতা, কপটতা এসব বিষয়ের উপস্থাপনায় হাফিয শব্দকে অর্থ ও ধ্বনির ব্যঞ্জনায় সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক–

"আতিশ-ই-জরক্ক ব রিয়া খর্‌মন্-ই-দীন্ খাহদ্ সুখৎ।

হাফিয ঈন্ খরক্কহ্-ই-পশ্‌মীন্‌বয়ন্দাজ্ র বৎ ॥"

মৎকৃত অনুবাদ: ধর্মের গোলাঘরে লাগাবে আগুন ভন্ডামি-প্রতারণা।

হাফিয, দরবেশি বেশ ছেড়ে তুমি এগোও না ॥

বস্তুত হাফিযের কবিতা পাঠ করলে আমাদের এই বোধ জাগে যে জীবনের সবচাইতে বড় শক্তি প্রেম। প্রেমেরই নানা প্রকাশ নানা বিভঙ্গ বিভিন্ন প্রতিরূপে আমাদের চারপাশে ধরা দেয়। সেটাকে একেকজন একেকভাবে গ্রহণ করে। হাফিযের প্রেমিক সত্তা জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে ছুঁয়েছেনে পরমের মধ্যে আত্মলীন হওয়াটাকেই জীবনের সার্থকতা বলে ভেবেছে। তামীমদারী যথার্থই বলেন–

"শাব্দার্থিক স্তরগুলোতে হাফেযের শৈল্পিক কাঠামো হলো ঈহাম তথা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ও প্যারাডক্স ...এর একটি

সমন্বিত রূপ এবং আক্ষরিক স্তরগুলোতে তা হলো শব্দ ও বাগ্‌বৈশিষ্ট্যসমূহ বাছাইয়ের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"

(তদেব : পৃ: ৯৮)

কবি হাফিযের কাব্যের অপরিমেয় মূল্য বোঝা যায় তাঁর কাব্য-প্রকাশের ঘটনা থেকেই। তাঁর মৃত্যুর প্রায় চারশো বছর পরে প্রকাশ পায় হাফিযের কাব্যসংগ্রহ *দিওয়ান-ই-হাফিয*। মৃত্যুর এত দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হয়েও এমন বিশ্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা হওয়ার নজীর বিশ্বে তেমন একটা নেই। বরং কবিতার মধ্যে বিশ্বকে দর্শন করবার যে অনুধ্যান হাফিয বপন করেছিলেন আজও তার সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয় নি। বিখ্যাত হাফিয-সমালোচক শহীদ আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহ্‌হারী তাঁর *হাফিযের আধ্যাত্মিক দর্শন* শীর্ষক গ্রন্থে (মোতাহ্‌হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ৯৬-১০১) বলেন যে হাফিয়ের কবিতায় প্রতিফলিত আধ্যাত্মিকতা একরৈখিক বা একমাত্রিক নয়, এর বহু অর্থ ও বহু ব্যাখ্যা করা যায়। হাফিয তাঁর কাব্যে বিশ্বরূপের কায়া ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। দার্শনিকেরা তাত্ত্বিক গদ্য বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বক্তব্য দাঁড় করবার চেষ্টা করেন হাফিয তেমনটি করেন নি। তিনি সাধক কিন্তু সাধনাকে সৃজনশীলতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে ছন্দোবদ্ধ করে রেখে গেছেন। যাঁরা তাঁকে আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও করবার প্রচেষ্টারত রয়েছেন তাঁরা তাঁকে তাঁর সেই ছান্দিক আয়তন থেকে ধর্তব্যের সীমায় নিয়ে আনছেন। হাফিযের অবদান এতই বিশাল যে তাকে কখনই বর্ণনা করে পরিসমাপ্তির বিন্দুতে আটকানো যায় না। তাই, প্রসঙ্গত রাহবার সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী'র হাফিয সম্পর্কে একটি মন্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য। এটি তিনি করেছিলেন ১৯৮৮ সালে হাফিযের জন্মভূমি শিরাজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হাফিয সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে। তিনি বলেছেন– "আমরা হাফেযকে কেবল একটি ঐতিহাসিক কীর্তির অনুঘটক হিসেবে শ্রদ্ধা করি না; বরং হাফেয একটি বাণী ও একটি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।" (দ্রষ্টব্য: মোতাহ্‌হারী[৪০] : ঐ, পৃ: ১৫৭) তৈমুর যুগে উদিত হয়ে হাফিয শিরাজী চিরকালের নক্ষত্রে পরিণত হলেন। হাফিয-উত্তর আরও অনেকেই ছিলেন যাঁদেও তৈমুর যুগের স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিয়ামতুল্লাহ কিরমানি, কাতিবি নিশাপুরি, আবদুল্লাহ ইবনে ফাদলিল্লাহ, শরফুদ্দীন ইয়াযদী– এরকম অনেক রচয়িতার নাম করা যায় যাঁরা কাব্য-গদ্য-কাহিনি-ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ করে গেছেন ফারসি সাহিত্যের জগতকে।

ফেরদৌসি, সাদী, রুমি, হাফিয প্রমুখ-বাহিত ফারসি সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগোয় কালের পরিক্রমায়। যদিওউপর্যুক্ত যে-চারজন কবি-সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করা গেল তাঁদের সমকক্ষতার পর্যায়েআসাটা পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভবপর না হলেও ফারসি সাহিত্য বিষয়ে-বৈচিত্র্যে নব-নব ধারার অভিমুখী হতে থাকে। তৈমুর যুগ-পরবর্তী ফারসি সাহিত্যের জন্যে একটা নতুন বিষয়ের অবতারণা হয় এর সমান্তরাল যাত্রা-পথের গতিময়তার ফলে। তৈমুর শাসনের অবসানের পর খোদ পারস্যে সাফাভি

শাসনকেন্দ্রিক ফারসি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে চলে। অন্যদিকে, ভারতবর্ষে সম্রাট বাবর-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যে ফারসি সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারাটির বিবর্তন অব্যাহত থাকে। দুই শাসকের মধ্যে একটি মৌল প্রভেদের কথা বলা যায়– সাফাভিরা ছিল সংরক্ষণপন্থী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মুঘলরা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। মুঘল শাসনামলে তাঁদের সাম্রাজ্যে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণার বিষয়টি একদিক থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। মুঘল সম্রাটদের নিজেদের ভাষা তুর্কি হওয়া সত্ত্বেও ফারসি ভাষার মাধুর্য-সৌন্দর্য ও অধিকতর কার্যকারিতার কারণে তাঁরা ফারসিকেই প্রশাসনিক ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাতে করে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তারই উচ্চতার অবস্থান সাহিত্যের পরিধিতেও ফারসি গৃহীত হয় সাদরে। মুঘল সাম্রাজ্যে ফারসি ভাষার স্থিতির ফলে দূর-দূরান্ত থেকে ফারসি-জানা মানুষদের সমাগম সাম্রাজ্যে অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকেরা মুঘল সাম্রাজ্যে নিজেদের প্রতিভা-প্রদর্শনের একটা অনুকূল আশ্রয় খুঁজে পেলেন। তাঁরা বিদেশ-বিভূঁই ভারতকে আপন করে নিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে ফারসি সাহিত্যের বিকাশ একটা সম্মানজনক উচ্চতাকে স্পর্শ করেছিল। সমালোচকের মতে, "শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একমাত্র সম্রাট আকবরের রাজদরবারে এসেছিলেন একান্ন জন কবি এবং তাঁদের সবারই জন্মস্থান ছিল পারস্যের বিভিন্ন স্থানে।" (সাত্তার[৫৩] : তদেব, পৃ: ৭৪)

পারস্যে সাফাভি-ক্বাজারি এবং ভারতে মুঘল শাসন ফারসি ভাষাকে যে-স্তরে উন্নীত করে সেখান থেকে পরবর্তীকালের ফারসি সাহিত্য গদ্যে-পদ্যে এবং অন্যতর আঙ্গিকে স্থান-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হয়। তামীমদারীর মতে (তদেব, পৃ: ১১৯), ক্বাজারি যুগে (হিজরি ১৩০০ শতক-পরবর্তী) পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এসবের প্রকাশ ও বিস্তারের ফলে ধ্রুপদী ফারসি ভাষা-সাহিত্য বদলাতে শুরু করে। ফারসি ভাষা-সাহিত্যজগতে সরল-সহজ প্রকাশভঙ্গির প্রাধান্য সূচিত হয়। এছাড়া গল্প-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রচলনের ফলে

গদ্যসাহিত্যে প্রচুর সংখ্যক লেখকের আগমন ঘটতে শুরু করে। কাব্য, উপাখ্যান, গদ্য, গল্প, দর্শন, ব্যঙ্গ, নাট্যধর্মী ইত্যাদি বিচিত্র শৈলীর রচনা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে থাকে। আধুনিক কালে এসে ফারসি সাহিত্যের বিকাশ বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার নিজের ঐতিহ্য-গৌরব ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে আরও গতিমান হয়ে চলেছে। আমাদের আলোচ্য কবি হাফিয শিরাযি'র কালগত প্রেক্ষাপটের নিরিখে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের যে-সালতামামি উঠে আসে তাতে একথা বলা যায়, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য একদিনে বা এক যুগে বিকশিত হয় নি। এক বিপুল সময়াতন আর বিশাল-বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার-সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাহিত্যের পরম্পরাসাধিত হয়ে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাফিয পরিচিতি

বিশ্বনন্দিত সুফি কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন হাফিয শিরাযি। শুধু মুসলিম বিশ্ব নয়, তাঁর রচিত দিভা'ন (কাব্য গ্রন্থ) সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও দর্শনের খনিরূপে সমগ্র দুনিয়ায় আলোচিত। অনেকের ধারণা তাঁর কাব্যগ্রন্থ এক বিশাল রহস্যের ভান্ডার। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে প্রেমের আলোয় আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের সকল প্রেমিক হৃদয়কে। মুসলিম রেঁনেসার জোয়ারের সময় সমুদ্র-উত্থিত এই রত্ন নতুন চিন্তার বীজ দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছেন। অথচ তাঁর সাথে বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন মৌলবাদী ও কঠোরপন্থী মোল্লার দল।কিন্তু সেপ্রবাহের প্রবল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তিনি বাগ্মিতা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়ে বীরদর্পে ছুটে গেছেন মহাকালের মিলন মেলায়। আলোকিত হয়েছেন পরম প্রেমের জ্যোতির আলোকে। অর্জন করেছেন অসাধারণ জনপ্রিয়তা আর বিশ্বের দরবারে আর্বিভূত হয়েছেন প্রতিভার বিস্ময়মূর্তিতে। (আহ্মাদ[২] : ২০১৪, পটভূমি) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ফারসি সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে আমরা দুজন উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাই, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এবং শেখ মুসলেহ্ উদ্দিন সাদি শিরাযি। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে একমাত্র দেদীপ্যমান নক্ষত্র হলেন খাজা হাফিয শিরাযি। কাজেই আমরা অষ্টম শতাব্দীকেই কবি হাফিযের শতাব্দী বলে ধরে নিতে পারি। (শাহেদী[৪৯] : ১৯৯০, পৃ: ৪৭)

যে ক'জন ফারসি কবি এ ভাষার সাহিত্যকে বিশ্বময় পরিচিত করে তুলেছেন এবং বিশ্বজোড়া ফারসি সাহিত্যের অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্ত সৃষ্টি করেছেন, হাফিয তাদের মধ্যে অন্যতম। বলাহয়ে থাকে যে, বিশ্বসাহিত্যে হোমার, কালিদাস, শেক্সপিয়ার এবং গ্যাটের পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু গযল সম্রাট হাফিযের সঠিক জীবন ইতিহাস আজও পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীকালের মধ্যে তাঁর কোন জীবনকথা রচিত হয়নি। এটি শুধু হাফিযের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগীয় ফারসি কবিদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই এমনটি দেখা যায়।

তাদের জীবন ইতিহাস নিয়ে নানা কিংবদন্তি রয়েছে। হাফিযের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হাফিয এত জনপ্রিয় কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমসাময়িককালে রচিত ফারসি গ্রন্থাবলীতে তার জীবন-কাহিনী সম্পর্কে তেমন উল্লেখ পাওয়া যায়না। এমনকি তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখও সেসব গ্রন্থে উল্লেখ নেই। (খান[১৫] : ২০১২, পৃ: ২৫)আধুনিক পন্ডিতবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা এবং গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও হাফিযের নির্ভুল ও পূর্ণ জীবনী রচনা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি; শুধুমাত্র তাঁর জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনার সূত্র মিলেছেমাত্র; তাও আবার কিংবদন্তিভিত্তিক। তাঁর জীবনের নির্ভুল তথ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আশা করি অনাগতকালের পন্ডিতবর্গ এ বিষয়ে সফলকাম হবেন।

হাফিযকে কিংবদন্তির কবি বলা হলেও তিনি কিংবদন্তির যুগে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর যুগে ইরান শিক্ষা-সভ্যতায় আলোকিত ছিলো। তাকে নিয়ে কিংবদন্তির কারণ হলো তাঁর জীবিতকালে স্বদেশে তিনি বলতে গেলে উপেক্ষিত ছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-মনীষীদের নিয়ে নানারকম কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, হোমার অন্ধ কবি ছিলেন। অথচ তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় এত বড় চাক্ষুষমান পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। বিখ্যাত আরবি কবি আল মা আরি অন্ধ ছিলেন; তেমনি অন্ধ ছিলেন ফারসি কাব্য সাহিত্যের জনক বলে খ্যাতরুদাকি সামারকান্দি। আবার বলা হয়ে থাকে যে, বাল্মিকি অন্ধ ছিলেননা,তবে ডাকাত ছিলেন; চীনের কবি লিপো ছিলেন চাঁদে পাওয়া। এমন হাজারো অলৌকিক কাহিনী রয়েছে কবিদের নামে। হাফিযের বেলায় রয়েছে কবি জাদুকর তিনি।প্রাচীন ইরানে কবিদের শা'য়ের বা কাব্য ও সংগীতের জাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হতো। সাধারণত যরথুস্ত্রিয় ধর্মগুরুদের মাঝে অনেক কবি ছিলেন, যাঁদের প্রভাব ও জাদুকরী শক্তিতে লোকজন মোহিত হতো। তাই তাদেরকে 'শা'য়েরই মুগান' বলা হতো। 'মুগান' শব্দটি পাহলাবি যরথুস্ত্রিয় শাস্ত্রে 'মাজি'বা 'Magi'নামে পরিচিত। শব্দটির আভেস্তিয় রূপ হলো 'ম্যাগাস' বা 'মুগস', এ শব্দটি থেকে ইংরেজী বা ইউরোপিয় ভাষায় 'ম্যাজিসিয়ান' হয়েছে। যরথুস্ত্রিয় পুরোহিতদের সাধারণত 'মুগান' বা 'ম্যাগিন' বলা হয়। সে-আদলে ইরানে অধ্যাত্ম সাধকদের'পীরে মুগান' বলা হয়। তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে

সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, তাঁরা যা খুশি তা-ই করতে পারেন বলে সর্বসাধারণের বিশ্বাস। হাফিয শিরাযিও তাঁর শব্দের মন্ত্রবল দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করেছেন। জীবিতকালে তিনি যেমন শক্তিধর শাসক কিংবা স্বৈরাচারী সুলতানকে তাঁর শব্দ জাদু দিয়ে জব্দ করে দিয়েছেন, তেমনি মৃত্যুর পরও তাঁর দিভা'ন এর শব্দ একইভাবে মানবমনে জাদুকরী প্রভার রেখেছে।(সাঈদ[৫৬] : ২০১২, পৃ: ২৯-৩০)

তিনি জীবিতকালে সর্বসাধারণের কাছে ছিলেন 'লিসানুল গা'য়েব' বা অদৃশ্যের রসনা। অনেকের কাছে তিনি ছিলেন 'তরজুমানুল আসরা'র' বা রহস্যেও মর্মসন্ধানী।এমনি একজন জাদুকরী কবির জীবন সমন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে হাফিযের মৃত্যুর পর তাঁর ভক্ত ও বন্ধু মুহাম্মদ গুল আনদাম প্রথমে হাফিযের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এবং মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে গাওয়া গযল ও নাগমাগুলো সংগ্রহ করতে মনোনিবেশ করেন। সেগুলোর কিছু সংগ্রহ নিয়েই 'দিভা'ন-ই-হাফিয' শিরোনামে তাঁর কাব্যকর্ম প্রকাশ করেন তিনি। সেই 'দিভা'ন-ই-হাফিয, আজ বিশ্বময় দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তৈরী করছে হাফিযের অগনিত ভক্ত-অনুরাগী। (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ২৫)

জন্ম ও জন্ম স্থান

হাফিযের জীবন-ইতিহাস জানতে গেলেও আমাদেরকে প্রথমে তাঁর বন্ধু গুল আনদামেরই শরণাপন্ন হতে হবে। তবে তিনি হাফিযের জন্মসন উল্লেখ করেন নি। সে কারণেই হয়তো তাঁর জন্মসন নিয়ে পন্ডিতবর্গের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিতহয়। তবে *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত *দীওয়ান-ই-হাফিয,ফারসী সাহিত্যের কালক্রম,পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস,পারস্য প্রতিভা,তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান,হাফিজের গযলগুচ্ছ,ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস,এ শর্ট হিস্ট্রি অব*

*পার্সিয়ান লিটারেচার, এ লিটারেরি হিস্ট্রি অব পার্সিয়া*প্রভৃতি গ্রন্থের আলোকে বলা যায় যে, তিনি ৭২০ হিজরী থেকে ৭২৯ হিজরী মোতাবেক ১৩১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময় ইরানের শিরায নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

নাম ও বংশ পরিচয়

ড. যাবিহ্ উল্লাহ্ সাফা তাঁর পুরো নাম লিখেছেন এভাবে-

خواجه شمس الدين محمد بن محمد بن محمد حافظ شيرازى

(সাফা'[৬৩] : ১৩৯০ হিজরী শামসি, পৃ: ১০৬৪)

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, উপনাম শামস্ উদ্দিন, ভণিতা হাফিয। তবে তাকে 'হাফিয' নামেই ডাকা হতো। কেননা তিনি পবিত্র কোরআন মজিদ হেফয্ করেছিলেন। কোরআন মজিদের ওপর তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ও সুমধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াতের কারণে সমসাময়িককালের একজন পীর-মুর্শিদ তাকে 'হাফিয' উপাধি দান করেন। ড. মুহাম্মদ ঈশা শাহেদীর উদ্ধৃতিতে (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৫৪) এবিষয়ে 'দিভা'ন-ই-হাফিয' এ তিনি নিজেই বলেছেন-

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

بقرآنی که اندر سینه داری

হাফিয! তোমার চেয়ে সুন্দর গান দেখি নাই আর কারো

তোমার বুকের লুকানো কোরআন সে তো সুন্দর আরোও ।

তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ শিরাযের অধিবাসী ছিলেননা। কেউ কেউ বলেন তাঁর পিতামহ নেহাওন্দের নিকটবর্তী 'সিরকান' নামক স্থান হতে

ব্যবসার জন্য শিরাযে আসেন। হাফিযের পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। তবে কি ব্যবসায়ী ছিলেন জানা যায়নি। শৈশবে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। (শহীদুল্লাহ্[৪৮] :তদেব, ভূমিকা) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তাঁর দাদা ছিলেন ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের 'কুপাই' এর অধিবাসী। কিন্তু আতাবেক শাসনামলে বিশেষ কারণে তিনি ফারসের রাজধানী শিরায গিয়ে 'রুকনাবাদ' মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। হাফিয শিরাযীর পিতার নাম ছিলো বাহাউদ্দিন। বাহাউদ্দিনের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে হচ্ছেন শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিয। (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৫৪)

শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষা

হাফিযের পিতা বাহাউদ্দিন শিরাযে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে সম্পদশালী হন। বাহাউদ্দিন তিনজন ছেলে রেখে মারা যান। ব্যবসা চালাবার মতো তাদের কারোও ক্ষমতা ছিলোনা। কাজেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিতার সম্পত্তি শেষ করে ফেলেন এবং দেশ ত্যাগ করে কোথাও চলে যান। হাফিয তখন অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর মায়ের সাথেই থেকে গেলেন। কাজেই বলা যায় হাফিযের শৈশব জীবন খুব একটা সুখের ছিলোনা। কারণ তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মায়ের পক্ষে ছেলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন এবং তাদের দিন চলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তাই তাঁর মা তাকে পাড়ার জনৈক ব্যক্তির নিকট তাঁর ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন। কিন্তু সেই লোকাটির স্বভাব ভালো ছিলো না। কাজেই হাফিযের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির সঙ্গ ত্যাগ

করে ময়দা পিষণের কাজ গ্রহণ করেন। শেষ রাত হতে সকাল পর্যন্ত তিনি এ কাজ করতেন। এই কারখানার অদূরে একটি মক্তব ছিলো এবং পাড়ার সকল ছেলে-মেয়ে সেখানে লেখাপড়া করতো। হাফিয প্রায়ই সেই মক্তবের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন। ক্রমশঃ তাঁরও লেখাপড়ার ইচ্ছা হলো এবং তিনি মক্তবে ভর্তি হলেন। ময়দা পিষণের কাজ হতে তিনি যা আয় করতেন তা মায়ের হাতে দিতেন আর অবশিষ্ট কিছু উদ্বৃত্ত আয় শিক্ষককে বেতনস্বরূপ প্রদান করতেন। এই মক্তবেই তিনি কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেন। এই মক্তবেই কাওয়ামুদ্দিন আব্দুল্লাহ্ নামে একজন প্রসিদ্ধ আলেম শিক্ষা প্রদান করতেন।এই মক্তবে তিনি পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (তাফসির) ও দর্শন শাস্ত্রেরও জ্ঞান অর্জন করেন। কথিত আছে যে, তিনি শামসুদ্দিন আবদুল্লাহ্ শিরাযি এবং কাজি এযদুদ্দিন আব্দুর রহমান ইয়াহ্ইয়ার নিকট থেকে দর্শন ও সুফিবাদের জ্ঞান অর্জন করেন। শামুসুদ্দিন আবদুল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের উপনাম 'শামসুদ্দিন' প্রদান করেন। এর অর্থ ধর্ম ভাস্কর। (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ১৮৬)

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে- (নিউজ লেটার[২৯] : ২০০৫, পৃ: ৪১) হাফিযের মা তাঁকে নিকটস্থ 'দারুস সাফা' নামক মক্তবে তৎকালীন শিক্ষাবিদ সাইয়্যেদ আল্লামা জুরজানি এবং আবু মুহাম্মদ শামসুদ্দিন বেনাজিরি শিরাযির নিকট প্রেরণ করেন। কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাফিয শিরাযির দুই ভাইএবং এক বোন ছিলো। এক ভাইয়ের নাম ছিলো খাজা খলিল আদেল যিনি ৫৯ বছর বয়সে এবং অপর ভাই যৌবনে ইন্তেকাল করেন। তাই পিতৃহারা হাফিযকে শৈশবেই সংসারের দায় বহন করতে হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বকোষ (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] :২৫শ খন্ড, ১৯৯৬, পৃ: ২০১) এ এসেছে:

> "তাঁহার মাতা-পিতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। তিনি নিজেও তাঁহার রচনাবলীর কোথাও স্পষ্টভাবে তাহাদের সম্বন্ধে কোনোও বর্ণনা প্রদান করেন নাই। অবশ্য দুই শতাব্দীর অধিককাল পর ঐতিহাসিক ফিরিশ্তাঃ তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে নামোল্লেখ ব্যতিরেকেই কবির এক ভগিনী ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করিয়াছেন। কবি হাফিয কৈশোরে কুরআন মজীদ হিফয্ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দীনি 'ইলম' ও এতদস্ংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিদ্যা অর্জনে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।"

আবার অন্যত্র (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৬০) বলা হয়েছে যে, হাফিযের পিতা বাহাউদ্দিন শিরাযে মদের ব্যবসা করতেন। তিনি প্রখর

বুদ্ধি ও ঘ্রাণদক্ষতা দিয়ে মদের গুণাগুণ ও স্বাদের বিচার করে তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারতেন। তাই তাঁর ভাঁটি থেকে উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়ে রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে মদ্য বিলাসীদের প্রিয় আসরে স্থান করে নিয়েছিলো। ঠিক এমন সময়ে হাফিযের জন্ম হয়। তখন হঠাৎ সালযুক শাসকের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হয় এবং বাহাউদ্দিনের ব্যবসায়েও দুর্ভাগ্য নেমে আসে, আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হাফিযের মা তাঁর স্বামীর কোনো এক ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং অবশেষে শিশুপুত্রসহ তিনি সেখানে নিরাপদে থাকতে পারেন। সেই ব্যবসায়ী হাফিযকে ছেলের মতো লালন-পালন করেন। হাফিযেরমা শেষ পর্যন্ত তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। কিশোর হাফিয তা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি পিতৃবন্ধু-গৃহ ত্যাগ করে মায়ের সাথে সমস্ত সর্ম্পক ছিন্ন করেন। তিনি একটি রুটির দোকানে রুটি তৈরি ও ভৃত্যের কাজ শুরু করেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের কোরআন পাঠ আর কাসিদা ও গযল সুর করে গাওয়াটা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতো। শেষ অবধি এই গযল আর কাসিদাই তাঁর জীবনধারণের সম্বল হয়েছিলো।

ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী গ্রন্থে (শাহেদী[৪৯] :তদেব, পৃ: ৫৬)উল্লেখ আছে যে, হাফিয তাঁর রুটির দোকানের আয়কে চারভাগে ভাগ করে নিতেন। একভাগ তাঁর বিধবা মায়ের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষক ও তৃতীয় ভাগ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে বাদ বাকি চর্তুথ ভাগ নিজের জন্য খরচ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ্পাকের অশেষ রহমতে কোরআন শরীফ মুখস্থ করে হাফেয হন এবং লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন:

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

"জগতের মাঝে এমন হাফিয পাবে নাকো খুঁজে

আমার মতো যে কোরআনের তত্ত্বে দর্শন বুঝে ।"

জ্ঞানার্জন ওআধ্যাত্মিক সাধনা

জানা যায় হাফিয ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যার্জনে রত ছিলেন । তাঁর রচনার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁরযুগের ধর্মীয় শিক্ষা ওজ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন । জ্যোতির্বিজ্ঞানেও যে তাঁর পান্ডিত্য ছিলো, তাঁর কাব্যে তার নিভুর্ল প্রমাণ পাওয়া যায় । তেমনি আরবি সাহিত্যে তিনিযে একজন বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন, সেই প্রমাণও তাঁর দিভা'নের সর্বত্র বিদ্যমান । হাফিয বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন । শিরাযে, যেখানে তিনি বাস করতেন তার অদূরেই একটা বাজার ছিলো । এই বাজারে একজন বড় বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন । তিনি ছিলেন কাব্যপ্রেমিক ও রসিক প্রকৃতির লোক । সেখানে রসিক কবি-সাহিত্যিকরা এসে জড়ো হতেন এবং কাব্যচর্চার আড্ডা জমাতেন । হাফিযেরওসেখানে যাতায়াত ছিলো । সেখানকার কবিদের সংস্পর্শ লাভ করে তরুণ বয়সেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন । প্রথমদিকে কাব্যচর্চায় অনেকসময় তাঁর বন্ধুরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো । এসময় হাফিয 'শাখ-ই-নাবাত' নামক এক যুবতীর প্রেমে পড়েন বলে কিংবদন্তি আছে । (খান[১৫] :তদেব, পৃ: ২৮)

এভাবে দুবছর অতিবাহিত হলো । ক্রমে হাফিয তাদের বিদ্রূপ বুঝতে পেরে নিতান্ত ক্ষুন্ন হয়ে বাবাকুহি নামক পীরের আস্তানায় গিয়ে দোয়া-দরূদ পাঠ ও কান্নাকাটি করতে লাগলেন । সে সময়টা ছিলো পবিত্র রমজান মাস । কয়েকদিন কান্নাকাটি করার পর তন্দ্রাছন্ন এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, একজন নূরানী চেহারার লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাঁর নিকটহাজির হলেন । তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে । তিনি হাফিযকে নিজের মুখ থেকে এক লোকমা খাবার বের করে খাইয়ে দিলেন এবং বললেন,'তোমার জন্য জ্ঞানের

দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হলো । তোমার কাব্যগাঁথা পৃথিবীর সর্বত্র অমর হয়ে থাকবে' । এ কথা বলেই তিনি যাত্রা শুরু করলেন । হাফিয ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লাভের জন্যেতাঁর পেছনে দৌড়াতে লাগলেন । কিন্তু ততক্ষণে তিনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন । হাফিয একজন বৃদ্ধ আ'বেদকে (ইবাদতকারী, ধর্মপ্রাণ সাধু পুরুষ) দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-'ঐযে চলে যাচ্ছেন, সেই নূরানী চেহারার লোকটার কি পরিচয়?' বৃদ্ধ জবাবদিলেন-'তিনি এলমের নগরীর দরজা হযরত আলী (রাঃ) ।' (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ১৭) প্রভাতে মুয়াজ্জিনের আযানে হাফিযের ঘুম ভেঙ্গে যায় । কিন্তু কেমন যে এক রূহানি আমেজ তাঁকে আছন্ন করে রাখে । তিনি কবিতা লিখে ফেললেন-

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
بعد از این روی من و آینه وصف جمال
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستـحـق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
هاتـف آن روز به من مژده این دولت داد
کـه بدان جور و جفا صبر و ثباتـم دادند
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد
اجر صبریست کز آن شاخ نباتـم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
کـه ز بـند غـم ایام نـجاتـم دادند

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১৩৯, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ৯৩)

www.hafizonlove.com -এ ওয়েবসাইট এ গযলটির চমৎকার কাব্যানুবাদ পাওয়া যায়:

At the break of dawn from sorrows I was saved

In the dark night of the soul, drank the elixir I craved.

Ecstatic, my soul was radiant bright,

Sanctified cup of my life, drunk I behaved.

O, what exalted sunrise, what glorious night

That holy night, to the New Life was enslaved.

From now on, in the mirror, O what a sight

The mirror, glory of my soul, proclaimed and raved.

Wonder not if I am bathed in heart's delight

I deserved and was given, though may have seemed depraved.

Angelic voice brought news of my God-given right

My patience is the fruit of hardships that I braved.

Sweet nectar drips from my lips, as my words take their flight

Beloved, my sweetheart, upon my soul patiently had engraved.

T was Hafiz, divinely inspired that I attained such height

It was God's mercy that time's sorrows for me waived.(Ghazal 183)

যখন তিনি শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন লোকজন তাঁকে দেখতে পেয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছলে তাঁর কবিতা ও গযল শোনার প্রস্তাব করলো। হাফিয যখন গযল গাওয়া শুরু করলেন, তখন সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো এবং বললো- এ গযল তোমার নয়, এটা নকল। কিন্তু কার রচিত গযল তাও তারা বলতে পারলো না। পরীক্ষামূলকভাবে তারা হাফিযকে আরো গযল ও কবিতা শোনানোর অনুরোধ জানালো। হাফিয যতই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন, মানুষ ততই বিস্ময়ে অভিভূত হতে লাগলো। এবার তারাহাফিযের কবিতা ও গযল মুখস্থ করা শুরু করলো। এভাবে চারদিকে তাঁর কাব্য প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে এ ধরনের কিংবদন্তিকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কেননা এতে তাঁর খোদা প্রদত্ত প্রতিভা, শ্রম-সাধনা ও পান্ডিত্যকে খাটোকরা হয়। তিনি পূর্ব থেকেই পবিত্র কোরআন, ফিকাহ্, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্র প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।(শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ১৭)

যেহেতু হাফিয সুমধুরকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন,তিনি বিভিন্ন গযলের জলসায় অংশ নিতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠে রুদাকি, আনসারি, আনওয়ারি প্রমুখ কবির কাব্যপাঠ শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেতো। এভাবে হাফিয গযলের আসরে গযল পাঠ করে নাম করে ফেললেন। হাফিযের আগে গযলের নির্দিষ্ট কোনো রূপ কিংবা সুর ছিলোনা বা প্রেম, আবেগ কিংবা গভীর ভাবানুভূতিও ছিলোনা। গযল গাইতে গাইতে হাফিযই তা আনয়ন করেন। বহুদিন তিনি অন্যের রচিত গযল গেয়েছেন। ক্রমশঃ নিজের কথা ও সুরে গযল রচনা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি গযলের অসাধারণ ঘরানা (সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত) সৃষ্টি করেন। তাই অনেকের মতে গযলের নির্মাতা ও রূপকার হলেন হাফিয শিরাযি। অবশেষে তিনি গযল সম্রাট হয়ে গেলেন এবং অন্যের রচিত গযল ছেড়ে নিজের রচিত নাগমা ও গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। ছেলে-বুড়ো এমনকি ঘরের নারীরা পর্যন্ত সবজায়গায় তাঁর গযল সুর করে গাইতে লাগলো।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৩১)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি শুনে শিরাযের রাজমন্ত্রী হাজি কিওয়ামুদ্দিন হাসান ৭৪৫ হিজরী সনে তাঁর শিক্ষাদানেরজন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি সেখানে মনের আনন্দে অধ্যাপনায় রত থাকেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র উদ্ধৃতিতে (শহীদুল্লাহ্[৪৮] :তদেব, ভূমিকা)হাফিযের সমসাময়িক মাওলানা গুল আনদাম তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে লিখেছেন-

> "তাঁহার কুরআন পাঠে একান্ত মনোযোগ, রাজকার্য্যে নিয়োগ, কাশ্শাফ (আল্লামা যমখ্ শারী প্রণীত কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্য) ও মিস্বাহের (সম্ভবতঃ আল-মুতরিযী, মৃত্যু-১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ,প্রণীত আরবী ব্যকরণ) টীকা রচনা, মতালি'(বয়যাবী,

> মৃত্যু-১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, প্রণীত কুর্আনের প্রসিদ্ধ ভাষ্য মতা' লিউল্ আন্ওয়ার) ও মিফ্তাহের (সম্ভবতঃ সক্কাকী, মৃত্যু-১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ, প্রণীত অলংকার শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক মিফ্তাহুল 'উলূম) চর্চ্চা, অলংকার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি উপার্জ্জন এবং আরবী'দীওআন' গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদন- তাঁহার 'বয়ত'ও 'গযল' গুলির সংগ্রহ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল এবং তাঁহার 'বয়ত' গুলির সম্পাদন ও সঙ্কলন হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছিল।"

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে, হাজি কিওয়ামুদ্দিন হাসান তৎকালীন সুলতানের দরবারে অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নৈকট্যলাভী ছিলেন। তিনি একজন দানশীল, উদারচেতা ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। কবি হাফিয তাঁর আর্থিক বদান্যতার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী ছিলেন। ৭৪৫/১৩৫৩ সনে মুজাফ্ফারি রাজবংশের সুলতান মুবারিযুদ্দিন মুহাম্মদ ফারিস প্রদেশ জয় করারসাথে সাথে শিরায নগরীও দখল করে নেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন বুরহানুদ্দিন ফাত্হুল্লাহ্, যার প্রশংসায় হাফিয কাসিদা রচনা করেছিলেন। পরে আরেকজন মন্ত্রী যার নাম ছিলো আবু নাসর লুত্ফুল্লাহ্, তাঁর মৃত্যুতেও হাফিয শোকগাঁথা রচনা করেন। তারপর নব-নিযুক্ত মন্ত্রী হন খাজা কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আলি (মন্ত্রীত্বকাল, ১৩৫৮-১৩৫৯ হতে আগষ্ট ১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনিও হাফিযের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে টাকশালের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনিঅত্যন্ত যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আধিপত্যের সাথে রাজ্যের কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। অতঃপর সুলতান তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করলে কবি হাফিয তাঁর হত্যাকান্ডে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, হাফিয যে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন কিওয়ামুদ্দিন নামের দুজন ব্যক্তির মধ্য হতে কোনো একজন তাঁকে উক্ত

মাদ্রাসায় নিযুক্ত করেছিলেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃ: ২০২)হাফিয যখন ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যস্ত ছিলেনতখন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্য জ্ঞানের চাপে তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠতো। এ সম্পর্কে *দীওয়ান-ই-হাফিয* গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) উল্লেখিত বেশ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

از قال و قیلی مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمتی معشوق و می کنم

"মাদ্রাসার তর্ক-বির্তকে আমার হৃদয় ম্রিয়মান হয়েছে,

এখন একটুকু প্রেমাস্পদ আর সুরার সেবা করে নেই।"

তখন হাফিয জ্ঞানের সাধনা ছেড়ে প্রেমের সাধনা শুরু করলেন। তিনি বলেন-

"হে হাফিয!মাদ্রাসার ভান্ডারে প্রেমের মানিক খুঁজোনা

পা বাইরে রাখো যদি অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকে।"

অন্যত্র বলেন-

بر دری مدرسه تا چند نشینی حافظ

خیز تا از دری میخانه کوشادی طلبم

"হে হাফিয! আর কতকাল মাদ্রাসার দোরে বসে থাকবে,

উঠো, শরাবখানার দরজায় মনের ফূর্তি সন্ধান করি।"

অন্যত্র তিনি বলেন-

"বইয়ের পাতা ধুয়ে ফেলো, যদি তুমি আমার সহপাঠী হও

কেননা প্রেমের জ্ঞান পুঁথির মধ্যে নেই।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, হাফিয প্রথমে জ্ঞানের সাধনা করতেন। পরে আস্তে আস্তে তিনি অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করেছেন। সম্ভবত তিনি চল্লিশ বছর বয়সে সুফিমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হয়তো এ সময়েই তিনি লিখেছেন-

"যে জ্ঞান ও উৎকর্ষ আমার হৃদয়ে চল্লিশ বছর জমা রেখেছে

ভয় হয় তা সেই নার্গিস ফুলের ন্যায় মদির নয়ন একেবারে নিয়ে যাবে।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন-

"মাদ্রাসার ঘরবাড়ী এবং বিদ্যার তর্ক-বিতর্ক

পান পাত্র ও চন্দ্র বদন সাকির পথে সব রেখে দিয়েছি।"

হাফিয তাঁর কবিতায় সাধনার জন্য পীর-মুর্শিদের আবশ্যকতা স্বীকার করে বলেছেন-

"পথ-প্রর্দশক ব্যতিত প্রেমের গলিতে পা রেখো না

যে এই পথে পথ-প্রর্দশক না পায়, সে পথহারাহয় ।"

অন্যত্র তিনি বলেন-

"পথিক তাঁর প্রদর্শনের জ্যোতিতে সখার পথে চলে;

যে পথভ্রান্তিতে চলে, সে লক্ষ্যস্থানে পৌছাতে পারে না ।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, হাফিযের গযলের বিভিন্ন স্থানে একটি প্রাসঙ্গিক কিংবদন্তি রয়েছে। অনেকেই হাফিযের জীবন-কাহিনী ও গযল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। যেমন- পীরকে হাফিয অতি উচ্চমূল্যে সম্মানের আসন ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। যদিও হাফিযের কবিতার বহু স্থানে পীরদের নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ রয়েছে। হাফিযের যিনি পীর ছিলেন ধারণা করা হয় তিনি সর্বত্যাগী কামেল এবং সত্যিকারের আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নির্জনে তপস্যা করেন হাসান বসরি (মৃত্যু-৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ), তিনিই প্রথম সুফি। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাধর শাসকদের বিরুদ্ধে সুফিরা ছিলেন বিদ্রোহী। এজন্য অনেকে জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। যেমন মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ। হাফিয এ ধরনের পীরদের অনুরক্ত ছিলেন। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৩৪) এ সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তাঁর পীর ছিলেন বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ। আবার কেউ বলেন শেখ মাহ্মুদ আত্তার ছিলেন তার ধর্ম-গুরু। কারোমতে বিখ্যাত দরবেশ আশরাফ জহাঁগির(মৃত্যু-৭৯৮ হিজরী) শিরাযে হাফিযের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাফিয উবায়সিয়া সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে তিনি শেখ মাহ্মুদ আত্তারের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর যখন বোখারা নিবাসী হযরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ হজ্জে যাওয়ার জন্য শিরাযে উপস্থিত হন, তখন হাফিয তাঁর নিকট দীক্ষিত হন। শহীদুল্লাহ্র কিছু উদ্ধৃতিতে (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)হাফিযের গযলে তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া যায়-

"নক্শী পাত্রের আয়নায় দেখ অদৃশ্যরূপ সব ভুবন

কারো মনে হয়না কখন এমন ব্যাপার আর স্মরণ ।"

দু'বছর সাধনার পর তিনি অপূর্ব কবিত্ব শক্তি লাভ করেন । তিনি বলেন-

"আমি চল্লিশ বছর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি

অবশেষে আমার ব্যবস্থাপনা দু'বছরের শরাবের হাতে ছিলো ।"

তখন থেকে হাফিয অপূর্ব সব গযল রচনা করতে শুরু করলেন। যেমন তিনি বলেছেন-

"গুলের কৃপায় বুলবুলি তার শিখেছে সব বুলি

স্বভাবে সে পায়নি ঠোঁটে গান ও গযলগুলি ।"

তিনি যে একজন আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন, তাঁর কবিতার বহু স্থানে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে এমন একটি গযল তুলে ধরা হলো-

در خرابات مـغان نور خدا می‌بینـم
این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانـه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم
خواهـم از زلف بتان نافه گشایی کردن
فـکر دور است همانا که خطا می‌بینم
سوز دل اشک روان آه سحر ناله شـب
این همـه از نظر لطف شما می‌بینـم
هر دم از روی تو نقـشی زندم راه خیال
با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم
کس ندیده‌ست ز مشک ختن و نـافه چین
آن چه من هر سحر از باد صبا می‌بینـم
دوسـتان عیب نظربازی حافظ مکـنید
کـه مـن او را ز محبان شما می‌بینم

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৮৫, তদেব, পৃ: ১৭৩)

অনুবাদ: In the tavern of the Magi I see the bright light of Divine

O what a light, such a delight, how can it so brightly shine?

Stop showing off to me, O pilgrim of the House of God

In that place you see the house, while I see God's grand design.

Secrets of the divine, for myself I wish to define

This is a mindless design, myself I further misalign.

Painful heart, tearful eyes, sigh of the morn, cry of the night

These are the lot of mine, and are favors that Thou assign.

Each moment my fantasies, my phantasm of Thee refine

How could I share my visions? With whom open this heart of mine?

Fragrance of oriental perfumes do not begin to approach

That aromatic breeze, that life-giving morning sign.

Hafiz's poetic and playful words do not malign

Because I consider him an ardent lover of Thine.(Ghazal 357 :www.hafizonlove.com)

এ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'ক'রো না শোক' শিরোনামে হাফিযের একটি গযল অনুবাদ করেছেন। যেমন:

"হারান রতন য়ূসুফ আবার আসিবে কানান, ক'রোনা শোক।

শোকের কুটীর হবে একদিন ফুলের বাগান, ক'রোনা শোক।

শোকাকুল হিয়া খুশীতে আবার উঠিবে ভরিয়া, ভেবো না মনে,

চিন্তিত শির শান্তি-ভূষণে হ'বে শোভমান, ক'রোনা শোক।

চলিতেছে কাল,যদি দিন দুই মোর অনুকূল চলেনি কো সে,

কালের চক্র কভু রহে নাই, রবে না সমান, ক'রোনা শোক।

আয়ু-বসন্ত যদিআসে পুনঃ জগতের এই কুঞ্জবনে,

ফুল-ছাতা শিরে, হে গায়ক পাখী! গাবে কলগান, ক'রোনা শোক।

হ'য়োনা নিরাশ, ভবিষ্য-জ্ঞান নাইকো তোমার কিছুই যবে,

পর্দ্দার মাঝে কেবা জানে আছে বাজি কতখান, ক'রোনা শোক।

জগতে যে জন সদা হয়রান্ দুখহারী কোন পায়নি কভু,

পাবে অবশেষ দুখহারী এক, কর অবধান, ক'রোনা শোক।

প্রান্তরে যদি মক্কার আশে রাখিবে চরণ, পথিক! তুমি,

পদে পদে যদি বাবলার কাঁটা করে বাধা দান, ক'রোনা শোক।

পরাণ-বঁধুর বিরহে যে দশা আন প্রেমিকের যে গঞ্জনা,

সকলি জানেন দুর্দ্দশাহারী সে মেহেরবান, ক'রোনা শোক।

যদি গো হৃদয়!বিনাশের বানে জীবনের ভিত উপাড়ে তব,

যখন তোমার নূহ কান্ডারী, হউক তুফান, ক'রোনা শোক।

যদিও পন্থা সঙ্কটে ভরা, যদিও লক্ষ্য বহুত দূর,

নাহি সে পন্থা একদিন যার নাহি অবসান, ক'রোনা শোক।

ফকীরি কোণায় আঁধার নিশীথে নির্জ্জনে বসি, হাফিয ওগো!

যাবৎ তোমার প্রার্থনা আর পঠন কোরান, ক'রোনা শোক।"(শহীদুল্লাহ্[৪৮] :তদেব, পৃ: ৪২)

অন্য আরেকটি গযলে হাফিয বলেন-

মৎকৃত অনুবাদ:গতকাল আমাদের পীর মসজিদ থেকে শুঁড়িখানার দিকে আসলেন ।

হে তরিকতের বন্ধুগণ, এরপর আমাদের কি করণীয় হবে?

আমরা মুরিদরা এরপর কি আর কা'বার দিকে অগ্রসর হতে পারবো না?

যখন আমাদের পীর সেই শরাব বিক্রেতার শুঁড়িখানার দিকে যাত্রা করছে ।

শুঁড়িখানায় আমরা আমাদের তরিকতের গুরুর সাথে একত্রিত হলাম

কেননা আমাদের ভাগ্য সৃষ্টির ঊষালগ্নে এ রূপই করা হয়েছে ।

বিবেক যদি জানত যে, হৃদয়টা তার কেশের বেণুনীতে বন্দী হওয়াটা কি আনন্দদায়ক,

তবে বুদ্ধিমানেরা আমাদের পায়ের শিকলের তরে উন্মাদ হয়ে যেত ।

তোমার পাষাণ হৃদয়ে কি কোনো একটা গোলযোগপূর্ণ রাতের প্রভাব পড়েছে,

আমাদের রাতজাগা দগ্ধীভূত হৃদয়ের জ্বালাময় বিলাপ বৈ আর কি ।

তোমার এই সুন্দর মুখশ্রী দয়া করে আমাদের মাঝে সৌন্দর্যের যে প্রকাশন ঘটিয়েছে

সেই থেকে তোমার দয়া আর সৌন্দর্য ছাড়া আমাদের ব্যাখ্যা করার কিছুই নেই ।

আমাদের দুঃখের তীর আকাশকে ভেদ করে চলেছে, হে হাফিয তুমি শান্ত হও,

নিজ আত্মার উপর তুমি দয়া করো এবং আমাদের তীর থেকে সাবধান থাকো ।"(শিরাযি[৫২] : গযল নং ১১, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ৬)

হাফিযের ব্যক্তিগত জীবনে শাখ-ই-নাবাত

হাফিযের কাব্যচর্চা ও শাখ-ই-নাবাত নিয়ে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তার একটি হচ্ছে এরকম-

শিরায থেকে চার মাইল দূরে বাবাকুহি পর্বতে'পীর-ই-সাব্জ' নামে একটি জায়গা আছে । সে সময় প্রচলিত প্রবাদ ছিলো, যদি কেউ'পীর-ই-সাব্জ' উপত্যকায় চল্লিশ রাত নিদ্রাহীন কাটাতে পারে তবে সে একজন মহান কবি হতে পারবে । হাফিয তাঁর যৌবনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি 'পীর-ই-সাব্জ' উপত্যকায় নিদ্রাহীন চল্লিশ রাত কাটাবেন । সে সময় হাফিয শাখ-ই-নাবাত নামক এক যুবতীকে ভালবাসতেন । প্রতিদিন সকালে পর্বত-উপত্যকায় যাবার পথে এই রমণীর বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি যেতেন । তিনি দুপুর বেলা বিশ্রাম করতেন এবংরাতে তন্ময়তায় জেগে থাকতেন । এভাবে ঊনচল্লিশ রাত পার হয় । চল্লিশতম দিন সকালে হাফিয যখন শাখ-ই-নাবাতের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রমণী তাকে ইশারায় তাঁর ঘরে আমন্ত্রণ জানায় । হাফিযকে দেখে পরম উচ্ছ্বাসে সেতাঁর প্রেম নিবেদন করে এবং তাঁর সাথে রাত যাপন করতেঅনুরোধ জানায় । কিন্তু হাফিয আপন সংকল্পে অটল থেকে রমণীর আকর্ষণ ছিন্ন করে উপত্যকায় রাত যাপন করতে চলে যান । পরদিন সকালে হাফিযউপত্যকায় সবুজ পোষাকে আচ্ছাদিত এক

বৃদ্ধকে দেখতে পান। বৃদ্ধ হাফিযকে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য একটি পানীয় পান করতে দিলেন। বলা হয়ে থাকে, এই পানীয় পান করেই হাফিয অনন্ত জীবন লাভ করেছেন এবং চির অম্লান হয়ে আছেন। (খান[১৫] :তদেব, পৃ: ২৯)

হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান গ্রন্থে (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৩৫)বলা হয়েছে যে, কথিত আছে যে জীবনের প্রথম পর্যায়ে হাফিয ধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন ছিলেন; লোক দেখানো ধর্ম পালন করতে চাইতেন না। পিতার মৃত্যুর পর যখন দারিদ্রে পতিত হন, তখন পাওনাদারদের তাড়ায় এখানে-সেখানে ছুটে বেড়াতে থাকেন। এমনই একদিন একদল পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন সম্ভ্রান্ত আমিরের বাড়িতে দেয়াল টপকে বাগানে লুকোতে গেলেন। লোকজন তাঁকে খুজে পেলো না। কারণ বাগানে একজন সুন্দরী রমণী তাঁর বান্ধবীদের সাথে আনন্দ করছিলো। সুদর্শন হাফিযকে দেখতে পেয়ে তারা তাদের ওড়না দিয়ে তাঁকে আড়াল করে ফেলেছিলো। লোকজন হতাশ হয়ে চলে গেলো। সেই যুবতীকে দেখে হাফিয যেন সারা বিশ্বকে পেয়ে গেলেন। রমণীও পেলো নতুন জীবনের সন্ধান। আসলে এই রমণী ছিলো সেই আমিরের কনিষ্ঠা স্ত্রী। সে হাফিযকে নিয়ে নিজ কক্ষে গেলো আর একে অন্যকে দেখে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়লো। এ সময় হাফিয উচ্চারণ করলেন-

الایا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

ببوی نافهی کاخر صبا زانطرة بگشاید

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

مرا در منزل جانان چه جایی عیش چون هردم

جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها

(শিরাযি[৫২] : গযল নং ১, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ১)

মৎকৃত অনুবাদ: "ওগো সাকি, পেয়ালা ভরা শরাব নিয়ে তুমি ঘুরে ঘুরে সবার নিকট শরাব বিতরণ করো

প্রথমে প্রেমটা অনেক সহজ মনে হয়েছিলো, কিন্তু পরে তার ভীষন যন্ত্রণা

প্রেয়সীর সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুলের বেণী থেকে মেশ্‌কের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে, যা বসন্তের বাতাসের মতো

আর এ থেকে কত প্রেমিকের অন্তর-আত্মাই না বিরহ যাতনায় রক্তস্নাত হয়েছে।"

ক্রমশঃ রমণী তাঁর পরিচয় জানতে পারলেন। তাঁর দুর্দশার কথা শুনে ধার-দেনা সব পরিশোধ করে দিলেন। সে হাফিযকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রসিদ্ধআলেমের নিকট পাঠালেন। কিন্তু হাফিয তো নিজেই একজন অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। প্রতিদিন হাফিয তাঁকে সুর করে নতুন নতুন গযল শোনান। হাফিয তাঁর নাম দেন 'শাখ-ই-নাবাত' বা মধুর শাখা-প্রশাখা। তাঁদের গোপন প্রেম যখন তুঙ্গে তখন দেশে অরাজকতা দেখা দিলো। সালযুক সালতানাত ভেঙ্গে পড়লো। কোনো সুলতানই শক্ত হয়ে সিংহাসনে বসতে পারছিলেননা। সকালে একজন সুলতান, তাঁকে হত্যা করে বিকেলে আরেকজন সুলতান হন। এমনি হানাহানি আর নৈরাজ্য বিরাজ করছিলো সারাদেশে। এমন সময় শাখ-ই-নাবাতের স্বামী আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। তাঁর ঘর থেকে সমস্ত মালামাল লুট হয়ে গেলো। হাফিয এসে দেখলেন ঘর শূন্য। শাখ-ইনাবাতকে হারিয়ে হাফিয পাগল হয়ে গেলেন। পথে প্রান্তরে প্রতিটি ঘরে তাকে খুঁজতে লাগলেন। লোকজন তাঁকে পাগল বলতে লাগলো। খবর পেয়ে হাফিযের মা তাঁকে এক ওলি আল্লাহ্‌র দরগা শরীফে নিয়ে গেলেন। সেখানে হাফিয হু হু করে কাঁদতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর পাগলামী বন্ধ হলো না। আবারো রাস্তায় নেমে কেবল শাখ-ই-নাবাত জিকির

করতে লাগলেন। একজনদয়ার্দ্র হয়ে তাঁকে বললেন-'যদি তুমি ওমুক পীরে মুগানের কাছে যাও তোমার সমস্যার সমাধান হবে'। হাফিয পীরদের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেননা। তবে তিনিদেখলেন অনেকেই তাঁকে একই কথা বলছেন। অবশেষে তিনি সেই 'পীরে মুগান' এর দরবারে হাজির হলেন। পীরের চারপাশে অনেক মুরিদ ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন। সবাই চোখ বন্ধ করে আছেন। তাই হাফিয যে দরবারে প্রবেশ করেছেন, সেটা কেউ বুঝতে পারেন নি। কিন্তু পীর সাহেব বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ অবস্থাতেইবললেন-'বেশ্যালয়ে প্রবেশ করো'। এ কথা শুনে হাফিয বিরক্তবোধ করলেন। যেহেতু পীরদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভালো ছিলোনা, তাই হাফিযের কাছে সব ভন্ডামি মনে হলো। তিনি আবার পাগলামি শুরু করে দিলেন। আবার কয়েকজন তাঁকে সেই পীরের দরবারে গিয়ে মনের কথা খুলে বলতেউপদেশ দিলেন। হাফিয কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তারপরেও একজন তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে পীরের দরবারের দিকে রওনা করলেন। তারা দুজন তখনোও পীরের আস্তানায় পৌঁছাননি, দেয়ালের আড়ালে ছিলেন, গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন- 'এখনই বেশ্যালয়ে যাও'। হাফিয বুঝতে পারলেন এই কণ্ঠস্বরটা পীরের।হাফিয ঘটনাটা বোঝার জন্য সত্যিই বেশ্যালয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁর শাখ-ই-নাবাতকে বন্দী অবস্থায় কান্নারত দেখতে পেলেন। পরে হাফিয তাকে সেখান থেকে মুক্ত করেন। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৩৬-৩৮)

হাফিযের অনেক কবিতায় জায়নামাযকে শরাব দ্বারা রঙিন করে নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এই কবিতাগুলোতে মূলত পীর-মুর্শিদের অনুসরণের কথাই বলা হয়েছে। জায়নামাযে শরাব প্রবাহিত করা- এ কথা শুনলে সাধারণ মানুষের মনেআতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু অধ্যাত্মবাদে এর ব্যাখ্যা ভিন্ন। শুকনো জায়নামাযে কপাল ঠেকানো, খোদার প্রতি আসক্তিহীন উপাসনা, এর কোনো গৌরব নেই। এটা হলো শুধু অভ্যাস। প্রেমাসক্ত আরাধনাই আল্লাহ্পাক গ্রহণ করেন, এটিই হলো সুফি ধারণা। প্রিয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার যে রোম্যান্টিক চেতনা তা প্রাচীনকাল থেকেই আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। যেমন বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথম জীবনে মেহেরুন্নিসা বা নুরজাহানকে প্রিয়তমা করার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তুবাদশাহ আকবর তাতে রাজী ছিলেননা। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র মেহেরুন্নিসার স্বামীকে হত্যা করিয়ে তাঁকে হেরেমে নিয়ে আসেন। পরে মেহেরুন্নিসা নুরজাহান হয়ে শুধু বাদশাহ নয়, সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্য পেয়ে গেলেন।এ রকম আরেকটা ঘটনা হলো,(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৩৯)মাত্র আট ঘন্টার জন্য ইংল্যান্ডের রাজা হয়েছিলেন ষষ্ঠ এডওয়ার্ড। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের মুহূর্তে তাকে শর্ত দেয়া হলো প্রেমিকা নর্তকী জাত-কুলহীন মিস সিমসনকে ত্যাগ করতে হবে। এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের সিংহাসনকেন, দুনিয়ার বিনিময়েও তাঁর প্রেমিকাকেছাড়তে রাজী ছিলেন না। ফলে প্রেমিকাসহ প্যারিসে নির্বাসিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে মারা যান। কিন্তু হাফিযের প্রেমের ব্যাখ্যা অন্যরকম।

'শাখ-ই-নাবাত' আসলে ছিলেন হাফিযের স্ত্রী। কিন্তু অনেকের ধারণা 'শাখ-ই-নাবাত' হচ্ছে কবির কাব্যলক্ষ্মী, যার প্রেরণাতে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দুটো ধারণাই সত্য। হাফিয শাখ-ই-নাবাতের প্রেমে পড়েন এবং পরে তাঁকে বিয়ে করেন। কেউ কেউ বলেন,তাঁর স্ত্রীর নাম প্রথম থেকে শাখ-ই-নাবাত ছিলো না, এইনামটা আসলে হাফিযেরই দেওয়া। যার অর্থ হলো 'মিছরির

শাখা' বা 'ইক্ষু শাখা' যা পূর্বে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে অনেকে উপমা হিসেবে এ শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন প্রিয়তমা স্ত্রী হিসেবে। (খান[১৫] : ২০১১, পৃ: ২৯)এই শাখ-ই নাবাতকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি বা নানা কিংবদন্তির উৎস রয়েছে। ঐতিহাসিকরা সেসব কিংবদন্তি সম্পর্কে নীরব। এমনকি মাওলানা শিবলি নোমানীও কেবল কবির স্ত্রী শাখ-ই-নাবাত তাঁর কাব্যও সামা রচনাকালে কবিকে সহায়তা ও সঙ্গ দিয়েছেন, বলেছেন। হাফিয শাখ-ইনাবাতের সাথে কিভাবে প্রেমে পড়লেন এবং শাখ-ই নাবাত নামকরণের উৎস সর্ম্পকে শামসুল আলম সাঈদ রচিত *হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান* গ্রন্থে (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৮৮-৯১) উল্লেখিত আরো একটি কিংবদন্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে,বাবাকুহি উপত্যকায় হাফিযের পীর ইমাম আলি একটি নির্জন কক্ষে তাঁকে ডেকে নিয়ে একটি ফল খেতে দিয়েছিলেন, তাতেই হাফিযের কবিত্ব শক্তি উন্মোচিত হয়েছিলো। তেমনি পীর তাঁকে এই শাখ-ই নাবাত অন্য আরেকদিন দান করেন। হয়তো সে ছিলো পীর কন্যা বা পীরের মোজেজা থেকে উৎপন্ন কন্যা। যেমন এ সর্ম্পকে হাফিয বলেন-

"পরীর দেশ থেকে আগত আমার ঘরে প্রিয়তমা, আপাদমস্তক পরী সে

পরীর মতোন স্নেহে ও প্রেমে আমাকে বেঁধে রেখেছে।"

তবে নিম্নোক্ত ঘটনাটা স্বপ্নে হয়েছে না বাস্তবে, তা কোনোও গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নি-

যাই হোক পীরের সাথে দেখা করার জন্য হাফিয যে বাবাকুহি উপত্যকায় যেতেন, সে রাস্তাটা ছিলো একটা দুর্গম পথ। প্রেমিক ব্যতীত এ পথে যাওয়া অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। হাফিয একবারএই সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করার জন্য পাথরের দেয়াল বেয়ে উঠছিলেন। সেই পথে একটি ঝরনা ছিলো। সবার ধারণা, সেই ঝরনার পানি পান করলে সারা জীবনের তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। তাছাড়া সেই সুগন্ধিযুক্ত পানি পান করলে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর যদি সেই পানিটা গোলাপ ফুলের সুগন্ধিযুক্ত হয়, তবে প্রিয়তমাকে লাভ করা যায়। হাফিয জানতেন না যে ঝরনাটা কোথায় রয়েছে; তিনি শুধু পাথরের দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগলেন। আসলে প্রকৃত দিশারী যিনি তিনিই কেবল দেখতে পারেন; তাই হাফিযও দেখতে পেলেন তাঁর ঠিক বিপরীত দিকে ঝরনাটা রয়েছে। কিন্তু ওখানে যাওয়া আরোও বিপজ্জনক, কারণ তার নিচে রয়েছে অন্ধকার খাদ। তিনি বহু কষ্টে পাথর বেয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছালেন। হাফিয ঝরনার পানি পান করলেন কিন্তু সেই পানিটা ছিল গোলাপফুলের সুগন্ধিযুক্ত। প্রকৃত প্রেমের অনুভূতিতে তার হৃদয়টা ভরে গেল। হঠাৎ দেখলেন তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঠিক মাথার উপর স্নিগ্ধ আলোমাখা একটি উজ্জ্বল শুভ্র গোলাপ ঝরনার পানিতে ঝুলছে, কিসে যেন আটকে আছে, নীচে পড়ছেনা। তিনি অনেকবার চেষ্টা করেও গোলাপটি ধরতে পারলেন না। কারণ পাথরগুলো ছিলো ভয়ানক পিচ্ছিল। না পাওয়ার বেদনা থেকে হাফিয একটা গযল গাইলেন, যা তিনি নিজেও বুঝতে পারলেননা-

"হে খোদা, এই তাজা ও সুগন্ধিযুক্ত গোলাপটি যা তুমি আমার জন্য অবিশ্বাস্য করেছ, আমি এখন তোমাকে অবিশ্বাস্য করছি আমার ঈর্ষান্বিত চোখে এফুলের অদৃশ্য বাগানে।"

হাফিযের এ গযল পাহাড়ের নির্জনতা ভেঙ্গে যেন খোদার কাছে পৌঁছে গেল। সাথে সাথে গোলাপটা হাফিযের বুকে এসে পড়লো, আর তিনি সেটা ধরে ফেললেন। এমন অপূর্ব সুন্দর তরতাজা শুভ্র ফুলটি নিয়েতিনি অবশেষে হযরত আলির হাতে দিলেন এবং বললেন তিনি ওমুক ঝরনার পাশ থেকে ফুলটি তাঁরজন্য এনেছেন। ইমাম আলি হেসে বললেন-'হাফিয,তুমি ভুল করছো, এটা ফুল নয়, এর ভিতর পরী রানীর কন্যা লুকিয়ে আছে। কোনো একসময় তোমার গযলের সুর পরীরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিলো। পরীরাজকন্যাসহ সেখানকার সব পরী তোমার গযল শুনে মাতাল হয়ে গিয়েছিলো । শুধু পরীরা নয়, সেখানকার বাগানের সব ফুল বাগান থেকে বাতাসে উড়ছিল; সেগুলোর মধ্য থেকে একটি তরতাজা গোলাপ ফুল পরীরাজকন্যা ধরে ফেলতেই ফুলের ভেতর সে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলো,আর প্রেমের সুবাস ছড়াতে লাগলো। অবশেষে ফুলটি উড়তে উড়তে সেই ঝরনার ওপর এসে পড়লো;

কিন্তু আর ভেসে যেতে পারলোনা। তুমি তাকে সেখান থেকেই নিয়ে এসেছো, সুতরাং ফুলটির দাবিদার একমাত্র তুমিই।'ইমাম আলি তখন ফুলটি হাফিযের হাতে ফিরিয়ে দিলেন এবং একটি ফুঁ দিয়ে তাঁকে অসাধারণ সুন্দরী কন্যায় পরিণত করলেন। পরে বললেন-'এ ফুলটির আসল নাম হচ্ছে নাবাত, যেহেতু ফুলটির শাখা হিসেবে কন্যাটি ছিলো, তাই এর নাম দিলাম শাখ-ই-নাবাত। তুমি খোদার উপর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলে,কখনোকোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস হারিয়োনা। কারণ তিনি এই পরীকন্যার বর হিসেবে তোমাকে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন ।' এরপর তিনি হাফিযের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। (সাঈদ[৫৬] : পৃ: ৮৮-৯১)

এই শাখ-ই-নাবাত যেমন ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী ও প্রিয়তমা স্ত্রী তেমনি তিনি মৃত্যবরণ করে হাফিযকে বিশাল শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। হাফিযের লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর বিয়োগব্যাথাসহ আরোও দু'পুত্রের মৃত্যুর জ্বালা-যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন। শাখ-ই-নাবাতের মৃত্যুর পর হয়তো তার কণ্ঠই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। হাফিয শাখ-ই নাবাতের প্রশংসায় অনেক

কবিতা লিখেছেন। যেমন শামসুল আলম সাঈদ অনূদিত (সাঈদ[৫৬] : গযল নং- ১৭, তদেব, পৃ: ১৫০) একটি গযলে (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৯, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ২০)হাফিয বলেন:

আমার বাগানে সরু ঝাউ আর দেওদার কী প্রয়োজন?

প্রিয়তমার ছায়াই উৎকৃষ্ট অন্য কিছু দৃষ্ট এমন ॥

তন্বী প্রিয়া সন্নিকটে স্বভাব আবিষ্ট গোলাপে।

হৃদয় রক্ত আমার ফোটে হালাল মাতৃস্তন্য রূপে ॥

কতদিন পরে দুঃখ ধরে প্রেম পান করে বেড়েছি।

এখন সেয়ানা দেহে ও মনে প্রতিষেধক তা পেয়েছি ॥

আসল প্রেমের কেচ্ছা এর চাইতেও কী রোমাঞ্চ?

যার কাছে যাও চিরন্তন বলে বলি এটাই বরঞ্চ ॥

পীর মাগানির আস্তানায় ফের কেন বা মাথা ঠোকা।

তুমিই আমার সেই সম্পদ হৃদয় গৃহের মৌকা ॥

ওয়াদা করেছ আছেন তো মনে আমাকে দেবে আলিঙ্গন।

কিন্তু মগজে মদ্য কাজে ছিলাম মত্ত আমি তখন ॥

আব্রুর সন্তুষ্টি অহংকারের বিরোধী ভেবোনা।

বাদশাকে বল দানাপানি কিসমতে আছে তো দেনা ॥

শিরাজের রুখনাবাদ তীর তার অনাবিল হাওয়া খেয়ে বাঁচি।

দুনিয়ার সুন্দরীর গালের তিলের রূপ দেখে দেখে আছি ॥

খিজিরের জীবন পানি অনেক অনেক ব্যবধান।

তার আঁধারআর এ নদীর ছোট ঢেউ এও আল্লাহ্ গান ॥

এখানে গলিতে হৃদয় লেনদেন হয় কত সমাবেশ।

শয়তানের কাছে আত্মবিক্রি নয় কখনও বাজারে বেশ।

হাফিজের কলম পেয়েছে এখানে শাখই নাবাত উপহার।

মিঠা ফল মধু ইক্ষুর চেয়েও সুস্বাদু দিল তার ॥

কেউ কেউ বলেন শাখ-ই-নাবাত নামের অর্থ 'চিনির টুকরো' হলেও তাঁর জীবনটা চিনির মতো মিষ্টি ছিলোনা। বিয়ের পর স্বামী হাফিয তাঁর জীবনটাকে বিষময় করে তুলেছিলেন। যৌবনে অপূর্ব সুন্দরী থাকার কারণে সে দেশের দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির দৃষ্টি আর্কষণ করেছিলেন। একজন হলেন হাফিয, অন্যজন ফারস প্রদেশের সুলতান শাহ্ শুজা। হাফিযের কবিতা পড়েই তিনি তাঁর প্রেমে পড়েগিয়েছিলেন। শাখ-ই-নাবাতের কাছে হাফিয ছিলেন স্বপ্নের পুরুষ। তারপর এক ভোজসভায় হাফিযের সাথে তাঁর দেখা হয়। সুলতানের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেন হাফিযকে। কিন্তু বিয়ের পর তিনি ব্যক্তি হাফিয ও কবি হাফিযের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারেন। স্বামীর নিষ্ঠুরতায় 'চিনি-টুকরো' নামের মেয়েটি তাঁর চোখের সামনে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ কবি তাঁকে নিয়েই রচনা করেছেন অপূর্ব প্রেমের কাব্য। তাঁকে সাজিয়েছিলেন প্রেমের প্রতিমা রূপে। আজো সেই কাব্য বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তিনি তাঁর সমসাময়িকালেও ব্যক্তি চরিত্র এবং কবিতার ভিন্নধর্মিতার জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাফিয তাঁর কালজয়ী কাব্যসম্পদ নিয়ে আজো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সগৌরবে। (সালমান[৫৭] : ২০১৩, পৃ: ২৪৭)

হাফিযের পরিবার

মহাকবি হাফিয সুফিমতে দীক্ষিত হলেও সংসার ত্যাগ করেননি। তাঁর কবিতা থেকে জানা যায়যে, তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর দু'জন পুত্র সন্তান ছিলো। তাদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। যৌবনেই তিনি তাঁর পুত্রদের হারান। ভারতবর্ষের বাহমানি ইতিহাসে কথিত আছে যে, হাফিযের এক পুত্র হিন্দুস্তান তথা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আর স্বদেশে ফেরেন নি। বুরহানপুরে তাঁর কবর বিদ্যমান। (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৪২)

স্ত্রীর বিরহ ও স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যে গযলগুলো রচনা করেছেন সেগুলো বড়ই নির্মম। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত একটি গযলে হাফিয তাঁর স্ত্রীর বিরহে লিখেছেন-

"চল্লুম আমি; জান তুমি, জানে দুঃখী পরাণ মোর,

নিয়ে যাবে মন্দ ভাগ্য কোথায় আহার ও পান মোর।

পাপ্ নি হ'তে ছড়িয়ে মোতি, রাজে যেমন কেশের পর,

ভর্বচরণ, জুড়াবে যে নামে তোমার দু'কান মোর।

দোয়ায় উঠাই হাত দুখানি, তুমিও সই! উঠাও হাত-

'বিশ্বাস হ'ক তোমার সাথী, খোদা মেহের- বান মোর।'

তোমার আমার পরে যতই বিশ্ববাসী করুক দ্বেষ,

দিবেই দিবে শাস্তি তাদের বিচারপতি ধীমান্ মোর।

তোমার মাথার শপথ! যতই দি'ক বাড়ি মোর মাথায় লোক,

পারবে না ক' মাথা হ'তে কর্তে বাহির ধেয়ান মোর।

আকাশ আমায় খেদিয়ে বেড়ায়, জানই তুমি, চতুর্দ্দিক্।

হিংসা যে তার কেন আমার সঙ্গ রাখে পরাণ মোর ।

কাতর আমি, খবর দেয় সে গুপ্ত ব্যথার নিশান তিন-

শুখনা মু'খান, পিয়াসী ঠোঁট, অশ্রুঝরা নয়ান মোর ।

যখন থেকে লিখছি বাখান তব মধুর আননটীর,

গোলাপ পাতা হ'লই না ক' পুঁথির পাতার সমান মোর ।

আস্‌বে কি হায়! শীঘ্র ফিরে নিরাপদে কান্তা মোর?

কি সুখ! যে দিন বাঁধব প্রিয়ার কণ্ঠে বাহু দু'খান মোর ।

পুছে যদি, 'ওরে হাফিয! গেছে প্রিয়া কোথায় তোর?'

বলিস্ কেঁদে 'বিদেশ গেছে হৃদয় ক'রে দু'খান মোর' ।"(শহীদুল্লাহ[৪৮] :তদেব, ভূমিকা)

তিনি তাঁর এক পুত্র শোকে উচ্চারণ করেন-

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندرخم اینطاق رنگین

بجای لوح سیمین در کنارش

فلک برسر نهادش لوح سنگین

(শিরাযি[৫২] : তদেব, ভূমিকা)

কবি নজরুল এই রুবাঈয়্যাতটির অনুবাদ করেন এভাবে-

"ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস-পুত্র আমার কোলে

কি পেয়েছে এই যে রঙ্গিন গগন চন্দ্রাতাপের তলে ।

সোনার তাবিজ রূপার পেলেট মানাত না বুকেযার

পাথর চাপা দিল বিধি হায়, কবরের সিথানে তার ।" (ইসলাম[৫] : ২য় খন্ড, ১৯৯৩, রুবাঈয়্যাত-ই-হাফিয এর ভূমিকা)

অপর পুত্র মারা যান ১৩৬২ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর । হাফিয তাঁর জন্যও যে শোকগাঁথা রচনা করেন তা নিম্নরূপ:

"শুক্রবার সকালবেলা রবিউল মাসের পয়লা তারিখ

যখন মুখটি তাঁর চাঁদমুখ আমার হৃদয় থেকে খসে গেলো

সে বছর সাতশত চৌষট্টি সালের স্রোতে (৭২৪ হিজরী)

এ অতীব কঠিন আঘাত জীবন্ত আমার জলের মতো

কি করে ভুলি (খোলা করি মন) দুঃখ আর শোক লাভের জন্য

এ হচ্ছে আমার জীবন আর কোনও ফলাফল ছাড়া ।" (দ্রষ্টব্য :সাঈদ[৫৬] :তদেব, পৃ: ৯৩)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত অন্য একটি গযলে হাফিয বলেন-

"বুলবুলি এক কল্‌জের খুনে ফুল এক হাসিল কর্‌লে ।

ঈর্ষার বাতাস শতেক রূপে আকুল তার দিল্ কব্‌লে ।

এক যে তোতা ছিল চিনির ধ্যানে খুশি নিত্য,

নাশের বান তার আশার নক্‌শা হঠাৎ বাতিল কর্‌লে ।

আহারে! চাঁদ তার উপরে কি কু-নজর ফেল্‌লে,

ধনুক-ভুরু চাঁদ সে আমার গোরে মঞ্জিল কর্‌লে ।

চোখের পুতুল দিলের মেওয়া আসে স্মরণ মোর সে,

সে ত গেল আসান ভাবেই, মোরে মুশ্‌কিল কর্‌লে ।" (শহীদুল্লাহ[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

হাফিযের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

হাফিযের সময়ের কিছু পূর্বে ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজার আধিপত্য ছিলো । তাঁরা প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন । কোথাও শান্তি ছিলোনা । এ সময় হালাকু খানের প্রপৌত্র গাযান (১২৯৫-১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ) পারস্যের অধিপতি হন । আমির মুযাফ্‌ফর তাঁর অনুগত কর্মচারী ছিলেন । ৭০৫ হিজরী সনে (১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দ) গাযানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই উলজাইতু সুলতান হন । তিনি আমির মুযাফ্‌ফরকে হেরাত ও মার্ভের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেমুবারিযুদ্দিন মুহাম্মদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন । ক্রমে তিনি ইয়াযদের শাসক হন । উলজাইতুর মৃত্যুর পর আবু সাঈদ বাহাদুর খান

(১৩১৭- ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন । মুবারিযুদ্দিন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন । সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর দেশেরনানা স্থানের শাসনকর্তাগণবিদ্রোহী হয়ে ওঠেন । ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই হালাকু বংশের অবসান হয় । নিম্নে হাফিয ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন সুলতান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

হাফিয ও শায়খ আবু ইসহাক ইন্‌জু

হাফিযের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিরাযের শাসনকর্তা শায়খ আবু ইসহাক ইন্‌জু। হাফিয বেশ কিছু গযলে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। আবু ইসহাকও একজন কবি ছিলেন এবং একজন কবির যেসব গুণাবলী থাকা দরকার, সবই তাঁর মাঝে ছিলো। তিনি গান ভালোবাসতেন। রাজকার্যের প্রতি তার আসক্তি ছিলোনা। এক রাতের আনন্দের জন্য সমগ্র রাজ্য বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেননা। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাত্র কয়েক বছরের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এর মাঝে দু'বার মুবারিযুদ্দিন কর্তৃক আক্রান্ত হন। শেষ পর্যন্ত১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে মুবারিযুদ্দিন ইরান ও শিরায দখল করেন এবং আবু ইসহাক যুদ্ধে নিহত হন। আবু ইসহাক এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যখন মুবারিযুদ্দিন শিরায আক্রমণ করেন তখন অনুচর পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সঙ্গীত শোনার প্রস্তাব দেন। একবার ধূর্ত মুবারিযুদ্দিন ছদ্মবেশে আবু ইসহাকের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎও করেছিলেন; সে সময় হাফিযও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৬৬)ব্রাউনের উদ্ধৃতিতে হাফিয তাদের জন্য যে পংক্তিটি লিখেছিলেন, ব্রাউনের উদ্ধৃতিতে তা নিম্নরূপ:

بیا تا یک امشب تماشا کنیم

چو فردا شود کار فردا کنیم

"Come,let us make merry just for this one night,

And let us deal tomorrow with tomorrow's business." (দ্রষ্টব্য : ব্রাউন[৭৯] : ৩য় খন্ড, ১৯২৯, পৃ: ২৭৫)

মৎকৃত অনুবাদ: এসো, আজ রাতে আমরা একটু আনন্দ করি,

আগামী কালের কাজটা আমরা আগামীকালই করব।

তবে ব্রাউনের ধারণা এ কবিতা আবু ইসহাকের রচনা। তাঁর মৃত্যু কবিকে শোকগ্রস্থ করেছিলো। হাফিয বলেন-

راستی خاتم فیروزه ی بو اسحاقی

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

"In truth the turquoise ring of Abu Ishaq

Flashed finely, but it was a transitory prosperity." (ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৫)

শায়খ আবু ইসহাক বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁর সভায় অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাজি আযদুদ্দিন আব্দুর রহমান, শায়খ মজদুদ্দিন, শায়খ আমিনুদ্দিন, হাজি কিওয়ামুদ্দিন হাসান (যাঁর কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এবং খাজা ইমাদুদ্দিন মাহমুদ প্রধান ছিলেন। তাঁরা সবাই হাফিযের উৎসাহদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হাফিয তাঁর বহু কবিতায় এঁদের প্রশংসা

করেছেন। (শহীদুল্লাহ[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) যেমন ব্রাউনের (ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৬)উদ্ধৃতিতে একটি গযলে হাফিয বলেন-

During the period of Shah Shaykh Abu Ishaq's rule

The kingdom of Fars throve wondrously through five persons.

First, a king like him, a giver of governments,

Who, thou would'st say, snatched preeminence by justice, bounty and equity.

Secondly, that Remnant of the *Abdal*, Shaykh Aminu'd-Din,

Who was numbered amongst the 'Poles' and was the meeting-place of the Awtad.

Thirdly, one like that just judge Asflu'l-Millat wa'd-Din,

Than whom Heaven remembers no better judge.

Again one like that accomplished judge *Adud[u'd-Din al-fjt]*

Who dedicated his explanation of the *Mawaqif* to the King.

Again one so generous as Hajji Qiwam, whose heart is as the Ocean,

Who, like Hatim, invited all men to partake of his bounty.

These departed, leaving none like unto themselves:

May God most Great and Glorious forgive them all!

অনুবাদ: শাহ্ শেখ আবু ইসহাকের অপূর্ব শাসনকালে

ফারেস সাম্রাজ্য অভাবিত সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল পাঁচ ব্যক্তির কারণে

প্রথমে, তাঁকে একজন মহারাজতুল্য বলতে পারি তিনি এ সরকার গড়েছেন

তাই বলা উচিত সর্বোত্তম বিজ্ঞ নিরপেক্ষ দক্ষ জন সে বিচারে,

দ্বিতীয়, আবদালের বিচ্ছুরিত জ্যোতির অংশ দেখ আমিনুদ্দিন

যিনি আকতারের সীমানায় অবস্থিত আওতাধীনদের মিলনস্থানস্বরূপ ।

তৃতীয়, আশিলুল মিল্লাত যাদীনের বিচারকদের মতো

বেহেশতে তার চাইতে যথার্থ বিচার দেখা যাবেনা ।

আবার সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিচারপতি অদুদ

যিনি মাওয়াকিফের ব্যাখ্যার জন্য সুলতানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ।

তারপর আছেন হাজী কাইয়ুম এতবড় দানশীল যার হৃদয় সমুদ্রের মতো

যিনি প্রকৃত হাতিম তায়ী সবাইকে তাঁর দানসত্রে দাওয়াত দেন ।

এঁরা সবাই এখনবেহেশতে,কিন্তু তাদের মতো কাউকে এখানে রেখে যাননি

এহান আল্লাহ পরম করুণাময় তাদের আত্মার মাগফেরাত করুন ।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৬)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত 'স্মরণে' শিরোনামে আবু ইসহাকের প্রশস্তিতে অন্য আরেকটি গযল হলো-

স্মরণ করি যখন তোমার গলিতে মোর ছিল আগার,

তোমার দোরের ধূলায় ছিল চোখের জ্যোতি নিতি আমার ।

তোমার আমার সঙ্গ ছিল'সুসন' এবং গোলাপ মত,

আমার জিবে তাই বেরুত, যেটি তোমার মনে হ'ত ।

বুদ্ধি-বুড়ার কাছে যখন মর্ম্মকথা খুঁজ্ত হিয়া,

বুদ্ধি যেথা হার মানিত, প্রেম যোগাত ব্যাখ্যা নিয়া ।

সংসারেরি জোর জুলুমে সদাই করে মন হাহাকার,

হায় আফসোস! কি সুখ শান্তি সেই নিবাসে ছিল আমার ।

মনে ছিল বঁধু ছাড়া রবই নাকো একটি পল,

কি কব হায়! মোর ও মনের চেষ্টা যত হ'ল বিফল ।

কাল সখাদের স্মরণ মোরে নিয়ে গেল মদ্যশালা,

দেখ্লেম সেথা হৃদে রক্ত কাদায় পা এক মদের জালা ।

বিচ্ছেদেরি ব্যথার কারণ জিজ্ঞাসিয়ে হ'লেম সারা,

জবাব দিতে আক্কেল মিঞা একেবারে আক্কেল-হারা ।

ফিরোযা-রঙ রাজ-মুদ্রাটি বু-ইস্হাকের চমকালে বেশ,

দুদিন পরেরইল না হায়!সম্পদের তার একটুকু লেশ ।

দেখেছ হে হাফিয!সুধীর তিতির পাখীর উচ্চহাসি,

কাল শ্যেনেরি থাবার নীচে ছিল কেমন সে উদাসী!(শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, পৃ: ৪০)

আবু ইসহাকের মন্ত্রী ছিলেন হাজি কিওয়ামুদ্দিন হাসান । যার কথা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে । হাফিয তাঁর গযলের বহু স্থানে তাঁর প্রশংসা করেছেন । যেমন একটি গযলে তিনি বলেন-

دریای اخضر و کشتی هلاک

هستند عرق نعمت حاجی قوام ما

حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان

باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৪, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ৩)

"The sea of the skies and the gondola of the moon

With the grace of the Master, radiantly shine.

Hafiz, let a tear drop or two leave your eyes,

May we ensnare the Bird of Union, divine."(Ghazal 11: www.hafizonlove.com)

হাফিয ও সুলতান মুবারিযুদ্দিন মুহাম্মদ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ৭৪৫ হিজরী/ ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মুজাফ্ফরি রাজবংশের সুলতান মুবারিযুদ্দিন মুহাম্মদ ইরান অঞ্চল দখল করে শিরায নগরীও অধিকার করে নেন। ফলে শিরাযের জনগণকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং হাফিয নিজেও অনেকদিন উক্ত পরিবর্তিত অবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। মুবারিযুদ্দিন একজন স্বৈরাচারী কঠোর শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান কঠোর ভাবে মেনে চলার জন্য লোকদের প্রতি আদেশ জারি করেন। কবি হাফিযও তাঁর কঠোর আদেশের শিকার হয়েছিলেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃ: ২০১)

মুবারিযুদ্দিন সিংহাসন দখল করার সাথে সাথে রাজ্যে কবিতা ও মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঠিক বাদশাহ আওরঙ্গজেবও তাই করেছিলেন। একইভাবে হাফিযের কবিতা হিন্দুস্তানে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। হাফিয হানাহানি, রক্তপাত আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নৃশংসতা দেখে ঠিক করলেন লোকালয় ছেড়ে একেবারে বৈরাগ্য জীবনে প্রবেশ করবেন। তিনি আরোও প্রতিজ্ঞা করলেন, এরপরে আর কোনো ক্ষমতাধর শাসককে নিয়ে কাসিদা লিখবেন না; তাঁরা যদি হাফিযকে আগ্রহ করে আহ্বানও করেন, তিনি তাদের নাগালের বাইরে থাকবেন। কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব ছিলো না, হাফিযের কবিতা তখন মানুষের অন্তরে পৌঁছে গেছে। মুবারিযুদ্দিন নিজেও যেহেতু ফারসি ভাষায় কথা বলতেন, তিনিও হাফিযের দু-একটি কবিতা পড়লেন। হঠাৎ তাঁর শখ হলো তিনি হাফিযের সাথে কবিতা লিখবেন এবং হাফিযকে তাঁর দরবারে এনে রাজদরবার অলংকৃত করবেন। তিনি হাফিযকে পত্রের মাধ্যমে তাঁর দরবারে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। হাফিয খবর পেয়ে মৃদু হেসে পত্রবাহককে বললেন যে, তাঁর হৃদয়ে ব্যথা, কোথাও যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মুবারিযুদ্দিন একটু কষ্ট পেলেন, কিন্তু তারপরেও নানা প্রকার উপহার নিয়ে সদলবলে কবির কুটির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। হাফিয তখন তাঁর শাখ-ই-নাবাতের সঙ্গে রুকনাবাদের তীরে গোলাপ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সুলতানের সহচর হাফিযকে এসে বললেন যে– 'স্বয়ংসুলতান বিভিন্ন উপঢৌকন নিয়ে আপনার সাথেদেখা করতে এসেছেন' ।কবি বললেন- 'নদীর স্নিগ্ধ তরল

জলরাশি আর সঙ্গে রয়েছে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, এর চেয়ে মুল্যবান সম্পদ আর কি হতে পারে? আমি যাবো না'। সহচর ফিরে গিয়ে সুলতানকে কথাগুলো বলতেই হাফিয ও শাখ-ই-নাবাত দ্রুত নদীর স্রোতে ঝাঁপ দিলেন এবং সাঁতার কেটে সে বারের মতো প্রাণ বাঁচালেন। এতে মুবারিযুদ্দিন হাফিযের উপর ভয়ানক রেগে লেগেন। পরদিন হাফিযের কবিতা এবং রাজ্যের সব কয়টি শরাবখানা বন্ধ ঘোষণা করে দিলেন এবং এ কথাও বলে দিলেন যে, যারা প্রকাশ্যে এ দুটো অপকর্ম করবে তাদের একশো দোররা মেরে হত্যা করা হবে। সবাই অবাক হয়ে গেলো। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৬৭-৬৮) কিন্তু এর আগেই হাফিয নিম্নলিখিত বেইতগুলো লিখে মানুষের কণ্ঠে তা ছড়িয়ে দিলেন-

اگر چه باده فرح بخش و باد کلبیزست

ببانگ چنگ مخور می که محتسب تیزست

در آستین مرقع پیاله پنهان کن،

که همچو چشمِ صُراحی زمانه خونریزست

ز رنگ باده بشوئید خرقه ها از اشک،

که موسمِ ورع و روزگار پرهیزست

Though wine gives delight and the wind distils the perfume of the rose,

Drink not wine to the strains of the harp, for the constable is alert.

Hide the goblet in the sleeve of the patch-work cloak,

For the time, like the eye of the decanter, pours forth blood.

Wash your dervish-cloak from the wine-stain with tears,

For it is the season of piety and the time of abstinence.(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৭)

শামসুল আলম সাঈদ (দ্রষ্টব্য : সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৬৯) উপরোক্ত বেইতগুলোর অনুবাদ করেছেন এভাবে:

"তবু শরাব দেয় আনন্দ এবং হাওয়া গোলাপের খুশবু ছেনে আনে

শরাব না নিয়ে বীণার তারে হাত রেখো না কোতোয়ালি পেরেশানে

যথাসাধ্য হাতার ভেতর পেয়ালা লুকিয়ে হাতের কাজ কর সারাক্ষণ

চোখের সময় কাচের পাত্রের চোখের মতো ভঙ্গুর, তাতেই ভরো এ খুন ।

মদ্য রঞ্জিত অশ্রু দিয়ে তোমার দরবেশি ঘড়িটাকে ধুয়ে ফেল

কারণ এখন মৌসুম সুন্দরের আর পরহেযগারের সময় গেল ।"

উপরোক্ত বেইতগুলোতে হাফিয বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রেম দিয়ে সবকিছুকে জয় করা যায় ।ব্রাউন (ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৮)

এরকম আরেকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

"O will it be that they will reopen the doors of the taverns,

And will loosen the knots from our tangled affairs?

Cut the tresses of the harp [in mourning] for the death of pure wine,

So that all the sons of the Magians may loosen their curled locks!

Write the letter of condolence for the [death of the]Daughter of the Grape,

So that all the comrades may let loose blood [-stained tears] from their eyelashes.

They have closed the doors of the wine-taverns; O God, suffer not

That they should open the doors of the house of deceit and hypocrisy!

If they have closed them for the sake of the heart of the self-righteous zealot

Be of good heart, for they will reopen them for God's sake!"

শামসুল আলম সাঈদ উপরোক্ত বেইতগুলোর চমৎকার কাব্যানুবাদ করেছেন এভাবে-

"হায় কখন তারা পানশালার দরজা আবার খুলবে?

আবার কখন গেরো ফস্কো করে আমাদের শুষ্ক কঠিন জটগুলো ছাড়াবে?

দেখ বীণার ছিন্ন তার পড়ে আছে যেন খাঁটি মদ্যের শবগুলো ঝুলছে

মগান পুত্র কখন তাদের বাঁকের দুপাশে পিপে টেনে ফেরি করতে থাকবে

আমি এই শোকপত্র রচনা করে আঙ্গুর কন্যার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি

যেন বন্ধু স্বজন সবাই মিলে অবরুদ্ধ অশ্রু সব ঝেড়ে ফেলতে পারি ।

এয় খোদা! তারা পানশালার দরজা বন্ধ করে আমাদের ভোগাচ্ছে

চিত্ত থেকে প্রতারণা আর ভন্ডামির দরজা খুলে তাদের উচিত বেরিয়ে আসা

তারা তাদের মনের খাতিরে মুক্ত বুদ্ধির উৎসাহে নিজেকে মুক্ত করুক ।

আহা সহৃদয়ে, তাদের খোদার কসম তারা আবার সব দরজা খুলে দিক ।" (দ্রষ্টব্য :সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৬৯)

তাঁর শাসনামলে হাফিযকে জীবন্ত ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিলো । কিন্তু এর আগেই আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় তিনি মৃত্যুবরণ

করেন । অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মুবারিযুদ্দিন রাগী প্রকৃতির এবং সন্দেহপ্রবণ ছিলেন । তাঁর আচরণে মর্মাহত হয়ে তাঁর বড় ছেলে জালালুদ্দিন শুজা, অন্য পুত্র কুতুবুদ্দিন মাহমুদ এবং জামাতা শাহ সুলতান একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন । শাহ সুলতান তাঁকে ধরে অন্ধ করে দেন এবং সিংহাসনচ্যুত করেন । এরপর ৭৫৯/১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহ সুজা সুলতান হন । প্রায় ছয় বছর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করার পর ৭৬৫/১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

হাফিয ও শাহ্ শুজা

কবি হাফিযের কাব্য প্রতিভার প্রকাশ তথা কবিতা রচনার কাজ প্রকৃতপক্ষে তাঁরই শাসনামলে সংঘটিত হয়। হাফিয তাঁর অধিকাংশ কাসিদায় শাহ্ শুজার প্রশংসা করেছেন। তাদের উভয়েরই পারস্পরিক বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তাঁর নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা মন্ত্রী জালালুদ্দিন তুরান শাহ্ (মৃত্যু ২১ রজব, ৭৮৭/ ২৮ আগস্ট ,১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর সাথে কবি হাফিযের অত্যন্ত সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। তুরান শাহ্ একদিন এক বিশেষ ঘটনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে শাহ্ শুজাকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেকে ফারিস প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হাফিয তাঁর প্রশংসায় লিখেন-

آصف دور زمان جان جهان توران شاه

که در این مزرعه جزدانه خیرات نکشت

মৎকৃত অনুবাদ: তুরান শাহ্ হচ্ছেন স্বীয় যুগের তলোয়ার সদৃশ, সবার প্রাণপ্রিয় নেতা,

তিনি পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ ব্যতীত, অন্য কোনো বীজ বপন করেন নি। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃ: ২০২)

শাহ্ শুজা বীরত্ব, বদ্যানতা, সৌজন্যতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি নিজে আরবি ও ফারসি ভাষার কবি ছিলেন। তাঁর সভা অনেক কবি ও বিদ্বান ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিলো। হাফিয তাঁদের নিয়ে অনেক কাসিদা রচনা করেন। যাই হোক, শাহ্ শুজা ক্ষমতায় এসেই সমস্ত মদ্যশালা খুলে দিলেন। মানুষ আবার কবিতা ও গান গাইতে শুরু করলো ।হাফিয খুশি হয়ে লিখলেন-

در مجلس دهر ساز مستی پستاست،

نه چنگ بقانون و نه دف بر دست است

رندان همه ترک می پرستی کردند

جز محتسب شهر که بی می مست است،

In the assembly of the time the concomitants of wine-bibbing are laid low;

Neither is the hand on the harp, nor the tambourine in the hand.

All the revelers have abandoned the worship of wine

Save the city constable, who is drunk without wine.(উদ্ধৃতি :ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৮)

আরও বললেন :

At early dawn good tidings reached my ear from the Unseen Voice:

It is the era of Shah Shuja : drink wine boldly!

That time is gone when men of insight went apart

With a thousand words in the mouth but their lips silent.

To the sound of the harp we will tell those stories

At the hearing of which the cauldron of our bosoms boiled.

Princes[alone] know the secrets of their kingdom;

O Hafiz, thou art a beggarly recluse; hold thy peace!(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৯)

শামসুল আলম সাঈদ (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৭) উপরোক্ত বেইতগুলোর কাব্যানুবাদ করেন এভাবে-

খুব ভোরে আজ সুখবর এলো আমার কানে কোনও অজানা স্বরে

শাহ সুজার উজ্জ্বল রাজত্ব শুরু হল মদ্য পিয় খুব জোরসে সবে ।

সে সময় হয়েছে গত যখন অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টির মানুষ কেটে পড়েছিল,

তাদের মুখে জমা ছিল হাজার কথা কিন্তু তাদের ওষ্ঠ ছিল স্তব্ধ ।

বীণার সুরে শব্দ ছিল না কোথায় কাব্যও উধাও, এখন আমরা সে গল্প বলছি

শুনতে পাচ্ছিলাম খুব বড় ডেকচিতে আমাদের হৃদয় সিদ্ধ হচ্ছিল ।

রাজপুত্র কবিরা কোথায় তাদের রাজ্যের গোপন কথা

ওহে হাফিজ, তুমি তো গুহাবাসী ছিলে এক ফকির এখন শান্তিতে থাক ।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাহ্ শুজার সাথে হাফিযের সংঘর্ষ শুরু হলো । কারণ হলো শাহ্ শুজা কবিতা লিখেতে শুরু করলেন এবং আর তিনি হাফিযকে তাঁর নিজের কাছে রাখতে চাইলেন । কিন্তু হাফিয রাজী হলেন না । আর কারোও সাথে বিবাদে জড়াতেও চাইলেন না । তিনি লিখলেন-

I swear by the pomp and rank and glory of Shah Shuja

That I have no quarrel with anyone on account of wealth and position.

See how he who[formerly] would not permit the hearing of music

Now goes dancing to the strains of the harp. (ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৭৯)

অন্য এক কবিতায় হাফিয আরও বললেন-

The harp began to clamour ‘Where is the objector?’

The cup began to laugh 'Where is the forbidder?'

Pray of the King's long life if thou sleekest the world's welfare,

For he is a beneficent being and a generous benefactor,

The manifestation of Eternal Grace, the light of the Eye of Hope,

The combiner ot theory and practice, the Life of the World, Shah Shuja.(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮০)

হাফিয ও বিস্ময়কর দিওয়ান(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৮) গ্রন্থে উপরোক্ত বেইতগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপ :

"ইরাকি বীণা উচ্চরবে বেজে বলছে, কোথায় সে বাধা প্রদানকারী, সুরার

পেয়ালা হাসতে শুরু করেছে আর বলছে, কোথায় সে নিষেধ প্রদানকারী?

এখন এসো আমরা সুলতানের দীর্ঘ জীবন কামনা করি

যদি তুমি জগতের মঙ্গল চাও

কারণ তিনি হলেন প্রকৃত কল্যাণকামী এবং সদাশয় উপকারী সকলের;

চিরন্তন দয়ার শোভাযাত্রা, আশার চোখের জ্যোতি,

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চর্চার মিলনকারী, জগতের আয়ু শাহ্ সুজা ।"

এরপর সুলতান শাহ্ শুজার সাথে হাফিযের প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে গেলো । সুলতান সৈন্য দিয়ে কবিকে পরাজিত না করতে পেরে কবিতার আশ্রয় নিলেন । এক-দুই লাইন লেখার পর আর লিখতে না পেরে অন্যান্য কবিদের ডাকলেন । এমনই একজন কবি হলেন কিরমানি ইমাদি কাফি । শেষ পর্যন্ত তিনিই সুলতানের হয়ে কবিতা লিখতে লাগলেন এবং দরবারের শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে গেলেন । শাহ্ শুজা তাঁকে রাজকবি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন এবং ঘোষণা করলেন হাফিয একজন নিকৃষ্ট কবি । এ মত প্রচার করার জন্য নানা স্থানে গুপ্তচর নিয়োগ করা হলো । যারা হাাফিযের প্রশংসা করলো, তাদের শাস্তি দেওয়া হলো । পরিণামে হাফিযের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো । হাফিয গাইলেন -

"সহৃদয় বলে স্থান পরিবর্তনশীল খেলার পাখি তুমি আকাশে বিচরণ করে ভুল পথে চালিত হয়েছো, বিড়াল তপস্বী শত শত নামাযে তা ঘুচবে না ।"(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭১)

শাহ্ শুজা বুঝে গেলেন কিরমানির কবিতা কোনো কাজে লাগবে না । তাই তিনি হাফিযের কবিতা থেকে কিছু কবিতা বাছাই করেতাতে ধর্ম বিরুদ্ধ ও সমাজ বিরুদ্ধ কয়েকটি যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের ক্ষিপ্ত করে দিতে সক্ষম হলেন । একদিন হাফিযকে একটি ধর্মীয় মজলিসে ডাকা হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো যে, হাফিয ধর্মীয় নাশকতামূলক কথার্বাতা বলেন এবং তাঁর মাঝে পানাসক্তি ও মাতলামি সম্পূর্ণভাবে রয়েছে । কাজি হাফিযকে বললেন- 'এটা কি সত্যি?' হাফিয বললেন- 'সত্যি তাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে তা পড়ে, গায় আর সর্বত্র সঞ্চারিত হয় আমার কবিতা-গান । একথা সবাই জানে এবং আপনিও অবগত । সবাই আমার কবিতার প্রশংসা করে,আল্লাহ্র দরবারে আমার কবিতার অর্থ চলে গেছে, সেটা আর বন্ধ করা যাবে না' ।কাজিও একমত পোষণ করলেন । এ কাজি সৌভাগ্যবশতঃ হাফিযের অন্যতম ভক্ত ছিলেন । কিন্তু শাহ্ শুজা হাফিযের উত্তর এবং কাজির বিচার শুনে

ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কিন্তু কাজির উপর জোর খাটাবার সুযোগ পেলেন না। এর কিছুদিন পর হাফিয হঠাৎ করে এক কবিতায় লিখলেন-

گر مسلمانی از آنست که حافظ دارد

وای اگر از پی امروز بود فردائی

"If Muhammadanism be that which Hafiz holds,

Alas if there should be a to-morrow after to-day!"(দ্রষ্টব্য : ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮১)

মৎকৃত অনুবাদ: হাফিযের যে ধর্ম যদি তা ইসলাম হয়,

তবে এই দিনটি আজকের পরিবর্তে অবশ্যই আগামীকাল হওয়া উচিত।

শাহ্ শুজাএ খবর পেয়ে রাতেই শিরাজের মুফতি শাহবাজ মাওলানা জয়নুদ্দিন আবু বকর তায়াবাদিকে নির্দেশ দিলেন যেন এই মুহূর্তে হাফিযকে বিধর্মী ঘোষণা করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। মুফতি সুলতানের নিকট সময় চাইলে পরের দিন বারোটা পযর্ন্ত সময় দিলেন। মুফতি রাতের বেলায়ই বিশ্বস্ত একজন লোকের মাধ্যমে হাফিযের নিকট খবর পাঠালেন এবং যেভাবেই হোক এর মোকাবেলা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর শাখ-ই-নাবাতকে সব কথা খুলে বলে কাঁদতে লাগলেন। শাখ-ই-নাবাত বললেন- 'আপনি তো দুনিয়ার সেরা কবি, এটা আর এমন কি, ঐ কবিতার সাথে এমন কোনো কথা জুড়ে দিন যাতে কথাগুলোকে নাকচ করে দিতে পারে'। সকাল হবার আগেই হাফিয লিখলেন-

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت

بر در میکده ی با دف و نی ترسائی

"How pleasant to me seemed this saying which at early morn

A Christian was reciting at the door of the tavern with tambourine and flute."(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮১)

কত আমার আনন্দ হচ্ছে মনে, এ কথা নিয়ে সকাল বেলাতে

সরাইখানার দোরে এক নাসারা তার তাম্বুরা আর বাঁশিতে গাইলেন। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৩)

পরদিন হাফিয স্বাভাবিকভাবে এজলাসে হাজির হয়ে কবিতার বাকি অংশটা দেখালেন। তাঁর আর শাস্তি হলো না।

হাফিয ও সুলতান আহমদ ইবনে উয়েজই জালায়ি ও মন্ত্রী উম্মাদ বিন মাহমুদ

প্রাচীনকালে কবিদের অত্যন্ত সম্মান ছিলো এবং অনেক রাজা-বাদশাহগণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর তাঁদের সমাদর করতেন। কবিদের সম্রাটগণ ভয়ও পেতেন । বিশেষ করে পারস্য এবং ইরানে তীব্র ও তীক্ষ্ম বিদ্রূপপূর্ণ কবিতার ভয়ে শক্তিশালী সুলতানগণও শঙ্কিত থাকতেন। হাফিযের জীবদ্দশায় তিনি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে, দূরদেশ হতেও অনেক রাজারা তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁদের রাজদরবারে যোগ দেওয়ার জন্য কিংবা তাঁর কবিতা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু নানারকম ঘটনা বিপর্যয় বা তাঁর নিজের জন্মভূমির প্রতি একান্ত আর্কষণহেতু, তিনি কোথাও যেতে পারেন নি। (পাল[৩৪] : ১৩৬০ বাংলা,পৃ: ১২৪)তৎকালীন বাগদাদের শাসনকর্তা সুলতান আহমদ ইবনে উয়েজই জালায়ি হাফিযের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বারবার হাফিযকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। হাফিয বাগদাদে যান নি। তবে তাঁর আগ্রহকে সাধুবাদ দিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন-

I praise God for the justice of the king

Ahmad the son of Shaykh Uways the son of Hasan Il-khanf;

A Khan and the son of a Khan, a King of kingly descent,

Whom it were meet that I should call the Soul of the World.

No rose-bud of delight bloomed for me from the earth of Fars:

O for the Tigris of Baghdad and the spiritual wine!

Curl your locks in Turkish fashion, for in thy fortune lie

The Empire of Khusraw and the status of Chingiz Khan.(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮৪)

খোদার অসীম শুকরিয়া আদায় করছি ন্যায় যেন বাদশাহের পরে বর্ষিতহয়

আহমদ হাসান ইলযামী এর পুত্র বাদশাহের সেরা বাদশাহের উত্তরাধিকারী

যিনি আমাকে তাঁর দরবারে নিমন্ত্রণ করেছেন দুনিয়ার আত্মার ডাকে হাজিরাদিয়ে

আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা উচিত ছিল ।

ফারেসের মাটিতে কোনও গোলাপ কুঁড়ি আমোদিত হয়ে আর

আমার জন্য ফুটবে না

ওগো ফোরাত কুলের বাগদাদ আর তার আধ্যাত্মিক মদ্য

তোমার চুলের গুচ্ছ তুর্কি কায়দায় ফুলে কুন্ডলি হোক

কারণ তোমার ভাগ্য বিরাজ করছে

সম্রাট খসরু আর চেঙ্গিস খানের মর্যাদায় ।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৯)

হাফিয তাঁর জন্মভূমি শিরাযকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেন:

ره نبردیم بمقصود خود اندر شیراز

خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند

"In Shiraz we did not find our way to our goal;

Happy that day when Hafiz shall take the road to Baghdad!"(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮৫)

আসলে হাফিয শিরায ছেড়ে বেহেশ্‌তেও যেতে চান না । বাগদাদ তো তুচ্ছ। অথচ হাফিযের সময় বাগদাদই ছিলো ইসলামী জাহানের রাজধানী এবং পৃথিবীর আকর্ষণ। মাওলানা শিবলী নোমানি অনেক প্রামাণিক উল্লেখে উদ্ধৃত করেছেন যে, হাফিয তাঁর সমসাময়িককালে অনেক বাদশাহ-সুলতানের স্তুতি রচনা করেছেন যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রতি অনীহা ও দূরে থাকতেই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর সুফি-সাধনা ও নির্জনতাপ্রিয় জীবনের প্রতি বেশি আর্কষণ ছিলো। সুলতান আবু ইসহাক ইনজু ছাড়া আর কোনো সুলতানের দরবারে তিনি ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ ছিলেন না। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৭৯) হাফিয তার জন্মভূমি শিরাযের প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখেছেন। যেমন একটি গযলে তিনি বলেন-

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش
ز رکن آباد ما صد لوحش الله
که عمر خضر می‌بخشد زلالش
میان جعفرآباد و مصلا
عبیرآمیز می‌آید شمالش
به شیراز آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش
که نام قند مصری برد آن جا
که شیرینان ندادند انفعالش
صبا زان لولی شنگول سرمست
چه داری آگهی چون است حالش
گر آن شیرین پسر خونم بریزد
دلا چون شیر مادر کن حلالش
مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش
چرا حافظ چو می‌ترسیدی از هجر
نکردی شکر ایام وصالش

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২৯১, তদেব, পৃ: ১৩৯)

How beautiful is Shiraz's unparalleled state

God save it from harm and the hands of fate.

May God keep its flowing Roknabad river

Its waters with freshness, always equate.

Between Jafarabad and Mossalla gardens

Northern breeze's scent, forever accelerate.

In Shiraz the bounty of heavenly spirit

Admidst its wise people is an inner trait.

Nobody talks of the Egyptian sugar

It surpasses all, in sweetness is great.

O breeze what news of the happy minstrel?

How is his state? How does he relate?

If that sweet boy kills, and sheds my blood

O heart forgive him for his innocent hate.

O God let me say with, this, my dream

I am happy with the vision of my mate.

Brave separation Hafiz, patiently wait

Thank God for union, time to consummate. (Ghazal 279 : www.hafizonlove.com)

উম্মাদ বিন মাহমুদ সুলতান কুতুবুদ্দিন ইস্পাহানের শাসনকর্তার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হাফিযকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনিও হাফিযকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু হাফিয সেখানে যান নি, হাফিয তাঁর গযলের মাঝে অনেক স্থানে তাঁর নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে আসফের রাজত্বকালের বর্ণনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি 'আসফের রাজত্বকাল' উম্মাদ-বিন-মাহমুদের সময় অর্থেই ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

"আমি সমসাময়িক আসফের সেবক-আসফ বাইরে সম্রাট, প্রকৃতিতে দরবেশ।"(মনসুরউদ্দীন[৪১] : তদেব, পৃ: ১৮৭)

হাফিয কখনোও খ্যাতির জন্য লালায়িত ছিলেন না; কিন্তু বসরার গোলাপের মতোই তাঁর গযলের সৌরভ দিক্-দিগন্ত আলোড়িত করে ফেলেছিলো। হাফিযের গযল লোকের এতো জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলো যে, তা ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় উপমহাদেশেও এসে

পৌঁছেছিলো। তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন-

بشعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

"The black-eyed beauties of Cashmere and the Turks of Samarqand

Sing and dance to the strains of Hafiz of Shiraz's verse."(ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮৩)

(মৎকৃত অনুবাদ: কাশ্মিরের কালো-আঁখি সুন্দরী ও সমরকন্দের তুর্কি-তরুণী,

তারা হাফিযের গযল গায় আর নৃত্য পরিবেশন করে ।)

হাফিয ও বাহমানি সুলতান মাহ্মুদ শাহ

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের বাহমানি রাজবংশের তৎকালীন শাসনকর্তা প্রথম মাহ্মুদ শাহ (শাসনকাল- ৭৮০/১৩৭৮-৭৯৯/১৩৯৭ সন) এর শাসনামলে তাঁর বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর পক্ষ হতে কবি হাফিয ভারতবর্ষে আগমনের জন্য দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । কিন্তু হাফিয তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন নি । (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃ: ২০২)সুলতান মাহ্মুদ আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন । তাঁর রাজত্বকালে আরব ও আজমের (আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশ বা তার অধিবাসী) কবিগণ দাক্ষিণাত্যে আগমন করে পুরস্কার ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন । সাধারণ এক কাসিদার পরিবর্তে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লাভ করে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হতেন । হাফিয যখন অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তখন তিনিও দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন নি ।

আল্লামা তফতজানির ছাত্র এবং সুলতান মাহ্মুদ শাহের দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, মীর ফজলুল্লাহ্ হাফিযের ইচ্ছার কথা শুনে তাঁর দাক্ষিণাত্যে আসার প্রার্থনা জানিয়ে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিলেন । হাফিয অর্থ পেয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করেন এবং ভাইয়ের ছেলেকে কিছু অর্থ দান করেন আর অবশিষ্ট কিছু অংশ নিয়ে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করলেন । কথিত আছে যে, তিনি শিরায হতে বের হয়ে 'লার' নামক স্থানে পৌঁছে এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ সে রাতেই বন্ধুর সবকিছু লুট হয়ে যায় । হাফিয তাঁর অবশিষ্ট অর্থ তাঁকে দান করেন । ঘটনাক্রমে খাজা জয়েনউদ্দিন হামদানি ও খাজা মোহাম্মদ কাজবানি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারত আসছিলেন । তারা হাফিযকে তাঁদের সাথে আসার অনুরোধ জানালেন । বলা হয়ে থাকে যে, হাফিয যখন হরমুজ পৌঁছেছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুলতানের পাঠানো একটা মাহমুদ-শাহী জাহাজে তিনি উঠেছিলেন । যাত্রা করার পূর্বেই ভয়ানক ঝড়-তুফান শুরু হয় । সমুদ্র ভীষন উত্তাল ছিলো আর তাঁর বার্ধক্যও তাঁকে সায় দিচ্ছিলো না । তিনি শেখ সাদীর একটা কবিতা স্মরণ করলেন-

به دریا در منافع بی شمار است

اگر خواهی سلامت کنار است

"সাগরের ব্যবসা খুব লাভজনক

যদি নিরাপদে কূলে পৌঁছা যায় ।" (মনসুরউদ্দীন[৪১] : তদেব, পৃ: ১৭৯)

এ অবস্থায় তাঁর আর দাক্ষিণাত্যে যাওয়া হলো না। তিনি জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। হরমুজবাসী বন্ধুগণকে বিদায় জানিয়ে সোজা শিরাযে প্রত্যাবর্তন করলেন। অবশেষে নিম্নলিখিত গযল লিখে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিলেন-

«دمی با غم بسربردن جهان یکسر نمی ارزد

بمی بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد»

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২০৬, তদেব, পৃ: ৯২)

মিস গার্ট্রুড লোথিয়ান বেলের *Poems from the Divan of Hafiz* গ্রন্থের একুশ নম্বর গযলে (পৃষ্ঠা ৯১-৯৩) এই কবিতাটির চমৎকার কাব্যান্তর পাওয়া যায়। যদিও তাঁর অনুবাদটা মূলের থেকে খানিকটা ভিন্ন। মিস বেল রুবাঈয়্যাত (চতুষ্পদী কবিতা) আকারে উপরোক্ত গযলটির যেরূপ অনুবাদ করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Not all the sum of earthly happiness

Is worth the bowed head of a moment's pain,

And if I sell for wine my dervish dress

Worth more than what I sell is what I gain!

The Sultan's crown, with priceless jewels set,

Encircles fear of death and constant dread;

It is a head-dress much desired- and yet

Art sure tis worth the danger to the head?

Down in the quarter where they sell red wine

My holy carpet scarce would fetch a cup-

How brave a pledge of piety is mine,

Which is not worth a goblet foaming up!

Full easy seemed the sorrow of the sea

Lightened by hope of gain- hope flew too fast!

A hundred pearls were poor indemnity,

Not worth the blast.(দ্রষ্টব্য :ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮৬)

ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা বলেন- দাক্ষিণাত্যের বাহমানি সুলতান এ সমস্ত বিষয় জানতে পেরে তাঁকে পারিশ্রমিকস্বরূপ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী মেশেদ নগরের অধিবাসী মোল্লা মোহাম্মদ কাসেমের দ্বারা হাফিযের কাছে পাঠিয়ে দেন। (বরকতুল্লাহ[৩৫] :২০০০, পৃ: ২১৭)

হাফিয শিরাযি ও বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্

ভারতবর্ষ হাফিযকে অতি উচ্চ মূল্যে সম্মানের আসনে রেখেছে। তাঁর সময়কালে বার বার হিন্দুস্তানের রাজারা তাঁকে সম্মান সহকারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরবর্তীকাল হতে আজ পর্যন্ত শত শত বছর ধরে এখানে তাঁর কবিতা ও গানের সমাদর রয়েছে। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্‌ও হাফিযকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি আসতে পারেন নি, তবে একটি কবিতা সুলতানকে লিখে পাঠান। তা নিয়েও একটি গল্প রয়েছে। *রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজ* গ্রন্থে (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৩০) উল্লেখিত ঘটনাটি নিম্নরূপ-

একবার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর বাঁচার কোনো আশাই ছিলো না। হেকিম-বৈদ্যরা তাঁদের পাঁজিপুথি নিয়ে দূরে প্রতীক্ষা করছিলেন সুলতানে শেষ করুণ দৃশ্য দেখার জন্য। সুলতান তাঁর হেরেমে থাকা সুন্দরী রক্ষিতা তন্বী বাঁদিদের মধ্যে থেকে সারভ, গুল ও লা'লে নামক তিনজনকে তাঁর মৃতদেহ শেষ গোসলের জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু এই তিন বাঁদির ঐকান্তিক সেবা-শুশ্রূষায় সুলতান সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই তিন পরিচারিকার জন্য সুলতানের হেরেমে বিশেষ মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। সুলতানও তাদের আগের চেয়ে আরোও বেশী ভালবাসতে শুরু করলেন। এতে অন্যান্য পরিচারিকাগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে আড়ালে তাদেরকে'গাস্‌সালে' বা 'শব-ধোবিনী' বলে টিটকিরি করতে লাগলো। এতে তারা ভীষণ দুঃখ পেতো। একদিন সুলতানের মন যখন খুব ভালো ছিলো, এই তিন পরিচারিকা তাঁর কাছে এসে অন্য পরিচারিকাদের এই টিটকিরির বিষয়ে অভিযোগ করলো। সুলতান হেসে তাদেরকে আরোও বেশী আদর করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে একচ্ছত্র কবিতা রচনা করে ফেললেন-

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود

وین بحث با ثلاثه غساله می رود

সাকি সারভ (সাইপ্রাস-লতার মতো তনু যার), গুল

(গোলাপের মতো সুকোমল বদন যার) আর লালে (টিউলিপ ফুলের মতো মুখ যার)- কে নিয়ে কথা হচ্ছে,

তিন শব-ধোবিনীকে নিয়ে এই আলোচনা হচ্ছে।

এর পরের বেইতগুলো নিম্নরূপ-

می ده که نوعروس چمن حد حُسن یافت — کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود

شکرشکن شوند همه طوطیان *هند* — زین قند پارسی که به *بنگاله* می‌رود

طی مکان ببین و زمان در سُلوک شعر — کاین طفل، یک شبه، ره یک ساله می‌رود

آن چشم جادوانه عابدفریب بین — کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود

از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز مَکاره می‌نشیند و مُحتاله می‌رود

باد بهار می‌وزد از گلستان شاه و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود

حافظ ز شوق مجلس *سلطان غیاث دین* غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود

(শিরাযি[৫২] : তদেব, পৃ: ৯৬)

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী এই গযলটির কাব্যানুবাদ করেছেন যেভাবে :

মদিরার পেয়ালা দাও আমার হাতে। বাগানের নতুন বধূ রূপ লাবণ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

বউ সাজাবে এমন কারো প্রয়োজন নেই এখন।

ভারতের তোতা পাখিরা পারস্যের এ মিছরি ঠুকরে ঠুকরে খাবে,

যা আজ বাংলায় যায়।

কবিতার রীতিতে স্থান ও সময়ের অতিক্রম দেখো।

এক রাতের এই শিশু যে এক বছরের পথ অতিক্রম করেছে।

[এক রাতে বসে লেখা কবিতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক বছরের রাস্তা অতিক্রম করছে]।

তাপসের মন ভোলানো যাদুময় ঐ চক্ষু দেখ,

তার পেছনে যাদুর কাফেলা ছুটে চলেছে।

পথ ভুলে যেয়োনা দুনিয়ার মোহে, এ যে প্রতারক বুড়ি।

সর্বক্ষণ তোমার জন্যে প্রতারণার ফাঁদ পেতে রেখেছে।

বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের বাগান হতে বসন্ত-মলয় প্রবাহিত হচ্ছে।

লালাফুলের পানপাত্রে শিশিরের মদিরা জমা হচ্ছে।

হে হাফেজ! সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মজলিশের উদ্দীপনা নিয়ে চুপ করে থেকোনা।

কেননা গান ও ক্রন্দন দিয়েই তোমার কার্য সিদ্ধি হবে। (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৭৩)

এই গযলটি এতটাই বিখ্যাত যে, প্রত্যেক 'দিভা'নে হাফিয' এ এটি পাওয়া যায় এবং পন্ডিতদের মতে হাফিযের শ্রেষ্ঠ ৫০টি গযলের মধ্যে এটি অন্যতম। অনেকের মতে সুলতান শুধু প্রথম চরণটিই রচনা করেছিলেন। যাই হোক, সুলতান উপযুক্ত এক চরণ বা দু চরণ রচনা করে আর এগিয়ে যেতে পারলেন না। সভাসদ, রাজকবি আর পন্ডিতদের ডাকা হলো। তারা প্রত্যেকে শুনে তাদের পছন্দমতো

পংক্তি সংযোজন করতে লাগলেন। কিন্তু সুলতানের কারো পংক্তিই পছন্দ হলো না। সুলতান কয়েকদিন এ সমস্যাটা নিয়ে ভাবলেন। অবশেষে কোনো উপায় না দেখে প্রচুর উপহার সামগ্রী দিয়ে একদল দূত হাফিযের উদ্দেশ্যে শিরাযের পাঠিয়ে দিলেন;

যাতে তিনি দ্বিতীয় শ্লোক বা সর্ম্পূণ ভাব প্রকাশ করে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করে দেন এবং তিনি যেন সুলতানের মেহমান হয়ে বাংলায় আসেন। (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৩১)

শিরাযে দূতরা পৌঁছেছিল প্রায় এক বছর পরে। হাফিয তখন বৃদ্ধ আর অসুস্থ। তাঁর মনে প্রায় দশ বছর আগের হিন্দুস্তানে না যাওয়ার যন্ত্রণা ছিলো; তবু তিনি বাংলায় আসতে খুব উৎসাহিত ছিলেন এবং কেঁদেছিলেনও নাকি। কিন্তু তখন তাঁর পক্ষে ভ্রমণ যাত্রা সহ্য করার মতো শারীরিক সামর্থ্য ছিলো না। সম্ভবত পরের বছর ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আগে অবশ্য গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যু হয়, তাহলে এ ঘটনা ঘটেছিলো ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দ আর গিয়াস উদ্দিন দূত পাঠিয়েছিলেন এর কোনোও এক সময়।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৮৪)

হাফিয ও তৈমুর লং

হাফিযের কালটা খুবই গোলযোগপূর্ণ ছিলো। সমগ্র পারস্যে যিনি যেখানে পারেন কিছু ভূ-সম্পদ দখল করে নিজেকে অধিপতি বলে ঘোষণা দিতেন অথবা সে সময় অন্য একজন তাঁকে তাড়িয়ে কিছুদিনের জন্য অনুরূপ অধিপতি হতেন। ঠিক এমন সময় পারস্যে শক্তিশালী তৈমুরের আগমন ঘটে। যিনি সমগ্র এশিয়া তছনছ করার প্রাক্কালে ১৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করেন এবং সমস্ত দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৪৮)চীনের পশ্চিম সীমানা হতে মিশরের নীলনদ এবং সুদূর সাইবেরিয়া হতে উত্তর ভারত পর্যন্ত তাঁর বিজয় বাহিনী রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছিলো। সে সময় ইস্পাহান দখল হলো ভীষণ রক্তপাতে, একদিনেই সত্তর হাজার ইরান-সন্তান তৈমুরের নৃশংস বাহিনীর শিকার হয়ে প্রাণ হারালো। নারীরা ভোগ দখলে পরিণত হলো। সেদিন ছিলো সোমবার। 'জাফর নামা' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, ১৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ই নভেম্বর এ রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। তৈমুর পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিনা বাধায় শিরায নগরীতে পৌঁছান। তখনকার সময় শিরাযের ভুবন বিখ্যাত লাল মদের নাম ছিলো শিরাযি। সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইউরোপেও এ মদের গন্ধ, স্বাদ আর মাদকতা পৌঁছেছিলো । তৈমুর বাহিনী শিরাযে প্রবেশ করে মদের নেশায় বিভোর থেকে হত্যাযজ্ঞের কাহিনী একেবারেই ভুলে গেলো। সবাই তখন ঘরে ঘরে খুঁজছে মদ আর শিরাযের তুর্কিবালা আর গাইছে হাফিযের গান-

اگر آن ترک شیرازی بـه دست آرد دل ما را
بـه خال هـندویش بخشم سمرقند و بـخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کـنار آب رکـن آباد و گلگـشت مـصلا را
فـغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شـهرآشوب
چـنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشـق ناتـمام ما جمال یار مستغنی است
بـه آب و رنـگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
کـه عـشـق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشـنام فرمایی و گر نـفرین دعا گویم
جواب تـلـخ می‌زیبد لـب لعل شـکرخا را
نصیحـت گوش کن جانا که از جان دوسـتـتر دارند
جوانـان سـعادتـمـند پـند پیر دانا را
حدیث از مـطرب و می گو و راز دهر کـمـتر جو
کـه کس نـگشود و نـگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
کـه بر نـظـم تو افـشاند فلک عـقد ثریا را

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৬, তদেব, পৃ: ৩)

That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole,

I'll give Samarkand & Bukhara, for her Hindu beauty mole.

O wine-bearer bring me wine, Such wine not found in Heavens

By running brooks, in flowery fields, spend your days and stroll.

Alas, these sweet gypsy clowns, these agitators of our town

Took the patience of my heart, like looting Turks take their toll.

Such unfinished love as ours, the Beloved has no need,

For the perfect Beauty, frills and adornments play no role.

I came to know Joseph's goodness, that daily would increase

Even the chaste Mistress succumbed to the love she would extol.

Whether profane or even cursed, I'll reply only in praise

Sweetness of tongue and the lips, even bitterness would enthrall.

Heed the advice of the wise, make your most endeared goal,

The fortunate blessed youth, listen to the old wise soul.

Tell tales of song and wine, seek not secrets of the world,

None has found and no-one will, knowledge leaves this riddle whole.

You composed poems and sang, Hafiz, you spent your days well

Venus wedded to your songs, in the firmaments inverted bowl.(Ghazal 3: www.hafizonlove.com)

তৈমুর লং জীবনে কখনো কবিতা ছুঁয়ে দেখেন নি। কিন্তু কবিতা ও গান তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর মনকেও যে নৃশংস থেকে উদাসীন করতে পারে কিংবা একেবারেই হিংস্রতাশূন্য করে দিতে পারে, তা দেখে অবাক হলেন।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৪৯)তৈমুর লং ভীষণ রেগে গেলেন। সাথে সাথে কবিকে ধরে নিয়ে আসার হুকুম করলেন। মোঘল সৈন্যরা ছুটলো রোকনাবাদের মুসল্লায় কবির খোঁজে। শিরাযের রত্ন-মাণিককে খুঁজে পেতে তাদের বেশি কষ্ট হয় নি। টেনে-হেঁচড়িয়ে তারা খাজা হাফিযকে হাজির করলো তৈমুর লং এর

তাঁবুতে। দরবেশী জরাজীর্ণ পোষাকে খাজা হাফিয দাঁড়িয়ে আছেন বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত তৈমুরের সামনে। তৈমুর লং জিজ্ঞাসা করলেন- 'এই কবিতা কার লেখা?' হাফিয জবাব দিলেন-'এই গরীবের।' তৈমুর লং বললেন- 'যে সমরকন্দ ও বুখারা দখল করতে

আমার অজস্র সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে, যে সমরকন্দ ও বুখারাকে আমি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ আর রত্ন-রাজি দিয়ে গড়ে তুলেছি, তাকে নাকি এক নারীর গালের কালো তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে গল্প করে বেড়াচ্ছো ।'

তিনি আরও বললেন- "কোন বুদ্ধিতে তুমি আমার দুটি আঁখি উপড়ে নিয়ে সামান্য এক তুর্কি সুন্দরী বালিকাকে উপহার দিতে চাও?"তৈমুরের দুটি চোখ ছিলো এই সমরকন্দ আর বুখারা নগরী । মধ্য এশিয়ার এই শ্রেষ্ঠ দুটি নগরী তৈমুর সৃষ্টি করেছিলেন । ঐতিহাসিকদের মতে এ দুটি নগরী হলো রোম ও প্যারিস । মধ্যযুগে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমন্ডিত ও ঔজ্জ্বল্যদীপ্ত নগরী ছিলো এই সমরকন্দ ও বুখারা । তৈমুর তাঁর বিজিত সমস্ত অঞ্চলের সব ধন-রত্ন এনে জড়ো করেছিলেন এই দুই নগরীতে । শুধু ধন-রত্ন নয়, শ্রেষ্ঠ গুণী-জ্ঞানী, সৌন্দর্য পিপাসু সুদর্শন ব্যক্তিবর্গ এমনকি সুন্দরী নারীদেরও সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন । তাই বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের ভাষায় সমরকন্দ ও বুখারা কেবলমাত্র তৈমুরের দু'চোখের মণি নয়, সারা বিশ্বের আঁখি ছিলো এই দুইটি নগরী, কারণ সমরকন্দ ও বুখারা দিয়ে তখন বিশ্বকে দেখা যেত । অর্থাৎ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ ও জ্ঞানী-গুণী সুন্দর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত । এমন দুটো নগরীর বেহাল অবস্থা করে দিয়েছেন কবি হাফিয । (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৫০)

হাফিয বিপদ বুঝে বিনীতভাবে জবাব দিলেন-

'হে বাদশাহ্, এভাবে বিলিয়ে দেবার কারণেই তো আমার আজ জরাজীর্ণ ফকিরি অবস্থা । আর আপনি তা করেন নি বলেই তো দেশের পর দেশ জয় করে এতো বড় বাদশাহ্ হতে পেরেছেন ।' (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৬০)এ কথা শুনে তৈমুর খুশী হলেন । হাফিযের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে আদেশ দিলেন । তারপর তিনি বললেন- 'কবি দু'হাতে যা নিতে পারে, এই মুহূর্তে সে রকম রত্ন-রাজি তুলে দাও' । হাফিয যা পেলেন মুহূর্তে তা সব উপস্থিত সকলের মাঝে বিলিয়ে দিলেন । তবে কিংবদন্তি আছে যে, হাতের বাঁধন খোলার পর হাফিয ধনরত্ন কিছুর দিকে পরোয়া করেন নি । তৈমুরকে বলেছিলেন, শিরায় নগরীর একটি প্রাণীও যেন প্রাণ না হারায় । তৈমুর তাঁর কথা শুনেছিলেন এবং তাঁকে পাশে বসিয়ে হাতে পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, যা তৈমুর জীবনে কখনো আর কাউকে করেন নি ।(সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৫১)

উপরোক্ত কবিতাটিকে পৃথিবীর অন্যতম লিরিক কবিতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে । নজরুল লিখেছেন- 'ইরানী কবিরা শরাবের গুণগান করেছেন, বিশেষতঃ ওমর খৈয়াম ও হাফিয' । কিন্তু ওমর খৈয়ামের শরাবের সঙ্গে হাফিযের শরাবের পার্থক্য রয়েছে । যদিও নজরুল অন্যত্র বলেছেন- 'হাফিয সুফি দরবেশ ছিলেন' । আমাদের মনে হয় হাফিয এর কোনটাই নন । হাফিযের সুরা, সাকি, বুলবুল ইত্যাদি কাব্যপ্রতীক মাত্র । নজরুল হাফিযের কাব্যে ছন্দ ও সুর ঠিক রাখার চেষ্টা করেছেন, যেমন-

> "যদিই কান্তা সিরাজ সজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল ফের,
>
> সমরকন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিলটের ।" (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৫৩)

তুর্কি সুন্দরীর প্রসঙ্গ কেবল হাফিযের এ কবিতায় নয়, অন্যত্রও দেখা যায় । সে কারণে অনেকের ধারণা হাফিযের শাখ-ই-নাবাত ছিলেন তুর্কি সুন্দরী । শাখ-ই-নাবাত ছিলেন হাফিযের প্রিয়তমা স্ত্রী, যার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ।

তারপর তৈমুর লং হাফিযকে বোখারায় নিয়ে গিয়ে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন এবং লোভ দেখালেন, বোখারার তুর্কি সুন্দরীদের তো রূপের তুলনা নেই, হাফিয তো আসল রূপ না দেখেই এ কবিতা লিখেছেন । তৈমুর চাইলেন, কবি যেন প্রকৃত সুন্দরী চোখ ভরে দেখে এবং তাদের জীবন্ত আস্বাদন করে বুখারা ও সমরকন্দকে নিয়ে আরোও কবিতা লিখেন । সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসিকে যা দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি উপহার সামগ্রী হাফিযকে দিতে চাইলেন । কিন্তু হাফিয বললেন- 'ফেরদৌসি তো শেষ পর্যন্ত কিছুই পান নি' । তৈমুরের বোঝার আর বাকি রইল না যে, তিনিও হাফিযকে কেবল খোদা হাফেয বলে বিদায় করবেন । তৈমুর

হাফিযের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রথমেই দু'একজন চতুর্দশী তুর্কি বালাকে হাফিযের সামনে হাজির করলেন। হাফিয তাদের দেখে যে গযলটি (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৫২, তদেব, পৃ: ২৬) গেয়েছিলেন কাজী আকরম হোসেন সে গযলটির কাব্যানুবাদ করেছেন নিম্নোক্তভাবে-

ফুল বুকে মোর মদ হাতে মোর প্রাণ বধূ মোর সোহাগরত,

এমনদিনে রাজার রাজাও গণি যে মোর দাসের মতো।

আজ নিশীথে মদ আসরে জ্বেলো না আর মোমের বাতি,

প্রিয়ার আমার ইন্দু বদন কর্‌বে উজল আঁধার যত।

শরাব সেবা হালাল বটে পন্থে মোদের, হারাম তবু

ফুলেল তনু বধূর আনন নইলে পরে ইতস্ততঃ।

খোশবু আতর মিছেই মাখা আমাদের এ জলসা মাঝে,

বেণী তোমার মন মাতানো সুবাস যখন দিচ্ছে কত।

মিছরি চিনির স্বাদের কথা শুনাও মিছে আমার পাশে,

মিঠে তোমার ঠোঁটের তরেই প্রাণের আমার সাধ নিয়ত।

দুর্নামে আর ডর কি আমার নাম তো আমার দুর্নামেতেই,

নামের কথা কি আর তোল দুর্নাম আমার নামেই শত।

কাজীর পাশে গীবত আমার কোরো না আর নাহক তুমি,

নিজেও সেজে আমার মত আয়েশ সুখের নেশায় হত।

হাফিয ওরে ক্ষণেক তরেও রোস্‌নে ছেড়ে মদ ও প্রিয়া,

এলো যে দিন গোলাপ যুঁইয়ের, ঈদ এলো ওই, রোজা গত।" (হোসেন[৭০] : ২০১২, পৃ: ৫৭)

গযলটিতে হাফিয তৈমুর লংকে জালিম বলেছেন। কিন্তু তৈমুর হাফিযের ওপর না রেগে তাঁর নবনির্মিত রাজধানী বুখারায় হাফিযকে আটকে রাখলেন। স্বল্পকাল আগে সমরকন্দ থেকে এখানে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছেন। দুনিয়ার সুলতানের শাহী প্রাসাদে কবিকে রাখা হলো। তবে হাফিয কতদিন বুখারাতে জীবন কাটিয়েছেন, সেটা কোথাও লেখা নেই। তাঁর এ-বন্দীত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী। বিশ্বত্রাস তৈমুর কোথাও একদন্ড স্থির থাকতে পারতেন না। কোনো কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি মিটতো না। বহু রাজ্য-রাজধানী তখনো তাঁর দখলে আসে নি। এবার তিনি হিন্দুস্তান অভিযানে প্রস্তুত হলেন। কবি হাফিযকেও তিনি শোর্য-বীর্য দেখাতে চান। সে অভিযানও যে কী নৃশংস, তা দেখিয়ে কবিকণ্ঠের কাব্যস্তুতি শুনবেন। কবিকে সঙ্গে করে নেয়া হলো বটে কিন্তু পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেকিম পরীক্ষা করে সবিনয়ে কবিকে ছেড়ে দিতে বললেন। বিরক্ত তৈমুর কবিকে তাঁর বেহেশতে ফিরে যেতে বললেন। (সাঈদ[৫৬] : তদেব, পৃ: ৫৬)কবি ছাড়া পেয়ে কান্দাহার থেকে কোনো মতে শিরাযে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাফিয শিরাযি ও সুলতান শাহ্ মানসুর

কবি হাফিয পুনরায় তাঁর শেষ জীবনে মুযাফ্ফরি রাজবংশের শাহ্ মানসুর নামক জনৈক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। উল্লেখ্য যে তৈমুর লং শিরায নগরী ত্যাগ করে চলে যাবার পর শাহ্ মানসুর ফারিস প্রদেশ দখল করে নিয়েছিলেন। হাফিয উক্ত সম্রাটের প্রশংসায় আবেগপূর্ণ কাসিদা রচনা করেন, যা দ্বারা সম্রাটের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিলো; মূলত সে সময়ে কবি হাফিযের শাহ্ মানসুরের ন্যায় বদান্য ও মহানুভব আর্থিক পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজনও ছিলো। কারণ কবির ভূ-সম্পত্তি অনেক আগেই তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিলো। আর অনেক লোকই ঋণভারে জর্জরিত বৃদ্ধ কবির নিন্দা করতে ছাড়তো না। অথচ একসময় তারাই তাঁর বন্ধু হবার দাবি করতো। হাফিয বলেন-

هر دوست که دم زد از وفا دشمن شد

> "বিশ্বস্ততার দাবিদার বন্ধুও শেষ পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়েছে।"

অন্যত্র তিনি বলেন-

> "বলো-তারা যেন হাফিযের ঋণ পরিশোধ করে, তারা সেই ঋণের কথা স্বীকার করেছে, আর আমি তাঁর সাক্ষী।" (ইসলামী বিশ্বকোষ[৩] : তদেব, পৃ: ২০২)

হাফিয শিরাযী শাহ্ মানসুরের প্রশংসায় লিখেছেন-

بیا که رایت منصور پادشاه رسید

نوید فتح و ظفر تا بمهر و ماه رسید

> "Come, for the standard of King Mansur has arrived;
>
> The good tidings of conquest and victory have reached the Sun and the Moon." (ব্রাউন[৭৯] : তদেব, পৃ: ২৮২)

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস (পাল[৩৪] : তদেব, পৃ: ১২৪) গ্রন্থে উল্লেখিত আরেকটি উদ্ধৃতিতে এ সম্পর্কে হাফিয বলেছেন:

> "মানসুর বাদশাহর জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্বকালে
>
> কবিতা-শৃঙ্খলার একমাত্র ধ্বজা ছিলো হাফিয।"

মৃত্যু

৭৯১/১৩৮৯ সালে অথবা সম্ভবত হিজরী ৭৯২ সনে (যা ২০ ডিসেম্বর, ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল) কবি খাজা হাফিয শিরায নগরীতে ইন্তেকাল করেন। জনৈক কবি তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায় অর্ন্তগত خاک مصلیএই শব্দদ্বয় দ্বারা নির্দেশিত সাংকেতিক সংখ্যায় কবির মৃত্যুসন বর্ণনা করেছেন-

چراغ اهل معنی خواجه حافظ

که شمعی بود از نور تجلی

چو در خاک مصلی یافت منزل

بجو تاریخش از خاک مصلی

(শিরাযি[৫২] : তদেব, ভূমিকা)

"সুফিগণের প্রদীপ খাজা হাফিয

যিনি আধ্যাত্মিক আলোর একটি শিখা ছিলেন,

তখন মুসাল্লা নামক স্থানের মাটিতে স্বীয় আবাস (কবর) বানিয়েছেন,

তখন তুমি তাঁর মৃত্যু সনخاک مصلیহতে জেনে নাও ।"

উক্ত শব্দদ্বয়ের অন্তর্গত বর্ণগুলো দ্বারা নির্দেশিত সাংকেতিক সংখ্যা হচ্ছে ৭৯১ । (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃঃ ২০৩)

কবি হাফিয তাঁর জন্মভূমি শিরাযকে যেমন অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, তা আজোও মানুষের হৃদয়কে অভিভূত করে । তিনি অতি অল্প সময়ের জন্যই শিরায নগরীর বাইরে গিয়েছিলেন । তবে তাঁর সফর শুধু য়াযদ ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো বলে যে বর্ণনা রয়েছে, তা ভিত্তিহীন । কারণ কবি নিজেই তাঁর কবিতায় হযরত ইমাম আলি রিদা– এর মাযার জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মাশ্হাদে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । শিরাযে সুদর্শনাদের মনোহারিত্ব, রুকনাবাদের সুমিষ্ট পানির অনন্য যাদুকরী তৃপ্তিদায়িনী ক্ষমতা ও মুসাল্লা নামক স্থানের উদ্যান-ভ্রমণের আনন্দ তথা তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরমতার গান গাইতে কবি হাফিয কখনো ক্লান্ত হতেন না । মুসাল্লাতেই তিনি একটি সুদৃশ্য কবরে সমাহিত রয়েছেন । (তদেব, পৃঃ ২০৩)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্"সেয়ান" শিরোনামে এ সম্পর্কে হাফিযের একটি গযল অনুবাদ করেছেন:

কাল্কে হাফিয কুটীর ছেড়ে শরাবখানায় গিয়ে,

ব্রত ভেঙে মত্ত হ'ল পান-পিয়ালা পিয়ে ।

জোয়ান কালের প্রিয়তমায় দেখে স্বপন ঘোরে,

বুড়ো মাথায় প্রেমের বাতিক আবার এল জোরে ।

বুদ্ধি ধরম-নাশকারিণী পার্শী বালার লাগি,

আত্ম স্বজন ঘর সংসার হলেম সকল ত্যাগী ।

গুলের গালের আগুন পোড়ায় বুল্বুলেরি বাসা,

বাতির হাসি মুখখানি হায়! পতঙ্গ প্রাণ-নাশা ।

সকাল সাঁঝের কাঁদন আমার বিফল নাহি গেল,

ধন্য খোদা! বৃষ্টি বিন্দু মোতির দানা হ'ল ।

সাকীর আঁখি বশীকরণ মন্ত্র পড়ে কি রে!

ধ্যানের আসন পড়ল মোদের তার পিয়ালা ঘিরে ।

কাল্‌কে সুফী সভার মাঝে ভাঙ্‌লে মদের বাটী,

গেল রাতে এক চুমুকেই হ'ল সেয়ান খাঁটি ।

হাফিযেরি ঠাঁই হ'য়েছে খোদার বিরাজ-স্থানে,

দিল্ গিয়েছে দিল্‌দারেতে প্রাণ মিশেছে প্রাণে । (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, পৃ: ৩৩)

হাফিযের মৃত্যু প্রসেঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন-

"মৌলানা হাফিয মুহম্মদ আস্‌লাম জয়রাজপুরী লিখিয়াছেন, অনুমান চান্দ্র ৭৬ বৎসর বয়সে ৭৯১হিজরী (১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) সনে ১৭ ই যিল্‌হজ্জ সোমবার দিন তাঁহার আত্মা প্রিয়তমের অমরধামে মহাপ্রস্থান করেন । মৌলানা গুলআন্দাম ৭৯১ হিজরী তাঁহার তিরোভাবের বৎসর বলিয়াছেন ।" (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

কিন্তু হাফিযের উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কবিতা হতে তাঁর মৃত্যু সন ৭৯২ হিজরী পাওয়া যায়-

بسال ذال و صاد و حرف اول

ز دور هجرت میمون احمد

بسوی جنت اعلی روان شد

فرید عهد شمس الدین محمد

بخاک پاک او چون بر گذشتم

نگه کردم صفا و نور مرقد

(শিরাযী[৫২] : তদেব, ভূমিকা)

"আব্‌জাদ হিসাবে বে (২), সাদ (৯০) এবং যাল (৭০০) সালে

আহমদের (দঃ) শুভ হিজ্‌রতের সনে,

উচ্চতম স্বর্গের দিকে যাত্রা করিলেন

যুগের অদ্বিতীয় শম্‌সুদ্দিন মুহম্মদ ।

যখন তাঁহার পবিত্র ধূলি অতিক্রম করিলাম,

তখন তাঁহার সমাধির শুভ্রতা ও জ্যোতি লক্ষ্য করিলাম ।" (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মহাকবি হাফিয শিরাযি ৭৯১ অথবা ৭৯২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন ।

হাফিযের কবিতায় এমন সব প্রতীক ও ব্যাখ্যা রয়েছে যে, এক শ্রেণীর মুসলমানরা তাকে 'রহস্যময় ভাষা' বলে অভিহিত করেন। তাই হাফিয বর্ণিত প্রেমকে তারা জৈব-ক্ষুধার নিবৃত্তি বলে উল্লেখকরতেও ভুল করেন নি। ফলে হাফিযের মৃত্যুর পর তার জানাযা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং ধর্মপ্রাণ শরীয়তপন্থী মুসলমানরা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বিনা জানাযায় দাফন করার পক্ষে রায় দেয় । কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্ত আর আত্মীয়-স্বজনরা এক সুন্দর উপায়ে এই বির্তকের সমাধান করেন। তারা টুকরো টুকরো কাগজে হাফিযের গযল লিখে একটি পাত্রে জমা করে একজন মাসুম শিশুকে তার মধ্য থেকে একটি উঠিয়ে আনতে বললেন। বলা ছিল, যে ধরনের গযল উঠে আসবে সেই গযলের অর্থ অনুসারেই তাঁকে দাফন করা হবে। এতে ইমাম রাজী হলেন । সেই মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশু পাত্র থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিতেই তার মধ্যে উঠে এলো-

"হাফিযের লাশ দেখে পিছিও না তোমরা ভাই সবে,

পাপে-পঙ্কে ডুবে থেকে হাফিয বেহেস্তে কিন্তু রবে।" (সাত্তার[৫৩] : ১৯৮৭, পৃ: ৬২)

অতঃপর বিশেষ সম্মানের সাথে হাফিযের লাশ শিরাযের নিকটবর্তী মুসল্লায় দাফন করা হয়।

হাফিয নিজের সম্বন্ধে বলে গেছেন-

"আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশিস্ তুমি

এ গোর হবে ধর্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি।"

আজ সত্যিই হাফিযের কবর নিখিল-প্রেমিকের তীর্থভূমি হয়ে উঠেছে। (উইকিপিডিয়া)

তৃতীয় অধ্যায়

হাফিযের অধ্যাত্মপ্রেম

এই অধ্যায়টি শুরু করার পূর্বে আমাদের গযল সম্পর্কে খানিকটা ধারণা থাকা জরুরী। কারণ হাফিযের বিশ্বজোড়া যে খ্যাতি তা আধ্যাত্মিক গযল-গীতি রচনার জন্যই। সেই অধ্যাত্মের মধ্যে লীন হয়েছে তাঁর প্রেমিক সত্তা। গযল অর্থ গান, সংগীতের ছন্দে রচিত প্রেমের কবিতা। কখনো কখনো ঐ প্রকার ছন্দে রচিত প্রেমের আবেদনমূলক কবিতা। গযল শব্দটি আরবি হলেও ফারসি, তুর্কি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে এসকল ভাষায় এটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেইপ যে 'সূতাকাটা' অর্থবোধক মূল ধাতু 'গাযাল' (غزل) থেকেই গযল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তিবুল্লাস(Tibullus) বলেছেন,'গযল হচ্ছে সূতা কাটায় রত কোন রমণীর কণ্ঠনিসৃত গান', এটি সত্য নয় । প্রায় অচল ইংরেজী শব্দ 'Gallant'শব্দের মতো'গযল' শব্দ দ্বারা বৈচিত্র্যময় ভাব মনের মাঝে জেগে ওঠে, যা দ্বারা ছলনাময় প্রেম নিবেদন, কোনো রমণীররূপ-গুণের প্রশংসা, তার উদাসীনতার অনুযোগ এবং প্রেমিকের দিক হতে নারীসুলভ হতাশার বর্ণনা ইত্যাদি ভাব ফুটে ওঠে । অনেক আগে 'আল-আখতাল' গ্রন্থে 'গযল' শব্দটি 'সুখ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৪] : ১০ম খন্ড, ১৯৯১, পৃ: ২৫২)ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন-

> "গযলের আভিধানিক অর্থ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমব্যঞ্জক বাক্যালাপ ও কার্য্যকলাপ। কিন্তু পারস্য সাহিত্যে এক বিশেষ প্রকারের ভাব ও মিলযুক্ত কবিতার নাম গযল। রুবাই কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দ ভিন্ন হযজ, রমল প্রভৃতি সাধারণ পারসী ছন্দ গযল কবিতায় ব্যবহৃত হয়"। (শহীদুল্লাহ : ১৯৫৯, ভূমিকা)

এ সর্ম্পকে *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে (তামীমদারী[২১] : ২০০৭, পৃ: ১৭২)এসেছে-

> "আরবী ভাষায় 'গাযাল' মানে নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করা এবং নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের রূপ-গুণের বর্ণনা। পরিভাষায় 'গযল' হচ্ছে কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট রীতি। তাতে সমছন্দের কয়েকটি পঙক্তি (সাধারণত সাতটি) থাকে, পঙক্তিসমূহের সবগুলো দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনেরঅর্থাৎকলির সাথে একই অন্ত্যমিলের হয়ে থাকে। গযলের শেষ লাইনকে 'মাকতা' বলা হয়। তাতে সাধারণত কবি নিজের সাহিত্যে নাম উল্লেখ করে থাকেন। পরিভাষায় একে 'তাখাল্লুস' বলা হয়"।

অন্যত্র বলা হয়েছে গযলগীতি উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত এক ধরনের ক্ষুদ্র গীত। আমির খসরু এ গানের স্রষ্টা ও প্রচারক। তিনি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজিকে প্রতিরাতে একটি করে গযল শোনাতেন। গযল 'কাব্য-সঙ্গীত' নামেও পরিচিত। গযলের পরিভাষায় আরো বলা হয়েছে, তারুণ্যের পরিস্থিতি বর্ণনা করা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে সংর্সগ, ভালবাসার চর্চা কিংবা রমণীর সঙ্গে বাক্যালাপ করা। গযলকে 'প্রণয়-সঙ্গীত'ও বলা যায়। গযলগানের কলিগুলোর অর্থ প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক। প্রেম যখন পুরুষ বা নারীর প্রতি নিবেদিত হয় তখন সে গযল মানব-প্রেম বা পার্থিব-প্রেম, আবার প্রেম যখন স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তখন তা হয় আধ্যাত্মিক প্রেম। তাই গযলগীতি এক ধরনের 'ভাব-সঙ্গীত' বলেও পরিচিত। আবার গযলের আরেকটি রূপ হচ্ছে আবৃত্তি আকারে গযল পরিবেশন। (উইকিপিডিয়া)

فرهنگ اصطلاحات ادبی গ্রন্থে (দা'দ[২৩] : ১৩৮২ শামসি, পৃ: ৩৫০-৩৫১) গযল সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

غزل در لغت عرب «به معانی مختلف اما متشابه، سخن گفتن با زنان و عشق بازی و حکایت کردن از جوانی و محبت و ورزیدن و وصف زنان به کار رفته است». اما در زبان فارسی اصطلاح غزل بر اشعار غنایی (شعر غنائی) به چند معنی اطلاق شده است:

১. غزل به معنی مقطعات چند بیتی (بیت) فارسی که ملحون بوده است.
২. غزل به معنی تغزل
৩. غزل به معنی شعر عاشقانه
৪. غزل به معنی مصطلح

ব্রাউন (ব্রাউন[৭৭] : ২য় খন্ড, ১৯২৯, পৃ: ২৭) বলেন :

> "Wherein the same rhyme runs through the whole poem,and comes at the end of each bayt, while the two half-verses composing the bayt do not, as a rule, rhyme together, save in the matla, or opening verse of the poem.The two most important verse-forms included in this class are the ghazal, or ode, and the qasida,or elegy."

গযলে যেসব বক্তব্য ধরা পড়ে তা অনেকটা এরূপঃ

১.একজন আরেকজনের কাছে নিজেকে হেয় করে অন্যকে বড় করে তুলে ধরে ।

২.বাঞ্চিত মানুষটিকে আয়ত্তে না পেয়ে নিজের জীবনকে ভৎর্সনা করে ।

৩.প্রিয়জনের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়ে ।

৪.প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করে ।

৫.আনন্দে বা দুঃখে মদ্যপানে নিমজ্জিত হয় ।

৬.প্রেমে অন্ধহয়ে উন্মত্ত অবস্থায় পতিতহয় ।

৭.প্রেমাস্পদের স্তুতিতে বিভোর হয়ে পড়ে ।

এগুলো হলো পার্থিব প্রেমের উপকরণ । অপরদিকে আল্লাহ্-প্রেমের প্রকাশও ঘটে গযলে । ঈশ্বরের কাছে মান-অভিমান, ঈর্ষা-ঈপ্সা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যাদি মূর্ত হয়ে ওঠে গযলে । (উইকিপিডিয়া) ড. আহ্মাদ তামীমদারীর উদ্ধৃতিতে *Sayr-I Ghazal dar shi'r-I Farsi* গ্রন্থের লেখক ফারসি গযলের নিম্নোক্ত চারটি অর্থকে বিবেচনায় নিয়েছেন-

a.Ghazal,which connotes multi-couplet and melodic Persian poetry, fragments. This genre of ghazal in the beginning was apparently confined to quatrain rhythm. This limitation was removed afterwards.This genre of ghazal was in practice until the end of the 11^{th} century.

b.Ghazal that connotes the lyricism of qasidas. This genre was in vogue until the 15^{th} and 16^{th}centuries.

c.Ghazal as absolutely romantic poetry.

d.Ghazal in the common sense of the word. (তামীমদারী[৮১] : ২০০২, পৃ: ১৬৯)

গযল শব্দটি যে সকল ভাব ও অর্থ প্রকাশ করে, ক্রিয়া বিশেষ্য 'তাশবিব' ও ক্রিয়াপদ 'শাবাব'ও ঐ সকল অর্থ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে 'শাবাব' শব্দটি গযল ও নাসিব শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইবন দুরায়দ এর মতে,'নাসিব' শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হতো। তবে এর উৎপত্তির ইতিহাস অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আগে সম্ভবত এটি কোনোও রমণীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'উৎর্সগমূলক কবিতা'-র অর্থই বর্ণনা করতো। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৪] : তদেব, পৃ: ২৫৩)গযলের বিষয়বস্তু হচ্ছে সাধারণত প্রেমাস্পদের রূপ ও সৌন্দর্য, তার প্রতি অবহেলা, অনাদর, কথা না রাখা, নির্দয়তার বর্ণনা এবং প্রেমিকের বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা ও দুঃখের বিবরণ। (তামীমদারী[২১] : ২০০৭, পৃ: ১৭২)যদিও একটি গযলে মিলন, বিরহ প্রভৃতি একটি মূল বিষয় থাকে, প্রত্যেক বয়েতে একটি সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত হয়। কতগুলো উৎকৃষ্ট মুক্তা নিয়ে যেমন একটি সুন্দর হার গঠিত হয় তেমনি কতগুলো চমৎকার দ্বিপদী কবিতা নিয়ে একটি গযল রচিত হয়। গযলের সমষ্টি নিয়ে 'দিভা'ন' গ্রন্থ গঠিত হয়। ফারসি সাহিত্যে গযলের স্রষ্টা অন্ধ কবি রুদাকি সামারকান্দি। শেখ সাদি গযলের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাদের গযলকে প্রথম প্রকারের গযল বলা হয় । খাজা হাফিয দ্বিতীয় প্রকারের গযল প্রচলিত করেন। বাবা ফা'গানি তৃতীয় প্রকারের গযল উদ্ভাবন করেন। মীর্যা মুহাম্মদ আলী সায়িব তাব্‌রিযি চর্তুথ প্রকারের গযল সৃষ্টি করেন। ফারসি হতে গযল তুর্কি, উর্দু ও সিন্ধী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হয়েছে। (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

গযলের বিষয়বস্তু সর্ম্পকেhttpps:/books.google.com-এ বলা হয়েছে-

> "The subject of Ghazal is always the narrative of the beauty,frivolity and cruelty of the beloved and the saga of separation and painstaking of the lover."

গযলের উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা পেশ করা হয়েছে :

ক. আরবি কাসিদার তাশবিব অথবা নাসিব হতে গযলের উৎপত্তি হয়েছে । এ ধারণা অনুযায়ী তাশ্‌বিব বা নাসিবকে প্রথমে এদের মূল বিষয় অর্থাৎ কাসিদা হতে পৃথক করা হয় এবং পরে এটি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বিকাশ লাভ করে।

খ. আরবি কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হবার পূর্বেই পারস্যদেশীয় লোকগীতি হতে গযলের উৎপত্তি হয়।

গ.সাধারণভাবে প্রচলিত গযল হতে আংগিক বা প্রয়োগিক(technical)গযল পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

শেষোক্ত শ্রেণীর গযল শেখ সাদির(৭ম/ ১৩শ শতাব্দী) রচনায় পূর্ণতা পেয়েছে এবং প্রথমোক্ত শ্রেণীর গযল শোক-কবিতা হতে বিকশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আরবি প্রভাবাধীন রাজদরবারে এর পরিমার্জনা সম্পন্ন হয়। উল্লেখিত প্রতিটি ধারণাতেই আংশিক সত্য নিহিত রয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৪] : তদেব, পৃ: ২৬০-২৬১)ফারসি গযলের বিকাশের ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি কালে বিভক্ত করা যায়-

প্রথমযুগ: অনুদঘাটিত উৎপত্তিকাল (৩য়/৯ম এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দী)- এই কালের কবিতাগুলো ক্ষুদ্র কিছু খন্ড আকারেই আমরা পেয়েছি যা কাসিদার নাসিব হতে ভিন্ন নয়। প্রয়োগিক গযলের অনেক উপাদানই অনুপস্থিত ছিলো। রচনার ক্ষেত্রে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের মধ্যে একটা মিল ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে সৌন্দর্যময় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গযল রচিত হতো। রুদাকি এবং দাকিকি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

দ্বিতীয় যুগ: গঠনমুলক যুগ (৪র্থ/ ১০ম হতে ৭ম/১৩শ শতাব্দী)- এ যুগে গযলের মৌলিক কাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান সংযোজিত হয়। এ উপাদানটি হলো আত্মিক অভিজ্ঞতা। এ যুগের শেষেরদিকে ক্লাসিক্যাল গযল পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় । ফরিদউদ্দিন আত্তার এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।

তৃতীয় যুগ:ক্লাসিক্যাল গযলের যুগ (৭ম/১৩শ হতে ১০ম/১৬শ শতাব্দী)- এযুগেই গযল সবগুলো টেকনিক্যাল উপাদানসহ এর গঠন ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্তমান অবয়ব লাভ করে। সাদি এবং হাফিয এ যুগের সর্বাধিক বিখ্যাত গযল রচয়িতা।

চর্তুথ যুগ: তথাকথিত ভারতীয় রীতির যুগ (১০ম/১৬শ হতে ১২শ/১৮শ শতাব্দী)- এ যুগে গযল অনেকটাই দার্শনিকতা চর্চার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ সময়ে গযলে নতুন করে অর্থের মিল বা সংগতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। গযলের স্বীকৃত প্রতীকসমূহের (যেমন- মা'শুক, মাম্‌দূহ, মা'বুদ প্রভৃতি) পরিবর্তে লেখকের নিজের মনই নায়ক হয়ে উঠে। এ যুগে প্রাচীন বহু প্রতীকসমূহের কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক রূপের সৃষ্টি করা হয়। সা'য়েব তাবরিযি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গযল রচয়িতা। পঞ্চম ও সর্বশেষ যুগটিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ইরানে ক্লাসিক্যাল গযলের পূর্বের গযলগুলো পুনঃ প্রচলন করার প্রবণতার পর এগুলোকে অত্যাধুনিক এবং নৈতিকতাবর্জিত উদ্দেশ্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

গযল স্বভাবতই প্রেমের কবিতা। যে কোন ধরনের গযল তা আধ্যাত্মিক মরমী হোক বা তার থেকে ভিন্ন হোক, তাতে প্রতিশ্রুতিশীল মানুষের সূক্ষ্মতম আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কবি এমন পদ্ধতি, রীতি কিংবা শব্দমালা ব্যবহার করতে পারেননা, যা কবিতাকে হালকা করে দেয়। অথচ এ কাজটি কাসিদাও মসনবি কাব্যে সহজে করা যায়। যেমন- শেখ সাদি 'বুস্তান'-এ যে উদারতা দেখিয়েছেন, তাঁর গযল-কাব্যে তা দেখাতে পারেননি। এ হচ্ছে গযলের ভাষার প্রকৃতি। যে কোন কবিই গযলে কতক সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে বাধ্য। (নিউজলেটার[৩১] : ২০১০, পৃ: ১২)

গঠনের দিক থেকে গযল এক প্রকারের কবিতা, যার প্রথম মেসরা (ছত্র) ও পরবর্তী সকল শ্লোকের একই অন্ত্যমিল থাকবে। গযলের চরণ সংখ্যা ৭ থেকে ১৩টি বলে জানা যায়। অর্থের দিক থেকে গযল এক ধরনের কবিতা যার মাধ্যমে উৎসব-পার্বণে কবি তার অনুভূতি ও মনের অবস্থা বর্ণনা করেন। বিশেষ করে এতে প্রেম ও প্রেমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় বিষয় তুলে ধরা হয়। গযল রচনাকারী কবিগণ যে অনুভূতি তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, সেটাই তাঁরা চান অন্যদের কাছে বিনিময় করতে বা পৌঁছিয়ে দিতে। আর এ পদ্ধতিতেই পাঠকের হৃদয়ে একটি পথ তৈরী হয়। গযল বর্ণনার পদ্ধতিটা এমন যে, তার বিষয় এবম্বিধ বস্তুটা অর্ধেক প্রকাশ পায়। এ ধরনের কবিতায় এমন সব শব্দ রয়েছে যা সূক্ষ্ম, নমনীয়, মোলায়েম ও সুমধুর সুর এবং শ্রোতাদের কর্ণে এর এক ব্যঞ্জনাময় প্রভাব পড়ে । শ্রোতাদেরকে ধরে রাখা হয় যাতে তারা কবিতায় বর্ণিত ভাব-কল্পনাগুলো উপলব্ধি করতে পারে এবং এর সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে বুঝতে সক্ষম হয়।(সিরাজী[৫৫] : ২০০৪, পৃ: ১৩৬)

হাফিযের দিভা'ন

হাফিযের কবিতা সংগ্রহের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর জনৈক ভক্ত সাইয়্যেদ করিম আনোয়ার সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করে 'দিভা'ন-ই-হাফিয' নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন এবং এতে পাঁচশত নিরানব্বইটি কবিতা রয়েছে। কবিতাসমূহ বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক। তবে অধিকাংশ কাবিতাই আধ্যাত্মিকভাব সম্পন্ন এবং সুফিদর্শন সম্বলিত। হাফিযের অধ্যাত্মপ্রেম দর্শন নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হলে প্রথমেই যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলোঅধ্যাত্মবাদ দু'প্রকার। যেমন-

১.ব্যবহারিক অধ্যাত্মবাদ:

ব্যবহারিক অধ্যাত্মবাদ হলো মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ পরিক্রমা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ। অন্য কথায় এটি হচ্ছে স্রষ্টার দিকে মানুষের পরিভ্রমণের বিবিধ অবস্থা ও পর্যায়ের বিবরণযাকে সাধকগণ 'জাগরণ অবস্থা' বলে থাকেন। স্রষ্টার সাথে মিলনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধকের দৃষ্টিতে প্রকৃত তাওহিদ স্রষ্টার সাথে মিলন ব্যতীত

অর্জন হয়না ।একে পশ্চিমারাও মাঝে মধ্যে অন্তরজাত অভিজ্ঞতাসমূহ বলে অভিহিত করে থাকেন । ব্যবহারিক অধ্যাত্মবাদ হলো মানুষ

ও মানব পরিচিতির বিষয়, পবিত্র কোরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় (لقاء الله) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে মিলন, কোথেকেকোথায়!পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

يا ايها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه-

অর্থাৎ ঃ হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। (ইনশিকাক: ৬)(দ্রষ্টব্য : মোতাহ্‌হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ১১-১৩)

২.তাত্ত্বিক অধ্যাত্মবাদ

তাত্ত্বিক অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিশ্বদর্শন । সেই দর্শন যা আ'রেফ এবং ঐশীবাদী বিশ্ব-জগত ও অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে । আ'রেফগণ এক বিশেষ বিশ্ব দর্শনের অধিকারী যা অন্যান্য বিশ্বদর্শন থেকে ভিন্ন । এটা হলো আল্লাহ্‌, জগত, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণ এবং মানব সম্পর্কিত দর্শন-চিন্তা । তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তত্ত্ব উপস্থাপন প্রকৃতপক্ষে এরকম, আ'রেফের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ কিভাবে গুণ-বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং পরিচিত হন তার বিবরণ । ইসলামের তাত্ত্বিক অধ্যাত্মবাদের জনক হলেন মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি । তিনি ইসলামের প্রথম সারির আ'রেফবৃন্দের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারাগুলোকে সুসংঘবদ্ধ করে অধ্যাত্মবাদকে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনরূপে দাঁড় করাতে সক্ষম হন । (মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১৩-১৪)

হাফিয তাঁর রচনাবলী সংকলনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন । বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর একজন বন্ধু গোল আন্দাম কবির কাব্যসমূহ সংকলন করেন এবং একটি মুখবন্ধ লিখেন । ফারসি ভাষা ব্যবহৃত অঞ্চলসমূহে যেমন- ইরান, আফগানিস্তান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রজাতন্ত্রগুলো, পাকিস্তানের অংশবিশেষ, ভারত, ইরাক, তুরস্ক এবং পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন অঞ্চল প্রভৃতি জায়গায় তিনি সাধারণত একজন বড় মাপের কবি হিসেবে স্বীকৃত । তাঁর কবিতাগুলো ঐশী অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত । (নিউজলেটার[৩০] : ২০০৯, পৃ: ৬৩)তাঁর দিভা'ন সম্পর্কে হরেন্দ্র চন্দ্র পাল তাঁর *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে (পাল[৩৪] : ১৩৬০ বাংলা, পৃ: ১২৮) বলেন-

> "যদিও হাফিযের দীবান (কাব্যগ্রন্থ)- এ মস্‌নবী, ক্বাসীদা, রুবায়ি প্রভৃতি কবিতার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়, তবুও হাফিজ ঘজল (বা প্রেমগীতি) লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং গজল কবিতায় তাঁহাকে ফারসি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে । মধুর ছন্দে ও সুললিত ভাষায় তিনি তাঁহার ঘজল্‌সমূহে সুফীতত্ত্বই বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার কবিতার মধ্যে বসন্ত, গোলাপ, বুলবুল, মদ, যৌবন, সৌন্দর্য ইত্যাদি এবং বিশেষ করিয়া প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের রূপ ও তাঁহার গুণ বা দোষের বর্ণনা রহিয়াছে । কিন্তু তাঁহার এই সকল বর্ণনা রূপকভাবে খোদার প্রতি প্রেম-ভক্তিবা ইশ্‌ক্ব ও ইবাদাতের অপূর্ব কাহিনীমাত্র । সুফীদের ধর্ম সার্বজনীন । ইহাদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-ভেদে কোন গোঁড়ামীর ভাব নাই । হাফিজও সেই ভাবেই গাহিয়া গিয়াছেন-
>
> > "এই ৭২ জাতের সাম্প্রদায়িকতা উপেক্ষা কর, কারণ তাহারা
> >
> > সত্যকে জানিতে পারে নাই বলিয়াই মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে ।"

যদিও হাফিযের কবিতাগুলো শ্রেণীভেদ- অগ্রাহ্য তবুও মোটামুটিভাবে চার ধরনের বলে ধরে নেয়া যায়-

১.লিরিক্‌স- এ ধারার কবিতা মানবীয় ভালবাসা এবং বস্তুগত অর্থে 'শরাব' কেন্দ্রিক ভাবধারাসমৃদ্ধ ।

২.ওডস্- এসব কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক প্রেমবিষয়ক, যেগুলোতে শরাব, গোলাপ, প্রেমিক ইত্যাদি শব্দ প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.এ ধরনের কবিতায় হাফিয একটি ভাব, চিত্রকল্প বা পরোক্ষ উদ্ধৃতি থেকে অন্যটিতে ত্বরিত স্থানান্তর ঘটিয়েছেন। এ ধারার কবিতায় বহুমাত্রিক ভাব এবং বিলাসী কল্পনার অস্তিত্ব ফুটে ওঠে।

৪.সব শেষের ধারায় রয়েছে এমন সব কবিতা যাতে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর কথা তুলনামূলকভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। কবির জীবনেরও বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে এগুলোর মিল রয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনেরও বিশেষ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। কিছু কবিতা প্রশংসামূলক যেগুলোতে মহান ব্যক্তিত্ব বা রাজার গুণকীর্তন করা হয়েছে। (নিউজলেটার[৩০] : ২০০৯, পৃ: ৬৩)

হাফিযকে জানার দুটো উপায় রয়েছে। একটি হলো ইতিহাস। হাফিযের সমকালীন ইতিহাসে এবং তৎকালীন মানুষের ভাষ্যে তাঁর অবস্থান কেমন ছিলো। আর দ্বিতীয়টি হলো তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ব্যক্তিকে তাঁর কথার মাঝেই চেনা যায়। যেমন- হযরত আলি(রাঃ)বলেন,'মানুষ তার কথার মধ্যেই লুক্কায়িত'। তবে একটা কথা বলা যায় যে, হাফিযের জীবন বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি দিকগুলো ইতিহাস থেকেই বেশী বোঝা যেতে পারে। আর তাঁর অধ্যাত্মবাদের চরম উৎকর্ষকে ইতিহাস বর্ণনা করতে অক্ষম।যারা হাফিযের সমসাময়িকালে কিংবা তাঁর কাছাকাছি সময়ে এসে তাঁর গুণের কথা লিখেছেন, তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তাঁরা হাফিযকে কবি উপাধিও দেননি, আ'রেফ উপাধিও দেননি। বরং যেন মনে হবে তাঁরা আসলে একজন ফকীহ্, একজন হাকিম, একজন সাহিত্যিকেরই প্রশংসা তুলে ধরেছেন। মরহুম কাযভিনি বলেন, হাফিযের সমসাময়িককালের একজন লোক বলেন, ৭৯২ হিজরী সনে তার ইন্তেকালের পর আমরা উদ্যোগী হয়ে কবিতাগুলো একত্রিত করি। হাফিযের সহপাঠী এ ব্যক্তি যখনই তাঁর নাম উল্লেখ করেন তখন তাঁকে নিম্নলিখিত শিরোনামে সম্বোধন করেন-

ذات ملک صفات، مولانا الاعظم السعید، المرحوم الشهید، مفخر العلماء، استاد نحاریر الادباء، معدن اللطایف الروحانیة،مخزن المعارف السبحانیة، شمس الملة والدین محمد الحافظ الشیرازی

অর্থাৎ ঃ "ফেরেশতা গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, মহা সৌভাগ্যবান মাওলানা, মরহুম শহীদ (আধ্যাত্মিক সাধনার পথে), আ'লেমদের গৌরব, সাহিত্যিকদের শিরোমণি, আত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়াদির খনি, ঐশ্বরিক জ্ঞান-শিক্ষার ভান্ডার, মিল্লাত ও দ্বীনের সূর্যসম, মুহাম্মদ হাফিয শিরাযি।" (দ্রষ্টব্য : মোতাহ্হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ২৪) এর মধ্যে কোনো'আ'রেফ' শিরোনাম নেই, কোনো 'কবি' শিরোনামও নেই। পরবর্তীতে আরোও যোগ করে বলেন-

فی عالم طیب الله تربته و رفع القدس رتبته

অর্থাৎঃ "আল্লাহ্ তাঁর কবরের মাটিকে পবিত্র করুন, আর ঐশ্বরিক জগতে তাঁর স্থানকে উচ্চ করুন", যেন একজন আ'লেম ফকীহ্কে প্রশংসা করেছেন।" মরহুম কাযভিনি আরোও বলেন, দিভা'নে হাফিযের একটি পান্ডুলিপি যা এমন একজন লেখকের হাতে লেখা যা হয় হাফিযের সময়কালের খুব কাছাকাছি, না হয় তাঁর সমসাময়িক হবে, সেই পান্ডুলিপি থেকে অনুলিপিকৃত। সেই পান্ডুলিপির শেষাংশে হাফিযকে স্মরণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়-

تم دیوان المولی العالم الفاضل، ملک القراء و الفضل المتأخرین، شمس الملة والدین، مولانا محمد الحافظ روح لله روحه و اوصل فتوحه و نور مرقده-

(তদেব : পৃ: ২৫)

অর্থাৎ ঃ "সমাপ্ত হলো এ দিভা'ন, যার লেখক একজন মাওলা, আ'লেম ও ফাজেল ক্বারীদের অধিপতি, বর্তমান শেষযুগের শ্রেষ্ঠতম, জাতি ও ধর্মের সূর্য, মাওলানা মুহাম্মদ হাফিয, আল্লাহ তাঁর আত্মাকে সুরভিত করুন এবং তাঁর অন্তরকে প্রসন্ন করন আর আলোময়

করুন তাঁর কবরকে ।" তিনি আরও বলেন, খাজা হাফিযের আমলের খুব নিকটবর্তী কিংবা হয়তোবা খাজার সমসাময়িক এ লেখকের যে-সমস্ত উপাধি ও বন্দনা তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, যেমন– সাধকদের কেন্দ্রবিন্দু, আল্লাহ্তাত্ত্বিকদের গৌরব, আউলিয়াগণের

সঞ্চয়, আ'রেফগণের সূর্য, সন্দেহাতীত জ্ঞানের দিব্য জ্ঞানী, গায়েবী রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত ইত্যাদি, এ উপমাগুলোর কোনোটি থেকেই এটি প্রমাণিত হয়না যে, তিনি একজন সমসাময়িক যুগের খ্যাতিমান আ'রেফ তথা সুফি ছিলেন । তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে,তিনি সেসময় উলামা, গুণী ও পন্ডিতদের কাতারভূক্ত ছিলেন । অর্থাৎ তাঁর অধ্যাত্মবাদ ও সুফিবাদী দিকটির চেয়ে জ্ঞান-গুণ ও সাহিত্যের দিকটি প্রবল ছিল । কাজেই ইতিহাস বৃত্তান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, হাফিয একজন মানুষ ছিলেন সচরাচর আলেমেরবেশে । যদিও তিনি একজন উঁচু মানের আ'রেফ ছিলেন । (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ২৫)

হাফিযকে তাঁর স্বীয় দিভা'নের দিক থেকে যদি আমরা চিনতে চাই তাহলে আমরা দেখবযে, তাঁর কিছু কিছু কবিতার মধ্যে এক ধরনের বেপরোয়াভাব, উশৃঙ্খলাতা, অশ্লীলতা, সকল পাক-পবিত্র রীতি-প্রথাকে পদদলিতকরা, সবকিছুকে গণীমত জ্ঞান করা আর কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করার ভাব পরিলক্ষিত হয় । আধুনিক পরিভাষায় যাকে একজনEpicurean(বা ভোগবাদী) বলে । অপরদিকে এমন অনেক কবিতা রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে এর বিপরীত । যেখানে শুধু অধ্যাত্মবাদ এবং নীতি-নৈতিকতার কথাই বলা হয়েছে । কোনোও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও যার প্রয়োজন নেই । (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ২৮)সানায়ির মাধ্যমে শুরু গযলের পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘটে হাফিযের মাধ্যমে । তিনি অতি উচ্চতর প্রেমভিত্তিক বিষয়বস্তুকে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংমিশ্রিত করেন । সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর গযল সাধারণ মানুষের নিকট সর্বাধিক পরিচিত । এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁর পরবর্তী যুগের গযল রচয়িতাগণ তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন । (তামীমদারী[২১] : তদেব, পৃ: ১৯১) জনাব আঞ্জাভি শিরাযি বলেন, হাফিয এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি তাঁর নিজ যুগ সম্পর্কে অতীষ্ঠ ছিলেন । আর যেহেতু তিনি তৎকালীন লোকজন ও পরিবেশ সম্পর্কে বিরক্ত ছিলেন, তিনি শিল্পের তথা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেন, হাফিয যেখানে ফূর্তি ও মদ্যপানের কথা বলেছেন সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মদ্যপানই । আবার যেখানে গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা বলেছেন, সত্যিই তখন তিনি একজন উঁচুস্তরের আ'রেফছিলেন ।(দ্রষ্টব্য : মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৩৬)

হাফিযের গযল ও অন্যান্য কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে শামিল রয়েছে:

- খোদাপ্রেম
- মানুষের ভাগ্য ও অদৃষ্ট
- সৃষ্টি ও অস্তিত্ব জগতের সৌন্দর্য আলোকবর্তিতা স্বরূপ
- তরুণ ও বৃদ্ধদের বিষয়
- কপটতা ও আন্তরিকতার কথা
- যুদ্ধ ও শান্তির বক্তব্য
- আশা ও নিরাশার কথা
- কৃপণতা ও উদারতার কথা
- ভয় ও সাহসিকতার কথা
- খোদাপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার বর্ণনা
- ঈর্ষা-নিন্দা ও বন্ধুত্ব-বিশ্বস্ততার বক্তব্য
- মানবীয় ও যর্থাথ প্রভুর আইন
- প্রিয়জনের মিলন থেকে বিছিন্নতাজনিত বিরহ-ব্যথা
- সার্বিক জীবনের সৌন্দর্য ও নশ্বরতার কথা

- প্রেমিককে হারানোর শোক
- সব সুযোগের ও সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা
- সত্য আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যহীনতার ও হৃদয়বৃত্তির মূল্যের কথা

নিজের উদ্দেশ্যে হাসতে পারার জ্ঞান এবং নিজের ও অন্যদের প্রতি সৎ হবার পরামর্শ

- খোদাকে ভালবাসার প্রতি অত্যধিক গুরুদানের কথা
- একজন পরিপূর্ণ প্রভু হিসেবে খোদা এবং তাঁর সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বৈশিষ্ট্য ও তাঁর প্রশংসা
- নীরবতার গুরুত্ব
- প্রার্থনা ও প্রেমিককে অব্যাহতভাবে স্মরণ করার কথা
- অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের বাহ্যিক প্রতারণা এবং অসাম্প্রদায়িকতার বক্তব্য ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অর্থহীন প্রলাপকারী কপট ধর্মগুরু, মিথ্যাপ্রভু ও বিচারক, নিষ্ঠুর শাসক ও তাদের কুটিল পার্শ্বচরদের কঠোর সমালোচনা করেন।(নিউজলেটার[২৮] : ২০০৩, পৃ: ৪০)

হাফিযের কবিতা সম্পর্কে জোয়েল ওয়াইজ লাল (লাল[৮০] : পৃ: ১৫৯) বলেন-

> "The beauty of the poetry of Hafiz is in its naturalness and spontancity. It is the outcome of a fervent soul and lofly genius who felt the flow of life in his veins, and found an intense delight in nature. The wonder and strangeness of the outer world, the mystery of every day life, the magic of creation, the silence of the gleaming stars and the unspeakable glories of light and colour moved his heart and soul, and filled his whole being with joy and ecstasy."

আধ্যাত্মিকতায় হাফিযের আসন ছিল সুউচ্চ। ব্যবহারিক এরফান বা আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনা, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ, ইরানের সনাতন প্রেমসিক্ত আধ্যাত্মিকতা এবং মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির যুক্তিসমৃদ্ধ তাসাউফ শাস্ত্রে হাফিযের পারদর্শিতার চিত্র 'দিভা'ন-ই-হাফিয'-এর সর্বত্র পরিস্ফূট। ফারসি সাহিত্যে হাফিয যেসব আধ্যাত্মিক উপমা ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, তা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। মাওলানা আব্দুর রহমান জামির ভাষায় 'দিভা'ন-ই-হাফিয'-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ দিভা'ন দ্বিতীয়টি নেই। (শাহেদী[৪৯] : ১৯৯০, পৃ: ৬২)

হাফিয তথা ইরানী কবিদের কাব্যশৈলী ও কাব্যরচনার একটি ধারা হচ্ছে এই যে, তাঁরা অবলীলাক্রমে তাঁদের কাব্যে- এশ্ক (প্রেম/ প্রীতি), সা'কি(পেয়ালাবাহক), শরা'ব (সুরা), মেই খা'নেহ (পানশালা), সা'লেক (প্রেমিক/শিষ্য/ আধ্যাত্মিক সাধক), মেই (মদিরা), বুত (মূর্তি), না'য (লাজুকতা/ অনুরাগ), বা'দেহ (পুরানো সুরা), লা'ব (ঠোঁট), জুলফ্(বেণী/ অলকদাম), খা'ল (তিল), জা'ম(পেয়ালা),মেইকাদেহ্(শুঁড়িখানা), বুতকাদেহ্ (মূর্তি মন্দির/বেদী), বুলবুল (বুলবুল), লা'লেহ (টিউলিপ), আশ্ক (অশ্রু), সার্ব (দেবদারু), আ'শেক (প্রেমিক), মা'শুক (প্রেমাস্পদ বা আরাধ্য), পীর (গুরু) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। উল্লেখিত শব্দগুলো তাঁরা নিছক বাহ্য অর্থে ব্যবহার করেননি, বরং রূপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাই বলা যায় যে, এশ্ক মানে অধ্যাত্মপ্রেম,যে প্রেম কারো অন্তরে জাগ্রত হলে ব্যক্তিকে উন্মত্ত ও মাতাল করে দেয় এবং তাকে ফানাফিল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার তাগাদা দেয়।

সাকি অর্থাৎ যিনি শরাব পান করান। কাব্যে এর অর্ন্তনিহিত অর্থ হচ্ছে যিনি সে ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, গুরু বা সালেক। শরা'ব দ্বারা তাঁরা বোঝান আল্লাহ্র প্রেম, যা মদিরার মতোই মানুষকে উন্মত্ত করে থাকে। মেইখা'নে অর্থাৎ ইবাদতের স্থান তথা ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা নিকেতন। সা'লেক শব্দটি গুরু বা পীর অর্থে সুফি কবিরা ব্যাবহার করে থাকেন। বুত দ্বারা মনের মাঝে বিরাজমান প্রতিমাকে বোঝানো হয়ে থাকে। না'য অর্থাৎ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার রাগ-অনুরাগ। বা'দেহ অর্থাৎ বাসী বা এমন পুরানো পানীয় বা

শরা'ব যা পানে তীব্র মাদকতা সৃষ্টি হয়। অধ্যাত্মবাদের পরিভাষায় বা'দেহ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও প্রেম দ্বারা আল্লাহ্‌ও পথের প্রেমিককে নিষিক্ত করে থাকে। লা'ব মানে খোদায়ী নৈকট্য।পীর ও মুর্শিদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার পরম সান্নিধ্য

লাভের পথে যিনি নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। অর্থ্যাৎ দ্বীাগুরু। জুলফ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে পাবার যোগসূত্র ঘটায় যে জিনিস। খা'ল শব্দটি খোদায়ী নূরের আকর্ষণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জা'ম মানে অন্তকরণ যা এই খোদায়ী প্রেমকে ধারণ করে থাকে। মেই অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগ। মেইকাদেহ্ ইহজগতের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন সেই সুমহান খোদায়ী জগত, যেখানে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় বান্দাগণ তাঁর সাক্ষাতে হাজির হন। বুতকাদেহ্ সুফিদের ভাষায় ঐশ্বরিকজগত বা উর্ধ্বলোককে বোঝানো হয়। লা'লে শব্দটি সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েথাকে। আশ্‌ক অর্থ্যাৎ প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের অশ্রুপাত ও বেদনা। মানবাত্মা ও পরমাত্মাকে বোঝানোর জন্য রূপক অর্থে সুফি কবিরা আ'শেক ও মা'শুক শব্দদ্বয় ব্যবহার করে থাকেন। সার্ব শব্দটি পয়গম্বর এবং ওলি-আউলিয়াদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃতহয়। (সিরাজী[৫৫] : ২০০৪, পৃ: ১২৬-১২৭) ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হাফিযের কবিতার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ নিয়ে তর্ক হয়। সেখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত *দীওআন-ই হাফিয* গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) উল্লেখিত বিখ্যাত বহু ভাষাবিদ স্যার উইলিয়াম জোন্‌স বলেন:

> "It has been made a question whether the poems of Hafiz must be taken in a literal sense or a fifurative sense; but question does not admit of a general and direct answer, for even the most enthusiastic of his commentators allow that some of them are to be taken literally, and his editors ought to have distinguished them. After his juvenile passions had subsided, we may suppose his mind took that religious bent which appears in most of his compositions, for there can be no doubt that many distichs in different odes relate to the mystical thelogy of the Sufis."

অর্থাৎ: হাফিযের কবিতা আক্ষরিকভাবে কিংবা রূপকভাবে লওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু ইহার সাধারণ সোজা উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ তাঁহার টীকাকারগণের মধ্যে অত্যন্ত অনুরক্তগণ পর্যন্ত কতকগুলি কবিতাকে যে আক্ষরিকভাবে লওয়া উচিত তা স্বীকার করেছেন। তাঁর সম্পাদকগণের কর্তব্য ছিল এই গুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়া। আমরা ইহা মনে করিতে পারি যে তাঁর যৌবনের প্রবৃত্তি শান্ত হলে তাঁর মন ধর্ম্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিল, ইহা তাঁহার অধিকাংশ রচনায় দৃষ্ট হয়; কারণ ইহা নিঃসন্দেহ যে তাঁহার বিভিন্ন কবিতার বহু শ্লোকে সূফীদিগের মরমী ধর্ম্মতত্ত্বের উল্লেখ আছে।

যেমন হাফিয একটি গযলে বলেন-

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که عشق کوه و بیابان تو داده ای ما را

شکر فروش که عمرش دراز باد چرا

تفدی نکند طوطی شکر خارا

غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل

که پرستی نکنی عندلیب شیدا را

بخلق ولطف توان کرد صید اهل نظر

بیند و دام نگیرند مرغ دانا را

ندانم از چه سبب رنگ آشنائی نیست

سهی قدان سیه چشم ماه سیما را

چو با حبیب نشینی و باده پیمایی

به یاد دار محبان باده پیما را

رجز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب

که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

در آسمان نه عجب گربه گفته ی حافظ

سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

(شیرازی، ১৩৬৬: ص. ৫)

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৯, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ৫)

কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ গযলটি 'পিলুঁ-কাওয়ালী' নামে অনুবাদ করেন নিম্নোক্তভাবে:

ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে বলো গো সেই হরিণীরে ।

আর কতদিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে ॥

মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,

এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে ॥

গোলাব লো! তোর রূপের গরব দেয়না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,

প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে ॥

চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,

চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে ॥

বঁধুর পাশে ব'সে তোমার ঢাল্‌বে যেদিন রঙীন শারাব

স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে ॥

শেয়র্:-

সরল-তুন, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে-

রঙিন প্রেমের লাগল না রঙ কেনো গো সে রূপের ফুলে ।

তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা-

মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা!

হাফেজি এই গযল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু,

গাইবে সে গান 'জোহরা' তারা, নাচবে 'ঈশা' সে সুর মীড়ে ॥(ইসলাম[৫] : ২য় খন্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৮৫-৮৬)

হাফিযের দৃষ্টিতে সুফি-সাধক ও মরমীবাদ

'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি সর্ম্পকে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । তবে মুসলিম চিন্তাবিদেরা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এই সুফি সাধনার ইতিহাস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হতেই শুরু হয়েছিলো । 'সুফি' শব্দটি ফারসি যাকে আরবিতে 'তাসাউফ' বলে । অনেকের ধারণা 'আহল-আল-সুফ্ফা' বা 'আসহাব-ই-সুফ্ফা' শব্দটি নবী করিম (সাঃ) এর সময় মদিনার মসজিদ সংলগ্ন অবস্থানরত সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাতে ব্যবহার করা হতো । পরে তাদের থেকেই 'সুফি' শব্দটির উন্মেষ ঘটেছে । (কলিমউল্লাহ, জালাল উদ্দীন[১১] : ২০১৩, পৃ: ১৩) কেউ কেউ 'সাফ' বা সারি থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করেন । তাদের মতে সুফিরা প্রথম কাতারের মানুষ । মোল্লা জামি এবং তাঁর অনুসারীগণের মতে 'সাফা' শব্দটি থেকে 'সুফি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । 'সাফা' অর্থ পরিষ্কার বা পবিত্রতা । সুফিগণ পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী বলে এটা ধরা হয় । কারো মতে 'সুফি' শব্দটি এসেছে 'সাফি' শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে বিশুদ্ধ । সাধকগণ বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী বলে ধারণা করা হয় । (শূর[৫১] : ২০০৯, পৃ: ১৪) তবে অধিকাংশের মতে 'সুফি' শব্দটি 'সুফ' (উল বা Wool) শব্দ হতে এসেছে, যার অর্থ হলো পশম বা পশমের তৈরী জামাকাপড়, কম্বল ইত্যাদি । যারা পশমী কাপড় পরিধান করেন, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন তারাই 'সুফি' নামে অভিহিত । (রশিদ[৪২] : ১৯৮৪, পৃ: ১২)

দশম শতকের পারস্য দেশীয় ইতিহাসবিদ আবু রায়হান আলবিরুনি বলেন- 'সুফি' শব্দটি গ্রীক শব্দ সোফিয়া (Sophia) হতে এসেছে যার অর্থ প্রজ্ঞা (Wisdom) । পাশ্চাত্য পন্ডিত ড. আর. এ. নিকলসন এ মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন । তিনি বলেন, 'সুফি' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Sophist' হতে এসেছে, যার অর্থ জ্ঞান । তিনি চূড়ান্তভাবে দাবি করেন যে, Safa and Suf (Sinless-Wool dress ঃ Indicator of simple and plain living) সুফিবাদের মূল ভিত্তি যা নিরবিছিন্ন সাধনার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার সহিত মিলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে । (খান[১৪] : ২০১০, পৃ: ৯-১০)

সুফি কাকে বলে, এ বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিতগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । যেমন বিশ্ববিখ্যাত তাপস হযরত জুননুন আল মিশরি বলেন: একজন আ'রেফ সবসময়ই আল্লাহ্‌র প্রেমে মশগুল থাকেন । তাঁর মতে একজন সুফি-সাধক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি জীবনাচরণ অর্থ্যাৎ কথা ও কাজে ভিন্নতা করেন না; যার নীরবতা চারিত্রিক দৃঢ়তাকেই নির্দেশ করে এবং যিনি পার্থিব জীবনের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হন । (শূর[৫১] : তদেব, পৃ: ৩৯)

জুনায়েদ বাগদাদি বলেছেন: যিনি তার জীবনকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তিনিই সুফি ।

মহাত্মা মাত্‌বুলি বলেছেন: যিনি তার অন্তঃকরণকে সৃষ্টির আবিলতা থেকে নিষ্কলুষ রেখেছেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌প্রাপ্তির বাসনায় জনসমাজ থেকে দূরে সরে নির্জনতা অবলম্বন করেছেন তিনিই সুফি ।

প্রখ্যাত তাপস বশর হাফি (মৃত্যু-২২০ হিজরী/৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন: আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা যিনি আত্মাকে পুতঃপবিত্র রাখতে পেরেছেন তিনিই সুফি । (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৪৭২)

মহাত্মা সাহল বিন আবদুল্লাহ্ তাসতারি (মৃত্যু-২৮৩ হিজরী/৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) বলেন: যার অন্তরে সঙ্কোচবোধ ও কুটিলতা নেই, সদা সৎ চিন্তায় বিভোর, আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ও বৈষয়িক লোভ-লালসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্বর্ণ ও মৃত্তিকা যার

নিকট সমমান, সমমর্যাদা ও সমমূল্যের বলে বিবেচিত, তিনিই প্রকৃত সুফি। তিনি আরো বলেন, যিনি স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও স্বল্পকথায় অভ্যস্ত এবং জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত, তিনিই সুফি। (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ২১)

সুফির পরিচয় দিতে গিয়ে বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রহঃ) বলেন– সুফিগণ তাঁদের অন্তকরণ তাওহিদ এবং মা'রেফাতের নূর দ্বারা পবিত্র করেছেন অথবা তারা আসহাবে সুফ্ফার সাথে পবিত্র সম্পর্ক এবং হৃদ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন অথবা তাদের প্রথম নির্দশন পশমী পোষাক পরিধান করেছেন বলে তারা 'সুফি' নামে আখ্যায়িত। (চিশ্তী[১৮] : ২০০৯, পৃ: ১৪) তবে মহাকবি হাফিয সুফিদের সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি কখনোই খানকাভিত্তিক খেরকাধারী সুফিদের সর্মথন দেননি । তিনি বলেন: সুফি বা দরবেশ মানে আনুষ্ঠানিক খানকাধারী সুফি নয়। বরং আ'রেফ তিনি, যিনি অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে জানেন। কেবলমাত্র পোশমী পোষাক, সুফি শ্রেণীভুক্ত আর খানকাহ্ সুফির পরিচয় নয়। বরং একজন প্রকৃত সুফি খাপছাড়া কথাবার্তা, ভবঘুরে এবং আ'রেফদের চুক্তিভিত্তিক পারিভাষিক বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (হাদী[৭৪] : ২০১৫, পৃ: ১৪০)

শাহ্ আল তস্তরির মতে- সুফি হলেন সে ব্যক্তি যিনি সকল সমস্যা ও খারাপ কাজ হতে পবিত্র থাকেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা 'ফিকর' দ্বারা পরিপূর্ণ এবং স্বীয় জীবনকে ঐশী সত্তার নিকট উৎসর্গ করেছেন। অর্থাৎ বলা চলে, যার সব ইচ্ছা-আকাঙ্খা প্রভুর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (কলিমউল্লাহ, জালাল উদ্দীন[১১] : পৃ: ১৬) সুফিবাদ সম্পর্কে ইসলামের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন অলি-আল্লাহ্, পীর-এ কামেল, বুর্জুগ ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব হলেও এর শুরু বা কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন আল্লাহ্। তারপর তার বীজ বপন হয় হযরত আদম (আঃ) এর সময়, অঙ্কুরোদগমন হয় হযরত নুহ (আঃ) এর সময়, পত্র পল্লবিত হয় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময়, এর উন্নয়ন শুরু হয় হযরত মুসা (আঃ) এর সময়; পরিপক্কতা আসে হযরত ঈশা (আঃ) এর সময় এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়। এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "Muhammed was an enormous figure who embodied in himself multiple dimensions. Above all, he was the intermediary between God and the Quran and the three together form of complex structure of the foundation on which the Islamic religion is based."(উদ্ধৃতি : শূর[৫১] : তদেব, পৃ: ৩৬)

'সুফিবাদ'(Mystic) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দুর্বোধ্য, অতীন্দ্রিয়বাদী, মরমী, আধ্যাত্মিক গুপ্ত রহস্যমূলক, গুপ্তরহস্যপূর্ণ, গূঢ় অর্থপূর্ণ, গুপ্ত, অস্পষ্ট, বোধাতীত, লুকানো, নিগূঢ়, রহস্যময়। রক্ষণশীল প্রবক্তাগণ 'সুফিবাদ'কে 'দরবেশ' বলে আখ্যায়িত করেন। ক্লাসিক্যাল সুফি পন্ডিতগণ অধ্যাত্মবাদকে বলেছেন-

> "A science whose object is the reparation of the heart and turning it away from all else but God."

অর্থাৎঃ

> সবকিছু বর্জনপূর্বক মহান সৃষ্টিকর্তার দিকে ধাবমান হওয়া। (দ্রষ্টব্য : খান[১৪] : তদেব, পৃ: ১০)

সুফিবাদ সম্পর্কে হাফিযের ধারণা-

صوفی نـهاد دام و سر حـقـه باز کرد
بـنیاد مـکر با فـلـک حـقـه باز کرد
بازی چرخ بشـکـندش بیضـه در کـلاه
زیرا کـه عرض شعبده با اهـل راز کرد
ساقی بیا کـه شاهد رعـنای صوفیان
دیگر بـه جـلوه آمد و آغاز نـاز کرد
این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
و آهنـگ بازگشـت بـه راه حـجاز کرد
ای دل بیا کـه ما بـه پـناه خدا رویم
زان چـه آسـتین کوته و دسـت دراز کرد
صنعت مـکن که هر که محبت نـه راست باخت
عشقش بـه روی دل در معنی فراز کرد
فردا کـه پیشـگاه حـقیقت شود پدید
شرمـنده ره روی که عمـل بر مـجاز کرد
ای کبـک خوش خرام کجا می‌روی بایسـت
غره مـشو کـه گربـه زاهد نـماز کرد
حافظ مـکن مـلامـت رندان که در ازل
ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১১৪, তদেব, পৃ: ৫২)

Dervish laid a trap with slight of hands and trick of the eyes

With the help of this trickster merry-go-round mystifies.

Tricks of his fate will keep the rabbit in his hat

How can you trick those whom to secrets are wise?

Come hither wine-bearer, the Sufi’s beautiful lover

Came with full grace, and evaded their many,many tries.

O minstrel, with what tune was inspired to head for Iraq

Longingly sang to return to the Arabian Hejaz?

Come O heart, let’s commend ourselves unto the lord

Keep from rolled up sleeve that outstretched arm belies.

Undeceived, whoever lost himself in compassion

In the Spirit of Love, his soul upward flies.

In the court of the Truth, at the time of our demise

Shame on he, who permissible never defies.

৯৩

Where to now, O proud partridge, halt and pause

Your delusions, prayers of the pious cat, never ever identifies.

Hafiz, mad Dervishes upon the path, don't criticize

Freedom from false piety for eternity is our prize. (Ghazal no 133: www.hafizonlove.com)

বিভিন্ন গ্রন্থে অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। *মাবা'নি এরফান ও তাসাউফ* গ্রন্থের লেখক ড. সাইয়্যেদ জিয়াউদ্দীন সাজা'দি রুমির উদ্ধৃতিতে সুফিবাদের সংজ্ঞায় বলেন:

دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل اسپید همچون برف نیست

মৎকৃত অনুবাদ: সুফিদের দরগা জ্ঞান-গরিমা ও কথা বলার বিষয় নয়

সেখানে হৃদয়টা বরফের মতো পরিষ্কার করা ছাড়া অন্য কিছুর মূল্য নেই। (সাজা'দি[৬২]: ১৩৭২ হিজরী শামসি, পৃ: ৬)

- বাইয়াম ইবনে আহমাদ (রহঃ) বলেন- সুফিবাদ হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য বিষয় (ধর্মবহির্ভূত) থেকে স্বীয় সত্তার বিচ্ছিন্নতা ও আল্লাহ্‌র সাথে একাত্মতা।
- হযরত সুমনান (রহঃ) বলেন- সুফিবাদ হলো তুমি যেরূপ বৈষয়িক বিষয়াদি হতে বিচ্ছিন্ন থাকবে, তেমনি বৈষয়িক জিনিসও তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। এটাই প্রকৃত সুফি অনুসারীর কাজ।
- আবু মুহাম্মদ আল জারিরি (রহঃ) এর মতে- সুফিবাদ হলো কিছু 'খালকে'র সমষ্টি, যা সকল প্রকার তুচ্ছ ও নিন্দনীয় গুণের বিপরীত।
- আম্মার ইবনে উসমান আল মক্কি (রহঃ) এর মতে- সুফি অনুসারী তার 'আওলা' বা স্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করবে।
- আলী ইবনে আব্দুর রহিম আল কানাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে- সুফিবাদ হলো কিছু আধ্যাত্মিক বন্দরের সমষ্টি যাকে 'নাসরুল মাকাম' বলে। এ স্তরে মানুষ সর্বদা স্রষ্টার সাথে মিলনের প্রয়াস চালায়। (কলিমউল্লাহ, জালালউদ্দীন[১১]: তদেব, পৃ: ১৫)
- হযরত মারুফ আল-কারখি (রহঃ) বলেছেন- আল্লাহ্‌র সত্তার উপলব্ধিই তাসাউফ।
- জুনায়েদ বাগদাদি (রহঃ) বলেন- Tasawuf is that Allah should make you die from yourself and should make you live in him.
- হযরত আবু আবদুল্লাহ্ খাফিফ (রহঃ) বলেন- খোদা যাকে তাঁর প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন, তিনিই প্রকৃত সুফি।
- হযরত ইমাম গায্‌যালি (রহঃ) অধ্যাত্মবাদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ। তিনি বলেছেন- আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সবকিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে সতত আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই হলো অধ্যাত্মবাদ।
- হযরত আল- কুশাইরি (রহঃ) বলেন- জীবনের যাহিরি ও বাতিনি বিশুদ্ধতাই অধ্যাত্মাবাদ।

- হযরত আবুল হুসাইন নুরি বলেন- ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জনই সুফি দর্শনের মূল ।
- হযরত আবু মুহাম্মদ আয-যারিনির ভাষায়- সচ্চরিত্র গঠন ও সমস্ত অনিষ্টকর কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকাই অধ্যাত্মবাদ ।

হযরত আবু সাহল সালুকির মতে- সকল আপত্তিকর বিষয় থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখারই অপর নাম অধ্যাত্মবাদ ।

- শাইখুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আল-আনসারি (রহঃ) বলেন- সুফিদর্শন আত্মার সংশোধনের শিক্ষা দান করে তার নৈতিক চরিত্রকে উন্নীত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে যাহিরি ও বাতিনি দিককে গড়ে তোলে । আত্মার পবিত্রতা বিধানই এর বিষয়বস্তু এবং এর লক্ষ্য চিরন্তন শান্তি ।
- আলী আল রুদবারি বলেন- পার্থিব জীবনকে দূরে নিক্ষেপ করে আল্লাহ্‌র পছন্দীয় পূর্ণ মানবের (রাসুলুল্লাহ্‌) পথ অনুসরণ করা সুফিতত্ত্বের মূল ।
- হযরত বায়েজিদ বুস্তামি (রহঃ) বলেছেন- আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করাই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ । (রশিদ[৪২]: ১৯৮৪, পৃ: ২৪)
- মনসুর আল হাল্লাজ সুফিতত্ত্বের মাধ্যমে সর্বেশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণা সর্বপ্রথম প্রচার করেন । তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে এতোটাই নিমগ্ন থাকতেন যে, সার্বক্ষনিক জপতেন- 'আনা-আল-হক' অর্থাৎ 'আমিই সত্য বা খোদা' । এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হলো একজন সাধক যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়ে নিজের ভেতরের সমস্ত কালিমা দূর করে পুতঃপবিত্র সত্তায় পরিণত হন, তখন সব কিছুতে কেবল আল্লাহ্‌র সত্তাকেই উপলব্ধি করে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই সত্য এবং এই সত্য সর্বত্রই বিরাজমান । তিনি তাঁর 'আনা-আল-হক' ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে-

  I am He whom I love and He whom I love is I.

  We are two spirits dweling in one body,

  I thou seest me, thou seest Him,

  And if thou seest Him, thou seest' us both. (উদ্ধৃতি : শূর[৫১] : তদেব, পৃ: ৪৩)

- বিখ্যাত মনীষী আর. এ. নিকলসন তাঁর 'The Mystics of Islam' (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে উল্লেখ করেন- সুফিতত্ত্বটি ইসলামের ধর্মীয় দর্শন যা ঐশ্বরিক সত্তার অনুধাবনকে নির্দেশ করে ।
- মার্টিন লিঙ বলেন- Sufism or Tasawwuf as it is known in the Muslim world, is Islamic mysticism.
- ট্রিমিংহাম উল্লেখ করেন- There were two categories of Sufies, those associated with Khanaqahs and the wanderers. These were, in a special sense, focal points of Islam- centers of holiness, fervour, ascetic excercises, and Sufi training. (কলিমউল্লাহ, জালাল উদ্দীন[১১]: তদেব, পৃ: ১৫-১৬)
- আবু সাঈদ আবুল খায়ের বলেন- অধ্যাত্মবাদের দুটো দিক রয়েছে, একটি হলো লক্ষ্য করা, অন্যটি টিকে থাকা । তিনি আরো বলেন দরবেশগণ প্রকৃতই খুব প্রসিদ্ধ থাকেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত এমন এক জায়গায় পৌঁছান যেখানে খোদা ভিন্ন অন্য কিছু থাকেনা । (সাজা'দি[৬২] : ১৩৭২ হিজরী শামসি, পৃ: ৪)
- ডা. এস. খলিলউল্লাহ বলেন- 'একজন বিখ্যাত সাধক সুফিবাদকে একটি 'স্বাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সংক্ষিপ্তরূপে সর্বোৎকৃষ্ট সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায়, যে জ্ঞানের প্রত্যক্ষরূপ মানসিক জ্ঞান অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনীয় । (খলিলউল্লাহ[১৩]: ২০০৩, পৃ: ২৭)

সুফিগণদের আধ্যাত্মিক সাধনায় বেশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথে বেশ কয়েকটা স্তর বা মাকা'ম রয়েছে। এই স্তরগুলো

সফলভাবে পার হতে পারলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে খাঁটি সত্যে বিলীন হওয়া যায় এবং আরও এক স্তর পরে বাকায় পৌঁছানো অর্থাৎ রিপু দমন করে মহাসত্য লাভ করা যায়। আবু নাসের আল সাররাজের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যান্বেষী পথে সাতটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবর্তন বা অনুতাপ। অভাববোধ না থাকলে অভাব লাঘবের কোনো প্রচেষ্টা থাকেনা। সেজন্য অভাববোধ থাকতে হবে, অভাবের জন্য কষ্ট থাকতে হবে। কষ্ট যত বেশী হবে অভাব দূর করার তাড়নাও তত বেশী হবে। হাফিয বলেন-

"ভালবাসা দানকারীর ফুৎকার যীশুর

নিরাময়কারী নিশ্বাসের মতো সহানুভূতি-সম্পন্ন;

কিন্তু সে যদি তোমার মধ্যে কোন ব্যথার খোঁজ না পায়

তবে কিভাবে নিরাময় করবে?" (উদ্ধৃতি : খলিলউল্লাহ[১৩] : পৃ: ২৮)

অর্থাৎ আকুতি যত প্রবল হবে অনুসন্ধানও ততই প্রবল হবে। এর পরের স্তর হচ্ছে আল্লাহ্ভীতি বা ওয়ারা। বিশর হাফি ওয়ারা সর্ম্পকে বলেছেন- "যা কিছু অন্যায় তা পরিত্যাগ করা এবং হৃদয়ের ওপর সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখা"। গজনির হাকিম সানাই বলেছেন-

"যদি কোন কিছু তোমাকে অগ্রসর হওয়া থেকে পিছনে টেনে রাখে,

তা বিশ্বাস হোক কি অবিশ্বাস তাতে কি আসে যায়?

যদি কিছু তোমাকে বন্ধুর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে,

সে-রূপ সুন্দর হোক বা অসুন্দর তাতে কি আসে যায়?" (তদেব, পৃ: ২৮)

এর পরের ধাপ হলো নিরাশক্তি বা জুহুদ। এই নিরাশক্তি বাহ্যিক হলে হবে না, হৃদয়ের প্রকৃত নিরাসক্তি হতে হবে, তা যেন ভন্ডামি না হয়।

তারপরের স্তর হলো দরিদ্র বা ফখর। এটা কেবলমাত্র ধন-সম্পদের অনুপস্থিতি নয়, ধন-সম্পদের জন্য কামনা বা আগ্রহের অনুপস্থিতি। হাফিয বলেছেন-

"আমি যুগের আসফের কাছে নতশির হই

যিনি বাহ্যিকভাবে একজন রাজকীয় ব্যক্তিত্ব

কিন্তু অন্তরে দরবেশ। (আসফ ছিলেন বাদশাহ্ সোলায়মানের মন্ত্রী)" (তদেব, পৃ: ২৯)

পঞ্চম স্তর বা মাকা'ম হচ্ছে ধৈর্য বা সবর। জুনায়েদ বাগদাদি বলেছেন- "ধৈর্য্যের পূর্ণতা হলো অব্যাহতির মধ্যে"। ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে আস্থা বা আত্মসমর্পণ। সপ্তম ধাপ হচ্ছে সন্তুষ্টি বা রিদা । এই অবস্থায় সুফি সর্বদা আল্লাহ্কে খুশি রাখে এবং নিজেও সবসময় তাঁতে এবং তাঁর ক্রীড়াকলাপে প্রীত থাকে। (খলিলউল্লাহ[১৩]: তদেব, পৃ: ২৯)

এ স্তরগুলো ছাড়াও ড. আব্দুল করিম সুফিতত্ত্বের আরোও কিছু মাকা'মের কথা উল্লেখ করেন। যেমন-

১. তওবা করা- তওবার দ্বারা সাধকগণ সংসার ত্যাগ করে শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকার ওয়াদাবদ্ধ হন।

২. জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ- সুফিদের জিহাদ কোন বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নয় বরং নিজের আত্মার বিরুদ্ধে।

৩. খলওয়া ও উজালা- এ স্তরে সুফিরা নির্জনে বাস করে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

৪. জোহদ- আইনানুগ সুখ ভোগ থেকে বিরত থাকা ।

৫. সমত বা নীরবতা পালন করা।

৬. বরা-আশা অর্থাৎ সাধনার পথে ভবিষ্যতে অভিলাষপূর্ণ হওয়ার আশা।

৭. জো' ওরক আল-শাহওয়া বা ক্ষধায় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষুধার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

৮. মোখালফত আল-নফ্‌স ও যিক্‌র উয়োবিহা-নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সজাগ থাকা, বিশেষতঃ পরশ্রীকাতরতা এবং গীবত বা পরনিন্দা করার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

৯. কনা' বা আত্ম-তৃপ্তি।

১০. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা।

১১. শোকর বা কৃতজ্ঞতা।

১২. একিন বা দৃঢ় বিশ্বাস

১৩. মোরাকবা বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকা।

১৪. রেজা বা সন্তোষ বা পরিতৃপ্তি । অনেক সুফির মতে এই ধাপটি হা'ল বা বিশেষ অবস্থার প্রথম ধাপ। এরপরের অবস্থাগুলো নিম্নরূপ-

১৫. উবেদিয়া বা শুধু আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রাধীন থাকার চিন্তা করা।

১৬. ইরাদা বা নিজের কোন ইচ্ছা না রাখা, আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছামতো কাজ করা।

১৭. ইস্‌তিকামা বা সততা- এ অবস্থায় শুধু আল্লাহ্‌র ধ্যান বা সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

১৮. ইখলাসবা শুধু আল্লাহ্‌র বাধ্যানুগত থেকে আল্লাহ্‌র ধ্যান করা।

১৯. সিদ্‌ক বা চিন্তায় ও কাজে সত্যবাদিতা।

২০. হায়া বা লজ্জা।

২১. হুরিয়া বা মহানুভবতা- অর্থাৎ নিজের ভালো কামনা না করে পরের ভালো কামনা করা।

২২. যিক্‌র- সর্বদা খোদাকে চিন্তা ও ধ্যান করা।

২৩. ফুতোয়া- বা নিজ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরের উপকার করা।

২৪. ফিরাস বা অন্তর্দৃষ্টি।

২৫. খুলুক বা নৈতিক চরিত্র।

২৬. জুদ, সখা বা বদান্যতা।

২৭. গয়রা বা খোদার কাজ করার জন্য হিংসুক হওয়া, অর্থাৎ খোদার কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজকে হিংসা করা।

২৮. ভিলায়া- বা খোদার নিরাপত্তায় থাকা।

২৯. দোয়া বা সর্বদা খোদার ইবাদতে থাকা।

৩০. তাসাউফ বা পবিত্রতা।

৩১. আদব বা ভদ্র ব্যবহার।

৩২. সফর বা ভ্রমণ।

৩৩. সোহ্‌বা বা সাহচর্য।

৩৪. তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস।

৩৫. মহৎ মৃত্যু।

৩৬. মা'রেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ।

৩৭. এশ্‌ক বা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র ভালবাসা।

৩৮. শওক বা আল্লাহ্‌র সাহচর্যের জন্য আকুল আকাঙ্খা। (করিম[১০]: ১৯৬৯, পৃ: ৩১-৩২)

একজন সুফিকে এই স্তর বা মাকা'মগুলো অতিক্রম করেই পরম সত্যের সন্ধান লাভ করতে হবে। ইরানের আধুনিক কবি শাহরিয়ার বলেন-

> যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এই অবস্থানপ্রাপ্ত হয়, এর জন্য জীবন বাজী রেখে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পরীক্ষা দিতে হয় এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কামনা-বাসনাকে পরিহার করতে হয়, সৃষ্টিকে ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার পথ সুগম করতে হয়, হৃদয়কে লোভ-লালসা ও হিংসা থেকে মুক্ত করে কঠিন সাধনার মাধ্যমে এই সার্মথ্য অর্জন করতে হয়। হাফিয বলেন-

دست از مس وجود چو مردان ره بشو

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

এই অস্তিত্বশীল জগতে যদি সাহসিকতার সাথে পথ চলতে পারো

প্রেমের পরশ পাথর অর্জন করতে পারবে ও সোনায় পরিণত হবে। (দ্রষ্টব্য : হাদী[৭৪] : তদেব, পৃ: ১৪২)

হাফিযের সমসাময়িককালের সুফিদের অধিকাংশই বেশভূষায় ও আলখেল্লায় অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন। মাথার টুপিও ছিলো তাদের ভিন্ন রকমের। চুল কাটতেন না। স্বয়ং হাফিযের ভাষায়,"মাথার চুল না কাটলেই যে কেউ দরবেশ হয়ে যায়না"। আবার তাঁর

কোনো সুফি আলখেল্লাও ছিলো না। যদিও তিনি বলেছেন- "হাফিয, এ পোশমী খেরকা ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাও"। তবে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট যুক্তি-তর্ক রয়েছে। তার সম্পর্কে রাহবার সাইয়্যেদ আলি খোমেয়ানি বলেন- 'আমি হাফিযের বিশ্বদর্শনকে আধ্যাত্মিক বিশ্বদর্শন বলে মনে করি; নিঃসন্দেহে হাফিয একজন আ'রেফ (আল্লাহ্‌র পরিচয়তত্ত্ব জ্ঞানী)। যখন আমরা তাঁকে আ'রেফ বলি, তখন আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি সেই প্রথম যখন মক্তবে গেছেন তখন থেকেই তিনি একজন আ'রেফ; অথবা মক্তব থেকে যখন বের হয়েছিলেন তখন থেকেই বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ) এর মতো একজন সুফি ছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। না, তিনি ছিলেন ৭০ বা ৭৫ বছর বয়স পাওয়া একজন লোক। তিনি যদি শেষ জীবনের ৩০ বছরও আধ্যাত্মিক জগতের সাথে কাটিয়ে থাকেন, তাহলে ঠিকই তিনি একজন আ'রেফ'। (মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১৭২) তিনি আ'রেফদের আত্মাকে ভোরের পাখির সাথে তুলনা করেছেন। সুফিগণ প্রত্যূষে ইবাদতে নিমগ্ন হন। আর প্রত্যূষচারিতা, ভোরের মোনাজাত, ভোরের ক্রন্দন ইত্যাদি প্রসঙ্গে হাফিযের চেয়ে উত্তম আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি নিজেও ছিলেন নিদ্রাবিহীন রাত্রিযাপনকারী। অনবরত তিনি বলতেন আমার যা কিছু রয়েছে তা প্রত্যুষচারিতা থেকেই পাওয়া। যার অন্তর সক্ষম সেই কেবল জানতে পারে। সাধনা, মোনাজাত, আত্মশুদ্ধি, অনুনয়-বিনয়, ক্রন্দন ইত্যাদির মাধ্যমেই কেবল প্রেমময় সত্তা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। হাফিয বলেন-

সুফিরা শরাবের ছায়ায় গোপন রহস্য কথার সন্ধান পায়

যার প্রতিভা রয়েছে সেই মুক্তা চিনতে পারে

ফুলের সমাহারের মূল্য শুধুই ভোরের পাখি জানে

এমন নয় যে, বই পড়লেই কেউ জ্ঞানের তাৎপর্য বুঝতে পারবে। (মোতাহ্‌হারী[৪০] : পৃ: ৬৪)

দরবেশদের পবিত্র জীবনকে তিনি বেহেশ্‌তের খিড়কীর সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে দরবেশের ঐশ্বর্য এমন এক সম্পদ যা কখনো ধ্বংস হবেনা। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত দুনিয়ার রাজাদের তুলনায় আ'রেফদের ক্ষমতা বেশি। বাদশাহগণ সবসময়ই তাদের সাফল্যের জন্য পীর-দরবেশদের শরণাপন্ন হয়েছেন। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যুগ যুগ ধরে সুলতান-বাদশাহ সকলেই ওলি-আউলিয়াদের খেদমতে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন। মনসুরউদ্দীন অনূদিত (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ৪৮৫) নিম্নোক্ত গযলের মাধ্যমে তিনি আ'রেফদের প্রশংসা করেছেন-

সুফিদের আস্তানা স্বর্গের বাগানের টুকরা সদৃশ্য।

শক্তি ও সম্মানের মূলধন হইতেছে দরবেশদের সেবা করা।

নির্জন সাধন প্রকোষ্ঠ আশ্চর্য তেলেসমাতে পূর্ণ,

তাহাকে বলিয়া দাও দরবেশদের দৃষ্টি ক্ষমতাসম্পন্ন।

সেই স্বর্গপুরী বেজাওন যাহার দ্বার রক্ষা করিতেছে,

দরবেশদের পবিত্র জীবন ও আনন্দ ফুল বাগানের একটি খিড়কি সদৃশ্য

সেই জিনিস যাহার দিব্য আলো কৃষ্ণ হৃদকে স্বর্গে পরিণত করে,

ইহা আলকিমিয়া যাহা দরবেশদের সংস্পর্শে ঘটে ।

সেই জিনিস যাহার নিকট সূর্য তাহার গৌরব মুকুট খুলিয়া রাখে,

মহত্ত্ব যাহা দরবেশদের ঐশ্বর্য ।

এমন সম্পদ যাহার ধ্বংসের ক্ষতির জন্য দুঃখ নাই ।

নির্ভয়ে শুনিয়া রাখ ইহাই দরবেশ ঐশ্বর্য ।

বাদশারা দুনিয়ার অভাব দূর করিতে পারে, কিন্তু,

সৃষ্টির আদি দিন হইতে বর্তমান পর্যন্ত প্রকৃত আনন্দ দরবেশদের ।

সাফল্যের মুখ যাহা দুনিয়ার বাদশারা সন্ধান করে ।

সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত অবসর দরবেশদের হাতে রহিয়াছে ।

হে বাদশা এত অহঙ্কার ও গর্ব করিওনা, কেননা তোমার,

তাহার প্রকাশের স্থান দরবেশদের আকৃতির আয়নায় ।

কারুনের ধনসম্পদ খোদার গজবে আজ পর্যন্ত জমিনের নিচে যাইতেছে,

হয়ত তুমি পড়িয়াছ, ইহা দরবেশদের সাহসের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে ।

হে হাফিজ সাদরের সঙ্গে অবস্থান কর, কেননা সুলতান ও বাদশা

তামাম দরবেশদের খেদমতে নিযুক্ত । (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২০, তদেব, পৃ: ১২)

তবে হাফিযের ভাষা নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে । অনেকের ধারণা তিনি যদি আ'রেফ হয়ে থাকেন, তবে এমন ভাষায় কেন কথা বলেছেন? আসলে এই ভাষা আ'রেফ ও ইসলামের রুচিশীল ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্রচলিত ভাষা । মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির সময় থেকে আজ পর্যন্ত, হাফিযের যুগ পর্যন্ত, তারঁ সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত অধ্যাত্মসাধকগণ এই ভাষাতেই কথা বলেছেন । অর্থাৎ ইবনুল আরাবিও মদ, প্রেমাস্পদ, বন্ধুর কথা বলেছেন । ফখরুদ্দিন এরাকি, জামি, মাওলানা জালাউদ্দিন রুমিসহ আরোও অনেকেই ঠিক এই ভাষাতেই কথা বলেছেন, যাদের অধ্যাত্মবাদ সর্ম্পকে কোনো সন্দেহ নেই । সর্বকালে সর্বযুগেই এই ভাষা আ'রেফদের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ।

হাফিযের দৃষ্টিতে ওয়াহ্দাতে ওজুদ (অস্তিত্বের এককত্ব) ও ওয়াহ্দাতে তাজাল্লী (প্রকাশের ঐক্য)

এ সম্পর্কে হাফিয তাঁর রুবাঈয়্যাত এ বলেন-

تو بدری و خورشید تو را بنده شده ست

تا بنده تو شده ست تا بنده شده ست

زان روی که از شعاع نور رخ تو

خورشید منیر و ماه تابنده شده ست

"You are the moon and the sun is your slave;

As your slave, it like you must behave.

It is only your luminosity and light

That light of sun and moon can save." (রুবাঈয়্যাত নং- ৬, www.hafizonlove.com)

আধ্যাত্মিক বিশ্বদর্শনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অস্তিত্বের এককত্ব বা ওয়াহ্দাতে ওজুদ। এটির দার্শনিক ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়কালে উৎপত্তি লাভ করে। কারো কারো ধারণা মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবির পূর্বেকার আধ্যাত্মিক দর্শনে অস্তিত্বের এককত্বের ধারণা ছিলো না। শুহুদের ঐক্যতা ছিলো, অস্তিত্বের ঐকতা নয়। অস্তিত্বের এককত্ব মূলত পরবর্তীতে উৎপত্তি লাভ করে। কিন্তু এ ধারণাটা আদৌ সঠিক নয়। ইবনুল আরাবির আগেও অস্তিত্বের এককত্বের ধারণা ও পরিভাষা ছিলো। তবে তা ওয়াহ্দাতে ওজুদ নামে ছিলো না। আধ্যাত্মিক সাধকগণ এটাকে অন্য নামে উল্লেখ করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই অস্তিত্বের এককত্ব তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যমান ছিলো এবং এটার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসও ছিলো । যেমন- ফরিদ উদ্দিন আত্তার ইবনুল আরাবির প্রায় সম-সাময়িক কিংবা কিছু অগ্রজ হবেন। কেউ যদি আত্তারের লেখনী পড়ে তবে লক্ষ করবে যে, সেখানে ওয়াহ্দাতে ওজুদের নাম ব্যবহার না করলেও প্রবলরূপে এ বিষয়টা তাঁর লেখনীতে বিদ্যমান। সুতরাং অধ্যাত্মবাদের মূল ভিত্তিই হলো এই ওয়াহ্দাতে ওজুদ তথা আল্লাহ্র অস্তিত্বের এককত্ব। আরেকটি বিষয় হলো ওয়াহ্দাতে তাজাল্লী তথা প্রকাশের এককত্ব। অর্থাৎ বিশ্বজগত এক সার সত্যের প্রতিফলন দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিষয়টা হলো দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রবিদগণের মতবাদের বিপরীত। (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৯৭)

'ওয়াহ্দাত' শব্দটি 'আহাদ' শব্দ থেকে এসেছে। আহাদতত্ত্ব হচ্ছে একত্ববাদ সম্পর্কীয় জ্ঞান। সেই একত্বই আহাদ বা একক পরম সত্তা স্বয়ম্ভূ। এই 'আহাদ' অনাদিকাল থেকেই 'ইলাহ্' নামে প্রাচীন মানব সমাজে পরিচিত হয়ে আসছে। যেমন-সামী (সেমেটিক), ইব্রানী (ইরানী), সুরিয়ানী, আরামী, কালদানী, হামিরী, আরবি প্রভৃতি ভাষায় 'ইলাহ্' (اله) শব্দের রূপান্তর ঘটতে থাকে। 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাস্য। আল্লাহ্(الله) শব্দটি ইলাহ্(اله) শব্দ থেকেই উদ্ভূত । কালদানী ও সুরিয়ানী ভাষায় 'ইলাহ্' শব্দটি 'ইলাউয়ো' শব্দের রূপান্তর। সেরকম 'ইলাহ্' শব্দটি ইব্রানী ভাষায় 'উলুহ্' শব্দে রূপান্তর হয়েছে। আরবি ভাষায় 'ইলাহ্' শব্দটির ধাতু অর্থাৎ 'ইলাহ্'(اله) শব্দের সাথে 'আল'(ال) যুক্ত হয়ে আল্লাহ্ হয়েছে। যেমন(ال+اله) হয়েছে। সুতরাং সেই অনাদি, অনন্ত, অসীম 'আহাদ'- ই হচ্ছে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র বিশ্বের প্রাচীন জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক স্থাপত্য, শিল্পকলা ও মৃৎশিল্পে একত্ববাদের স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ১৭)

আবার 'ওয়াহেদুন'(واحد) শব্দ থেকে ওয়াহ্দানিয়াত(وحدنيت) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। 'ওয়াহেদ' শব্দের অর্থ এক । আর ওয়াহ্দানিয়াত শব্দের অর্থ- একত্ব, যার দ্বিত্ব নেই। ওয়াহ্দানিয়াত ও হাকিকাত একই বিষয় । কেবলমাত্র পার্থক্য হলো, হাকিকাত বা পরম সত্তায় যেমন দ্বিত্ব থাকা সম্ভব, ওয়াহ্দানিয়াতে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা 'ওয়াহ্দানিয়াত' হলো একত্ব, যার কোন দ্বিত্ব নেই। এই অর্থেই একত্বকে ওয়াহ্দানিয়াত বলে। এইরূপ একত্বের গুণে গুণান্বিত কেবল স্বয়ম্ভূ আল্লাহ্। আল্লাহ্র একত্ব অনাদি, অনন্ত, অবিভাজ্য। তাঁর মৌল সত্তায় কোনও সংমিশ্রণ নেই। এই অর্থেই তা তরিকত সাধনার সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে উর্ত্তীণ আ'রেফ তাঁর অমিত্ববোধকে একত্ববোধের মধ্যেই হারিয়ে ফেলেন। সর্বসংখ্যার সূচনা যেমন এক (১) থেকে, তেমন একের সূচনা

শূণ্য (০) থেকে; তদ্রূপ সৃষ্টিজগত ও বহুত্বের বিকাশ সেই পরম একত্ব থেকেই । এই পরম একত্বে অবস্থান করার নামই ওয়াহ্দানিয়াত । (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ১৮৪) *দিভা'নে হাফিয* গ্রন্থের (শিরাযি[৫২] : তদেব, পৃ: ১৬) ৩০ নং গযলে, যেটি শামসুল আলম সাঈদ কর্তৃক অনূদিত, এ সম্পর্কে হাফিয বলেন-

তোমার বেণী হাজার চিত্ত একই বাঁধনে বাঁধে ।

চারদিক হতে হাজার চেতনার মুক্তিপথ এর সাধে ॥

মলয় তোলপাড় সুবাস নিয়ে শত প্রেমিককে হত্যা করেছে ।

মৃগ নাভির খবর পাগল বনে বনে তার ধন্না ধরেছে ॥

পাগল আমিও প্রিয়তমার, চাঁদ বদনী দূরে থেকে হেসে ।

সুখের সম্পদ সৌরভ দিয়ে জবান আমার দিয়েছে বুঁজে সে ॥

সাকি, রঙিন হয়েছে পেয়ালা ঢালছে দেখ শরাব এবার ।

দিলরুবা রং নকশী দিল কুটে কোন্ কারিগর তার? ॥

খোদার সৃষ্টি সোরাই আচানক তার জাদু রঙিন শরাব মধু ।

কণ্ঠে যখন বাজে কলকল সঙ্গীত কি পানের জাদু? ॥

কী সঙ্গীতে সাধনমন্ত্র ওঠে শরাব দিয়ে গায়ক গায় ।

কিচ্ছুই তো নেই আদি মানবের দৃশ্য হো হো কি হায় হায় ॥

জ্ঞানীরা এই চক্র ঘোরান খোঁজেন আসমানি এ খেলা ।

আসর ভেঙ্গে গেলেও, দুয়ার বন্ধ তত্ত্ব ছোঁড়েন মেলা ॥

কারণ হাফিয পেয়েছে এক অপ্রেমী দোস্ত অর্দশনের দশা ।

মুখ করে কাবার দিকে অজু দিয়ে তার নিয়ত কসা । (সাঈদ[৫৬] : ২০১২, পৃ: ১৬৩)

ওয়াহ্দানিয়াত আলমে হাহুতের অর্ন্তভুক্ত । আলমে হাহুত আল্লাহ্পাকের নির্গুণ অবস্থানের নাম । এই পরম সত্তায় কোনো গুণারোপ, সিফাত বা বিশেষণ আরোপের অবকাশ নেই । কেবল তিনি চিরঞ্জীবী ও প্রকৃতি শূন্য অবস্থায় অবস্থান করছেন । মহা সজ্ঞায় তিনি সুশান্ত । তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আপনাতে আপনি আত্মবিভোর ও স্থিতিশীল । তাঁর এই মৌল সত্তা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুণ ও অবরোহ শুন্য । এই হলো তাঁর মৌল সত্তা বা আদিমত্ত । আদিতে একমাত্র তিনিই ছিলেন, আর কেউ ছিলো না । পূনরায় সবকিছু ধ্বংসের পর কেবল তিনিই থাকবেন, আর কিছুই থাকবে না । ওয়াহ্দানিয়াতে উর্ত্তীণ সা'লেক বা আ'রেফ সবকিছু বিলীন করে দিয়ে এমনকি নিজেকেও ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র মৌল সত্তায় স্থিতি লাভ করে থাকেন । এখানে মৌল চেতনা ছাড়া দ্বিতীয় কোন চেতনা নেই । এই চৈতন্য কেবল তাঁরই চৈতন্য । এই অবস্থায়ই আল্লাহ্পাকের মৌল অবস্থা । এই অবস্থায় অবস্থান করার নামই বাকাবিল্লাহ্ বা আল্লাহ্তে স্থিতি লাভ । এ অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেন-

"তুমি যদি নিজেকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহ্‌র তাওহিদে অবস্থান করতে পারো, তাহলে তুমি তাঁর পরম বন্ধুরূপে তাঁরই সত্তায় অবস্থান করতে পারবে"। এই স্তরে উর্ত্তীণ সাধক অমরত্ব লাভ করে থাকেন, তাঁর প্রেমের সুধা পান করতে থাকেন। হাদিসে বলা হয়েছে-

"ওহে, আল্লাহ্‌র ওলিদের মৃত্যু নেই, ।" (উদ্ধৃতি : হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ১৮৪)

দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন গ্রন্থে (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৪২৩) উল্লেখিত আছে, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌কে জানতে হলে পাঁচটা স্তর বা মোকাম বা আলমের মাধ্যমে জানা যায় বলে সুফি সাধকগণ সাব্যস্ত করেছেন; কেউ কেউ এ স্তরগুলোকে ছয়টা আবার কেউ কেউ সাতটা বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ সুফি দার্শনিক পাঁচটা স্তরের কথাই বলেছেন। মূলত যারা ছয়টা বা সাতটা স্তরের কথা বলেছেন তারা পাঁচটার কোন একটা বা দুটাকে ভেঙ্গে স্তর সংখ্যা বাড়িয়েছেন। সুফি সাধকগণ মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে সাধনার দ্বারা আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে এসব স্তর বা আলম অতিক্রম করে আল্লাহ্‌কে লাভ করেন। সুফি সাধনার স্তর বা মঞ্জিল বা আলমগুলো হলো-

১.আলম-ই-নাসুতঃ বস্তুজগত বা জড়জগতকে আলম-ই-নাসুত বলে। আলম-ই-আজ্‌সাম (জড়) ও আলম-ই-ইনসান (মানব) মিলেই এ স্তর। সাধকের কাছে আল্লাহ্‌র দাসত্বের (উবুদিয়াত) প্রকৃত পরিচয় এ স্তরেই ঘটে। আধ্যাত্মিক জগতে পাড়ি জমানোর জন্য এ স্তরটি হলো ভিত্তিভূমি। মূলত আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিবিম্ব হলো আলমে-ই-নাসুত। এ স্তরটিকে কেন্দ্র করেই সুফি দর্শনে দেহতত্ত্ব গড়ে উঠেছে । দেহতত্ত্ব আত্মতত্ত্বের ভিত্তি এবং আত্মতত্ত্ব আল্লাহ্‌তত্ত্বের মূল।

২.আলম-ই-মালাকুতঃ এ স্তরকে আত্মিক জগত বলা যেতে পারে। রুহু বা আত্মা ও ফেরেশতাসহ সূক্ষ্ম দেহধারী সব কিছুই এ স্তরের অর্ন্তভুক্ত। এ স্তরকে ধারণা বা ভাবের জগত বলা যায়। জগতে যা কিছু বস্তু বা জড় হিসাবে প্রকাশ পায় তার বস্তুহীন সূক্ষ্মতা (form) এ স্তরে বিরাজ করে। মানবাত্মা দেহে প্রবেশের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে এ জগতে থাকে। সালেক এ স্তরে আরোহণ করার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এ স্তরে সাধক কঠোর ইবাদতে গভীরভাবে মগ্ন হন এবং জিকির, ফিকির, মোরাকাবা ও মোশাহেদায় নিমগ্ন হন। এ স্তরে সাধক অপবিত্র এবং অবৈধ চিন্তা ও কাজ পরিত্যাগ করেন।

৩.আলম-ই-জাবারুতঃ এ স্তরে আল্লাহ্‌র সিফাত পৃথক ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পেয়ে তাঁর অসীম ক্ষমতা, গৌরব, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য ও কুদরত সাধক অনুভব করতে পারেন। এটা প্রভুত্বের (রবুবিয়াত) স্তর। এ স্তরে উপনীত হয়ে সাধক আল্লাহ্‌র কুদরত অনুভব করে নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ফলে সাধক আল্লাহ্‌র দয়া ও প্রেম যাচঞা করতে থাকেন। সাধক আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত অনুভব করে নিজের উবুদিয়াতের (দাসত্ব) হাকিকত উপলব্ধি করতে পারেন। এ স্তরে সাধক আত্মতত্ত্ব সাধনার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এটা সর্ম্পূণরূপে আধ্যাত্মিক জগত।

৪.আলম-ই-লাহুতঃ এ স্তরটি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট স্থান। এতে আল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত গুণাবলী প্রকাশ পায়। এ স্তরে জগতের সবকিছুতে আল্লাহ্‌র সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয় । এ স্তরে যেহেতু জগতের সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা দৃষ্ট হয় সেহেতু সাধক এখানে আরোহণ করেই নিজেকে ঐশ্বরিক অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত বা নিমজ্জিত বলে উপলব্ধি করেন। সুফি-সাধকদের ফানাফিল্লাহ্‌ অবস্থা এ স্তরেই ঘটে থাকে। সিফাত যখন জাতে পরিণত হয়, তখন সাধক এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। এ স্তরটি সম্পূর্ণ উপলব্ধির স্তর। এ স্তরেই সাধক 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু'- এর অর্থ ও ব্যঞ্জনা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং সমস্ত জগতের মূল কারণ যে, এ কলেমাতেই গুপ্তাবস্থায় নিহিত তাও অনুভব করেন।

৫.আলম-ই-হাহুত ঃ এটাই সর্বশেষ স্তর বা মোকাম। এ স্তর আল্লাহ্‌র একক জাত ও তাঁর অনন্ত-অসীম কুদরত ব্যতীত আর কিছু নেই। এ স্তর স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার বাইরে। এ স্থানকে লা-মোকাম বা স্থান শূন্যও বলা হয়। এ স্থান মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র 'হাইউল কাইউম' বা চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী অবস্থাসহ নির্গুণ ও অব্যক্ত মূল সত্তার স্থান। এ স্থান সকল কল্পনা ও চিন্তা শক্তির উর্ধ্বে।

সমস্ত কিছুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম কারণ ও আদিরূপ হিসাবে এ স্থান পরিচিহ্নিত । এ স্তরের অনুভূতি প্রকাশ করা সাধকের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বৈধও নয় । এ স্তর বাকাবিল্লাহ্‌র মোকাম । হাফিয বলেন-

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونـها برواد از یادش
آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزه در ز نـظم حافظ بادش

At dawn your eyes from jupiter learn

O God, may fantasies of my mind burn

The car adorned with that elegant ring

Gems of Hafiz's poems may earn. (রুবাঈয়্যাত নং- ২৪, www.hafizonlove.com)

ওয়াহ্‌দাতে ওজুদের নানা পরিভাষা রয়েছে । কেছরাতে ওজুদ তথা অস্তিত্বের বহুত্ব– এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট । মানুষ বলে থাকে যে, অস্তিত্বমান সৃষ্টিকূল হলো একাধিক, পরস্পর ভিন্ন, বহুত্বের সমাহার যার একটি হলো মানুষ, আরেকটি পশু (পশু আবার সত্তাগতভাবেই বিভিন্ন প্রকার), একটি হলো জ্বিন, একটি ফেরেশতা । আর এই অস্তিত্বমান আরেকটি সত্তা হলো আল্লাহ্‌ নিজে, যে অস্তিত্বসমূহ সত্তাগত ভাবেই একে অপরের থেকে বিপরীত এবং ভিন্ন । নাহজুল বালাগার ভাষায় এগুলোর গঠন সত্তাই ভিন্নতর । অর্থাৎ (হয়তো বা) অধিকাংশ দার্শনিক ও অ-দার্শনিকদের ধারণা এটাই । আ'রেফদের মধ্যমপন্থীরা কখনো কখনো বলেন ওয়াহ্‌দাতে ওজুদ অর্থ হলো উজুদ বা অস্তিত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তবে সেটা এই অর্থে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কোন অস্তিত্ব যতই মহিমার অধিকারী হোক না কেন অবশেষে সে একটি সীমাবদ্ধ সসীম অস্তিত্ব । শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তাই হলো অসীম । তার পূর্ণতা অসীম, মহিমা অসীম, ক্ষমতা অসীম, সৌন্দর্য অসীম । (মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১০৩)

আধ্যাত্মিক সাধকগণ খোদার অসীম মহিমাকে অবলোকন করে, অসীম জ্ঞান, অসীম ক্ষমা, অসীম পূর্ণতা, সসীম তখন অসীমের সাথে কোনরূপেই সম্পর্কশীল হয়না । এমনকি এটা ঐটার চেয়ে বৃহত্তর– এ কথাটাও বলা সঠিক নয় । কারণ তখন ঐটাকে একটা কিছু বলে স্বীকার করতে হয় । তখন বলা যায় এটা বৃহত্তর । হাদিসে আছে– হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হলো 'আল্লাহু আকবর' কথাটার অর্থ কি আল্লাহ্‌ সবকিছুর চেয়ে বড়'? ইমাম বললেন– 'না, এ কথাটা ভুল । সঠিক অর্থ হলো আল্লাহ্‌ গুণ বিশেষণের যাবতীয় বর্ণনার উর্ধ্বে । অন্য সবকিছুর থেকে এটা বড় নয় । কারণ তখন অন্যান্য কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে তুলনাযোগ্য ধরে নিতে হয় । তারপর বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাদের তুলনায় বড় । কিন্তু না, আসলে সেগুলো তুলনার যোগ্যও নয়' । আর এ কারণেই সুফি যখন খোদার মহিমা অবলোকন করেন তখন অনিবার্যভাবে তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না । যেমন সাদি তাঁর *বুস্তান* গ্রন্থে বলেন-

ره عقل جز پیچ در پیچ نیست

بر عارفان جز خدا هیچ نیست

বুদ্ধির পথ শুধুই আঁকা বাঁকা গলি বৈ নয়

আ'রেফগণের কাছে খোদা ছাড়া অন্য কিছুই নয় ।

এটাই হলো অস্তিত্বের এককত্ব । (মোতাহ্‌হারী[৪০] : পৃ: ১০৪)

এরপর তিনি নিজে প্রতিবাদ করে নিজেই আবার উত্তরও দিয়েছেন । তিনি বলেন-

হকিকত জ্ঞানী (ব্যক্তির) জন্য এটা বলা সহজ

কিন্তু এর প্রতি অভিযোগ করেন আহলে কিয়াস (বুদ্ধিবাদী)

যে, আসমান ও জমিন তাহলে কি জিনিস

বনি আদম আর, পণ্য ও দানব তবে কারা? (তদেব, পৃ: ১০৪)

উত্তরে বলেন-

খুব ভালো প্রশ্ন তুলে ধরেছো হে বিজ্ঞজন

জবাব দিচ্ছি তোমায় হয় যদি পছন্দ

সূর্য, সাগর, পাহাড়-পর্বত আর আকাশ

জ্বিন-পরী, মানব আর দৈত্য, ফেরেশতা

এই যা কিছু রয়েছে সকলেই তার চেয়ে কম

অস্তিত্ব বলে যাকে দেয়া চলে পরিচয় । (দ্রষ্টব্য : মোতাহ্হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ১০৫)

এ সম্পর্কে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তীর চমৎকার একটি গযল রয়েছে । যেমন-

হে, অস্তিত্ব জগতের মালিক

গোটা জগৎ তুচ্ছ, উদ্দেশ্য শুধু তুমি ।

সকল অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু তুমি

অস্তিত্ববান প্রতিটিবস্তু তোমার কারণেই স্থিতি লাভ করেছে ।

দেহ ও প্রাণের শুরু ও সমাপ্তি

জাহের ও বাতেনে রয়েছে তোমার অস্তিত্বের আভিজাত্য ।

তোমার আসল কোথা থেকে, তার থেকেই হেদায়েত

পরিসমাপ্তি কোথায় তার দিকেই প্রত্যাবর্তন ।

প্রথমেই তোমার নাম হয়েছে মুহাম্মদ

তোমার উম্মত হবে সত্য পথের যাত্রী এবং পরিণতি হবে মাহমুদ ।

তোমার খেদমত করতে গিয়ে ফেরেশতাও যদি পৃষ্ঠ দেখায়

তা হলে ইবলিসের মতোই হবে অভিশপ্ত ।

বিশ্ব-মানচিত্রের পেয়ালা হয়েছে তোমার হৃদয়

দৃষ্ট ও দ্রষ্টার নামের প্রকাশ ।

তোমার পেয়ালা দূরীভূত করেছে এশক্বের মরিচা

শহুদের নুরের প্রকাশের জন্য ।

তোমার হাস্তীর পেয়ালা যেন দেখায়

যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে ।

মুঈন তোমার প্রতি দরুদ পাঠায়

যাতে করে হকতায়ালা আমার প্রতি হন সন্তুষ্ট । (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ১৫১)

হাফিয বলেন-

اگر بلطف بخوانی مزید الطافست

و گر بقهر برانی درون ما صافست

بنامه وصف تو گفتن نه حد امکانست

چرا که وصف تو بیرون ز حد اوصافست

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৫৪১, তদেব, পৃ: ২৪৫)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের কাব্যানুবাদ নিম্নরূপ:

যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ডাকো, তবে তাহা আমার পরম ভাগ্য,

আর যদি তুমি নির্দয়ভাবে তাড়াইয়া দাও, তাহা হইলে আমার হৃদয় (শেকায়েত) নির্মল ।

তোমার গুণগান গাহিবার শক্তি সম্ভারের বাহিরে, তাহার

কারণ এই যে তোমার গুণকীর্তন সকল সীমার বাহিরে । (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ৫২৫)

আ'রেফদের মতে উজুদ বা অস্তিত্ব হলো সর্বদিক থেকে একটি একক এবং নিরঙ্কুশ অযৌগ । কোনোরূপ বহুত্ব তার মধ্যে নেই । গভীরতায় বহুত্ব যেমন নেই ব্যাপকতায়ও বহুত্ব তেমনি নেই । প্রাবল্য ও ক্ষীণতার বহুত্বও নেই । তেমনি অ-প্রাবল্য ও অ-ক্ষীণতার বহুত্বও নেই । ওজুদের হাকিকত শুধুমাত্র এককেই সীমাবদ্ধ । আর তা হলো খোদা । অস্তিত্ব বলতে কেবল আল্লাহ্‌রই অস্তিত্ব রয়েছে । আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছু রয়েছে সেগুলো অস্তিত্ব নয় । সেগুলো কেবলই প্রকাশ ও নির্দশন । স্বয়ং আ'রেফদের ভাষায়, হাকিকত (তথা সারসত্য) নয় বরং রাকীকাহ (বা সূক্ষ্মভেদ) যেমন আয়নায় প্রতিবিম্বিত ছবি । আর এ জন্যই আধ্যাত্মিক সাধকগণ আল্লাহ্ ভিন্ন সবকিছুর অস্তিত্বকে নাকচ করে দেন এবং সেগুলোকে কেবলই প্রতীক ও প্রকাশ সর্বস্ব জ্ঞান করে থাকেন । আর এখানেই দার্শনিক ও আ'রেফগণের মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ দেখা দেয় । সাদরুল মুতাআল্লেহিন (মোল্লা সাদরা) বর্ণনা করেন- "আল্লাহ্‌র সত্তা যা

হলো সরলতম ও অযৌগ সারসত্য। তিনিই সব কিছু এতদসত্ত্বেও কোন কিছুতেই তিনি নেই"। আ'রেফগণ তাঁদের ব্যাখ্যায় কোনো কিছুর বেলায় অস্তিত্বকে মেনে নেয়া ছাড়াই এ কথাটা বলেছিলেন। তবে তাঁদের ভাষা ও ভিত্তি ছিলো ভিন্ন। কিন্তু সাদরুল মুতাআল্লেহিন এটাকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ সুফিগণ যা বলতেন তা শুধুমাত্র অন্তরের ঐশী বিকিরণের মাধ্যমেই অনুধাবন সম্ভব। আকল তথা বুদ্ধি দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ বিষয়টিকে প্রমাণ করেন। এটা হলো সেই স্থানগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে তিনি আকল (দার্শনিক) এবং ইরফান (আধ্যাত্মিক) এর দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় করেন। (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১০৮)

ওয়াহ্দাতে ওজুদ বা অস্তিত্বের এককত্ব সম্পর্কে আ'রেফগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনেক কথা বলেছেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' একটি বহুল আলোচিত মতবাদ। এর বাংলা অর্থ অদ্বৈতবাদ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরিফের সুরা হাদিদের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন–

'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি ব্যক্ত, তিনিই অব্যক্ত, তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত'। আবার সুরা কাছাছের ৮৮ নং আয়াতে করিমে বলা হয়েছে- 'যাবতীয় সবকিছুই ধ্বংসশীল, তার সত্তা ব্যতীত'। এই আয়াতে করিমের তাফসির লিখতে গিয়ে আল্লামা ইউসুফ আলি বলেন-

> "The only reality is God. His `` Face`` or self, Personality, or Being are what we should seek, Knowing that it is the only enduring thing of which we can have any conception. The whole phenomenal world is subject to flux and change and will pass away, but he will endure forever. If we think of an impersonal God, and abstract force of God, we cannot reconcile it with the self or Being, of which we have a faint echo or reflection in our INTENSEST moments or spiritual exaltation. We know then that what we call our own self has no meaning, for there is only one true self and that is God. This is also the Advaita doctrine of Shri Shanker in his exposition of the Brihad Aranyake Upanishad in Hindu Philosophy." (উদ্ধৃতি : হক[৬৬] : ২০০৪, পৃ: ২৭)

মাওলানা তাঁর মসনবিতে বলেন-

جمله معشوق است و عاشق پرده ای

زنده معشوق است و عاشق مرده ای

মৎকৃত অনুবাদ: জগতের সবকিছুই মাশুক (প্রেমাস্পদ) আর সমস্ত আশেকই আবরণ,

প্রেমাস্পদই জীবিত, আর প্রেমিক মৃত।

এখানে আল্লাহ্কে প্রেমাস্পদ বলা হয়েছে আর যাবতীয় জিনিসকে বলা হয়েছে প্রেমিক। কেননা তারা আল্লাহ্র উপাসনায় এবং আল্লাহ্র দিকেই ধাবমান। রুমি তাঁর মসনবির শুরুতেই বলেন-

বাঁশরির কাছে শোনো, সে কিসের বর্ণনা দেয়;

বিরহ-ব্যথার করুণ কাহিনীর সে অনুযোগ করেঃ

যেদিন থেকে আমাকে বাঁশবন হতে কেটে এনেছে,

আমার আর্ত-কান্নায় নারী পুরুষ বিলাপ করেছে।

বক্ষ চাই এমন, যা বিচ্ছেদে ফেটে হয়েছে ফালি ফালি

যাতে প্রেমের কি বেদনা তার বিবরণ শোনাতে পারি।

যে কেউ নিজের উৎস হতে দূরে পড়ে থাকে,

সে চায় তার মিলনের দিনগুলো পুনঃ ফিরে পেতে। (রুমী[৪৩] : ২০০৮, পৃ: ২৭)

আল্লাহ্তায়ালা সুরা নুরের ৪১ এবং ৪২ নং আয়াতে করিমে বলেছেন- "তুমি কি দেখো না যে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা আর উড়ন্ত পাখীরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন করে এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করার ও মহিমা কীর্তনের পদ্ধতি জানে। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

সুরা হাসরের ২৪ নং আয়াতে করিমে আছে- "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। কিন্তু বিশ্বে এমন কিছু নেই যা ধ্বংস হবে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী, শ্বাশত ও সনাতন।" সুতরাং রুমির কথা হলো- আল্লাহ্ সর্বব্যপী, তিনিই সবকিছু ঘিরে আছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নেই। তিনি বলেন-

জলবিন্দুও তুমি, সমুদ্রও তুমি, করুণাও তুমি, ক্রোধও তুমি,

শর্করাও তুমি, বিষও তুমি, আমাকে বেশি নির্যাতন করো না। (উদ্ধৃতি : হক[৬৫] : ১৯৯৬, পৃ: ১৬)

যেমনটি বাংলার বাউল কবি বলেন-

তুমি ভেস্ত, তুমি দোজখ, তুমি ভালো মন্দ

তুমি ফুল, তুমি ফল, তুমি তাতে গন্ধ,

আমার মনে এই আনন্দ আমি কেবল তোমায় চাই।

হাফিযও এ প্রসঙ্গে অনেক কবিতাবলী রচনা করেছেন। তিনি একটি সুলুক তথা আধ্যাত্মিক আচরণ পদ্ধতি হিসাবে এই কথাটি অনেকবার বলেছেন। যেমন তিনি বলেন-

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

"আলোকিত তোমার মুখের ছবি অথচ কোনো দৃষ্টি নেই তো নেই

তোমার দরজার ধুলির অনুগ্রহ কারো চোখে নেই তো নেই।" (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১১০)

অন্যত্র বলেন-

"তোমার প্রতি লক্ষ্যকারীরা বিশেষজ্ঞ বটে

তোমার বেণীর রহস্যময়তা যেনো নেই তো নেই

আমার আঁখির ইশারায় যদি রক্তাক্ত অশ্রু প্রবাহিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি!

স্বীয় কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হলেও পর্দায় ঢেকে দেয়ার কেউ নেইতো নেই!" (তদেব, পৃ: ১১১)

আ'রেফদের দৃষ্টিতে সবকিছুই 'নেই' । আর 'নেই' কেবল তিনি ব্যতীত । নিঃশর্ত 'থাকা' আর বাঞ্ছিতও প্রিয় হওয়ার যোগ্য পাত্র শুধুই

তিনি । হাফিয বলেন–

আমাদের মতামতের খেলায় অজ্ঞাতরা দিশেহারা

আমি এরূপই যেমনটা প্রকাশিত হয়েছি, বাদবাকী জানেন কেবল তিনি ।

তাঁর রূপের প্রকাশস্থল শুধু আমার একার দৃষ্টিই একা নয়

চন্দ্র এবং সূর্য পরিণত হয় তাঁর চেহারার আয়নায় ।

এ কথাটার অর্থ হলো চন্দ্র ও সূর্য সেই আয়না যা তাকে প্রদর্শন করে । (তদেব, পৃ: ১১২)

অন্য আরেকটি বিখ্যাত গযলে (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৯২, তদেব, পৃ: ১৬২) হাফিয বলেন–

মৎকৃত অনুবাদ: প্রকাশ্যে বলার কারণে খুশীতে আমার মনটা ভরে গেছে

আমি প্রেমের দাস, তাই আমি দুই পৃথিবী (ইহকাল ও পরকাল) থেকে মুক্ত ।

আমার হৃদয়ে বন্ধুর অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই

কি করব অন্য কোনো অক্ষর আমার গুরুর কাছ থেকে শিখিনি ।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তত্ত্বটি আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত । ন ঞ থেকেই তাঁর সৃষ্টির সূচনা । ন ঞ (A Great not) দার্শনিকদের দৃষ্টিতে আদি প্রজ্ঞা এবং এতে নিহিত রয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির যাবতীয় রহস্যভেদ । এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'ইলাহ্' শব্দটিকে কেউ কেউ উপাস্য হিসেবে আবার কেউ কেউ সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে 'ইলাহ্' হলো সর্বব্যপী সত্তা । সুফিগণ 'লা-ইলাহা' বলতে 'নেই কোনো সত্তা' বলে থাকেন । তাঁরা একে 'লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই) অর্থে প্রকাশ করে থাকেন । মহিমান্বিত আল্লাহ্র সত্তার (জাত) তিনটা স্তর রয়েছে–

১.আহাদিয়াতঃ এ স্তরে তিনি আপনাতেই বিদ্যমান এবং অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দরিয়ারূপে আছেন । এখানে তিনি একক ও অদ্বৈত ।

২.ওয়াহ্দাতঃ এ স্তরে তিনি তার ইরাদা বা ইচ্ছা বা এশ্ক (প্রেম) থেকে নুর-ই-মুহাম্মদি সৃষ্টি করেন ।

৩.ওয়াহ্হিদিয়াতঃ এ স্তরে নুর-ই-মুহাম্মদি থেকে সবকিছুর বিকাশ ঘটান ।

দ্বিতীয় স্তরে নুর-ই-মুহাম্মদিকে তিনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টির সাথে আহমদ রূপে প্রকাশ করেন । আর এজন্যই কোরআনের পূর্বে সকল ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ) আহমদ রূপে প্রকাশিত । নজরুল বলেন-

আহমদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ মন

আহাদ সেথায় বিরাজ করে হেরে গুণীজন ॥

যে চিনতে পারে রয় না ঘরে হয় সে উদাসী

সে সকল ত্যাজি ভজে শুধু নবিজির চরণ ॥ (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : ২০১১, পৃ: ৪৪)

সকল মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এমনকি অমুসলিম দার্শনিকদের অনেকেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সদর্থক ধারণা পোষণ করেন। ইমাম আল গায্‌যালি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত করেন। যেমন-

১. সত্যানুসারী দল: এই দলে লোকেরা জগতকে সৃষ্ট বলে মনে করেন। তাই তাঁরা সৃষ্টিকর্তা আছে বলে বিশ্বাস করেন।

২. জড়বাদী দল: এই দলের লোকেরা মনে করেন, জগত বর্তমান অবস্থায় অনাদি। তাই এর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

৩. দার্শনিক দল: এই দলের লোকেরা মনে করেন, জগত অনাদি হওয়া সত্ত্বেও এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে।

ইমাম আল গায্‌যালি সত্যানুসারী দলকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন– আল্লাহ্‌ই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা এবং তিনিই সকল কর্মের মূল কারণ এবং আদি উৎস। (হোসেন[৭২] : ২০১৩, পৃ: ৯৬) হাফিয একটি গযলে (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২৩, তদেব, পৃ: ১৩) বলেন-

তাহার চিন্তা ছাড়া আঁখি যেন লক্ষ্যশূন্য না হয়,

কেননা এই ইন্দ্রিয় তাহারই সম্পদ।

যদি আমার অঞ্চল নোংরা হয়, তবে কি

আর্শ্চয, বিশ্ব সংসার তাহার পবিত্র অঞ্চলের সাক্ষ্য দিবে। (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ৪৮৯)

প্লোটিনাসের অনুকরণে আল-ফারাবি আদি সত্তার নাম দিয়েছেন একক সত্তা। একক সত্তা সবকিছুর আদি উৎস ও কারণ। পরম একক সত্তার কোন সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব নয়; কারণ এ সত্তা অন্য সব সত্তার অগ্রবর্তী এবং সবচেয়ে বেশী সরল। কোনো বস্তু বা ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করার অর্থই হলো এর অংশগুলোকে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করা। কিন্তু আদিসত্তা যেহেতু সর্বতোভাবে সরল, সে কারণেই একে আর খন্ডিত করা যায় না; আর তা নয় বলেই একে সংজ্ঞায়িতও করা যায় না। আদি সত্তা একক, বিজ্ঞতা ও প্রাণের অধিকারী। কিন্তু এসব গুণ তার অন্তঃসারের অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র কিছু নয়, অন্তঃসারেরই অংশবিশেষ। সাধারণ বস্তুর বেলায় অন্তঃসার ও অস্তিত্ব পৃথক থাকে, এবং এজন্যই এদের বেলায় অন্তঃসার অস্তিত্বের অপরিহার্য নির্দেশক নয়। কারণ কোনো একটি জিনিসের অস্তিত্ব আছে কি না, তা না জেনেও আমরা এর অন্তঃসার সম্পর্কে ভাবতে পারি। কিন্তু পরম সত্তা আল্লাহ্‌র অন্তঃসার তার অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়। আল্লাহর অন্তঃসারই তাঁর অস্তিত্ব। এই একত্ব দ্বারাই সূচিত হয় আল্লাহ্‌ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের পার্থক্য। আল্লাহ্‌ সর্ম্পূণরূপে জড় বিমুক্ত এবং সর্বতোভাবে বুদ্ধিসঞ্জাত। ফারাবির মতে– বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহ্‌কে জানা যায় না ঠিক; কিন্তু এ সত্ত্বেও ঐশী জ্ঞান যে কোন সার্থক দর্শনের লক্ষ্য। আর প্রত্যেক মানুষের উচিত তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আল্লাহ্‌র কাছাকাছি অগ্রসর হবার চেষ্টা করা। (ইসলাম[৭] : ২০০৪, পৃ: ১৪০-১৪১)

আল্লাহ্‌র একত্ববাদই হচ্ছে তাওহিদ। আর এই তাওহিদ হলো ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, মুসলমান জাতির প্রাণশক্তির মূল আধার। জীবনে-মরনে, সুদিনে-দুর্দিনে, বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা ও আনুগত্যই তাওহিদ এর মর্মকথা। এক আল্লাহ্‌ই মানুষের উপাস্য, সুখ-দুঃখের সাথী। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্‌র একত্ব বা তাওহিদ মু'মিনের দেহের অচ্ছেদ্য বর্ম, জীবনের দুর্বার গতিশক্তি, প্রাণের অফুরন্ত প্রেরণা, আত্মার পরম পুলক। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা উৎসারিত হয়েছে। তাওহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি (জাত), গুণ (ছেফাত) ও কাজের (এফ্‌য়াল) দিক দিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা এক; তিনি একমাত্র উপাস্য; একাধিক সত্তা আল্লাহর অস্তিত্বের বিরোধী। এক আল্লাহ্‌ সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের অধিপতি, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বজগতের সর্বময়

নিয়ন্তা। সেফাতের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র একত্বের অর্থ হলো স্বর্গ মর্তের কোনো জীবই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র এক বা একাধিক গুণের অধিকারী হতে পারে না। মর্মের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র একত্বের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ যা করেছেন বা যা করতে পারেন তা তার সৃষ্ট জীব করতে পারে না, পবিত্র কোরআন শরিফের সুরা এখলাছের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সুন্দর অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে, "বলুন আল্লাহ্‌ এক, তিনি চিরন্তন, স্বয়ম্ভূ; তিনি কাকেও জন্ম দেন নি এবং তিনি কারো জাত নন এবং কেউ তার সমকক্ষ নন।" (আলম[১] : ২০১২, পৃ: ৫৬)

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে ইবনে রুশ্‌দ এর মত হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব, গুণাবলী, পূর্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, জগতের সৃষ্টি, নবুয়্যতের বৈধতা, মরণোত্তর জীবন- এগুলো ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, এবং ধর্মবেত্তা, দার্শনিক ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার পক্ষেই এগুলোতেই বিশ্বাস করা অপরিহার্য। কোরআনের মূল ঘোষণার আলোকে তিনি উপস্থাপন করেছেন বদান্যতার প্রমাণ (যাকে আবার বলা যায় উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ) এবং সৃষ্টিতাত্ত্বিক প্রমাণ। বদান্যতার প্রমাণটি দুটি নীতির ওপর নির্ভরশীল। এক, পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে পাই, এ সবই মানুষের অস্তিত্ব ও অব্যাহত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী; এবং দুই, উপযোগিতা হঠাৎই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হয়নি; বরং একে সজ্ঞানে সৃষ্টি করেছেন এমন একজন সৃষ্টিকর্তা যাঁর বদান্য এবং জগত পরিচালনার ব্যাপারে একটি উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে। রাতের আকাশে আমরা যেসব তারকাকে মিটমিট করে জ্বলতে দেখি এগুলো মানুষের চলার পথে দিক নিদের্শনার জন্য। ঠিক তেমনি মানুষের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রাণ ও অস্তিত্বের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানের জন্য। ইবন রুশ্‌দ এর সৃষ্টিতাত্ত্বিক প্রমাণটি প্রতিষ্ঠিত প্রাণিকূল, উদ্ভিদ ও মহাকাশের বিবেচনার ওপর। সব জিনিস সৃষ্ট এবং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর অবশ্যই একজন স্রষ্টা দরকার- এ দুটি ধারণার ওপরই দাঁড় করানো হয়েছে যুক্তিটিকে। তাঁর মতে এ দুটি প্রমাণের ইঙ্গিতই কোরআনে পাওয়া যায় এবং এদের মর্মও সব শ্রেণীর মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। (ইসলাম[৮] : ২০১৩, পৃ: ২৩৯)

মুসলিম দার্শনিকদের মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলী দু'প্রকার- সদর্থক ও নঞর্থক। কোনো কোনো নঞর্থক গুণ আল্লাহ্‌র সকল অপূর্ণতাকে অস্বীকার করে। অন্যগুলো তাঁকে জানার অতীত বলে নির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনি মানব প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা-বোধের অতীত। কিছু সদর্থক গুণ তাঁর উপর আরোপ করা হয় এই কারণে যে, তাঁদের বিপরীতগুলো অপূর্ণতাকে নির্দেশ করে- কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র প্রকৃতিকে বর্ণনা করে না। অন্যান্য সদর্থক গুণ তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবকে বর্ণনা করে এবং এই কারণেই এগুলো তাঁর সারসত্তার অংশ গঠন করে। আল্লাহ্‌র সারসত্তা তাঁর গুণাবলীর সাথে অভেদ নয়। গুণাবলী সারসত্তার চেয়ে ভিন্ন ও সারসত্তার অতিরিক্ত। জগত হচ্ছে গুণাবলীর কার্য বা প্রকাশ। সুতরাং, আল্লাহ্‌র সত্তা পূর্ণ। তাই পূর্ণতা অর্জনের জন্য তাঁর গুণাবলী বা তাদের প্রকাশ সমূহের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ্‌ হচ্ছেন আত্ম-অস্তিত্বশীল সত্তা। তাঁর অস্তিত্বের জন্য অন্যকোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। গুণাবলী হচ্ছে তাঁর জগত বা সারসত্তার ফল এবং জাত হচ্ছে গুণাবলীর ফল। এই স্তর অনুসারে পূর্ণসত্তা থেকে নির্গত হয় অস্তিত্ব, তারপর পর্যায়ক্রমে আর্বিভাব হয় প্রাপ্ত জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, কথন এবং সৃষ্টি। প্রাণের গুণই হচ্ছে জগত সৃষ্টির কারণ। এভাবে দেখা যায় যে, জগত হচ্ছে আল্লাহ্‌র কার্য (effect) আল্লাহ্‌র প্রকাশের ধরন নয়। আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এসব গুণ তাঁর সত্তার অতিরিক্ত। সসীম বস্তুসমূহের মধ্যে বিদ্যমান যে সদর্থক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় তা আল্লাহ্‌র দান। জগত বাস্তব ততক্ষন পর্যন্ত যখন এটা পরম বাস্তব আল্লাহ্‌ থেকে আগত হয়। তবে জগত অবভাস (appearance) বৈ কিছু নয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক অভেদাত্মক নয়; সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর আভাস বা কার্য। একজন মানুষের কার্যকে তার সমগ্র সত্তার অভেদমূলক কার্য

হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অনুরূপ, জগত হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতিফলন বা প্রতিভাস। জগত বাস্তব, কারণ এটা পরম বাস্তবের অবভাস। তবে, জগত তাঁর অস্তিত্বের জন্য আমাদের কল্পনার উপর নির্ভরশীল নয়। (হালিম[৭১] : ২০১২, পৃ: ৩১৪)

ইবনুল আরাবির 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা সত্তার ঐক্য বা অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ এই ধরনের মতবাদ যা জ্ঞানমূলক ঐক্য ও ধর্মীয় ঐক্যের পার্থক্য রক্ষা না করে উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কেবলমাত্র দুইটি স্তর রয়েছে। এক, বুদ্ধিগ্রাহ্য অস্তিত্ব বা ধারণাগত অস্তিত্ব এবং দুই, মূর্ত প্রকাশিত অস্তিত্ব বা বাস্তব অস্তিত্ব। 'ধারণাগত অস্তিত্ব'ও 'বাস্তব অস্তিত্ব' এক ও অভিন্ন– এই ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর সুফি দর্শনের অনেকগুলো মতবাদ যেমন, বিশ্বের নিত্যতা ও অনিত্যতা, অস্তিত্ব

ও অনস্তিত্ব গড়ে তুলেন। তাঁর মতে, এই বিশ্বজগত এমনকি মানুষও নিত্য ও অনিত্য, অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল উভয়ই। এই বিশ্বজগত নিত্য বা চিরন্তন, কেননা আল্লাহ্‌র চিরন্তন জ্ঞানের মধ্যে এ অস্তিত্ব আছে। পুনরায়, এই বিশ্বজগত অনিত্য কেননা এর বাহ্যিক আকার বা আকৃতি আছে। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। ইবনুল আরাবির মতে সত্তা ও তার প্রজাতি দুই প্রকার–

১. স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম সত্তা। এই সত্তা নির্গুণ, অনির্দিষ্ট সত্তাসার ও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব।

২. সাপেক্ষ সত্তা বা বিশ্বজগত। এই জগতে জড় জগতে, এর সাপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার উপর নির্ভরশীল। সাপেক্ষ সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত– (১)স্বতন্ত্র দ্রব্য এবং (২) নির্ভরশীল গুণ। স্বতন্ত্র দ্রব্য আবার দুই ভাগে বিভক্ত– (১) জড়বস্তু এবং (২) আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা বিশুদ্ধ আত্মা। তাঁর 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' বা অদ্বৈতবাদের মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন ধরনের জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন-

১. আশারীয়দের সার্বিক দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদ

২. হাল্লাজের 'লাহুত'(ঐশী সত্তা) ও 'নাসুত' (মানবীয় সত্তা) মতবাদ এবং

৩. নব্য প্লেটোবাদীদের এক সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ। স্বতন্ত্রভাবে তিনটি মতবাদের কোনোটির সাথেই তাঁর মতবাদ এক নয়, তাঁর মতবাদ তিনটির সমন্বয়ের ফল। বিশেষ করে তাঁর 'এক ও বহু' সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে হাল্লাজের 'লাহুত' ও 'নাসুত' মতবাদের প্রভাব খুব বেশী। (সরকার[৬০] : ২০১৪, পৃ: ৫৪)

পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজাও সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের সর্মথক। তবে ইবনুল আরাবির 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ ও স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ পুরোপুরি এক নয়। স্পিনোজার মতে, সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র অসীম গুণাবলীর প্রকাশমাত্র। কিন্তু সমগ্র আল্লাহ্‌ বিশ্বজগত নয়। আরাবির মতে মানুষ মাত্রই প্রজ্ঞাশীল জীব। অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে সে তার প্রজ্ঞার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্ন প্রকার চেতনা বলে উল্লেখ করেন। যেমন- দার্শনিক চেতনা, নৈতিক চেতনা ও ধর্মীয় চেতনা । উপরোক্ত তিন প্রকার চেতনার মধ্যে তিনি দার্শনিক চেতনা ও ধর্মীয় চেতনার মধ্যে ঐক্যের সুর খুঁজে পান। তাঁর মতে 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদের সত্তার ঐক্যের ধারণা মূলত দার্শনিকদের জ্ঞানমূলক ও ধর্ম-তত্ত্ববিদদের ধর্মীয় চেতনার সংমিশ্রণে গঠিত। তাই 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' মতবাদ বুঝতে হলে প্রথমেই দার্শনিক চেতনার ঐক্যনীতি ও ধর্মীয় চেতনার ঐক্যনীতি এবং ধর্মীয় চেতনার 'পরম সত্তা' বা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি বুঝতে হবে। (হামিদ, ঢালী[৬৯] : ২০১০, পৃ: ১৫৬)

সুফিবাদ সাধারণত একটি সর্বেশ্বরবাদী মত বলে পরিচিত। এ মত আল্লাহ্‌কে তার স্বর্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি অন্তর্বর্তী সত্তা হিসাবে দেখে না, দেখে থাকে এমন একটি অন্তর্বর্তী সত্তা এবং এমন একটি অতি জাগতিক শক্তি হিসেবে, যা এ জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে প্রবহমান । তিনি জগতেই আছেন, জগতের বাইরে কোথাও নয়। তাঁর আসন যতটুকু বেহেশ্‌তে তাঁর চেয়ে বেশী মানুষের হৃদয়ে। তিনি ভয়ের বস্তু নন, বরং প্রেমের বস্তু। যেমন হাফিয তাঁর প্রভুর সমস্ত সৌন্দর্যের চিরন্তন সাক্ষী। তিনি প্রভুর

অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহনকারী এমন এক সত্তা যাকে তিনি নিজের প্রয়োজনে নিজ অবয়বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মোস্তাক আহ্মাদের উদ্ধৃতিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত একটি রুবাঈয়্যাতে হাফিয বলেন-

তারি আমি বান্দা গোলাম,

সৌখিন যে-রস্-পিয়াসী।

গলায় যাহার দোলায় বিধি

পাগল প্রেমের শিক্‌লি ফাঁসি।

প্রেমের এবং প্রেম জানানোর

স্বাদ অ-প্রেমিক বুঝবে কিসে?

পান করে এ সুরার ধারা

সুর-লোকের রূপ-বিলাসী। (আহ্মাদ[২] : তদেব, পৃ: ৬৬)

আল্লামা ইকবাল বলেন যে, আল্লাহ্ পরম স্রষ্টা এবং তাঁর সৃজনশীল প্রকৃতির মধ্যেই কার্যকর থাকে এ জগত। আল্লাহ্ পরিপূর্ণ অহম (Perfect ego), পরিপূর্ণ আত্মা (Perfect self) বা পরিপূর্ণ ব্যক্তি (Perfect individual), কেননা সকল সৃষ্ট অহম বা ব্যক্তিসত্তার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার উত্তরোত্তর বাস্তবায়ন। পবিত্র কোরআনের আলোকে আল্লামা ইকবাল আল্লাহ্র ধারণা সম্পর্কে বলেন- তিনি এমন এক আধ্যাত্মিক সত্তা, যা একদিকে দৈশিক নন, অন্যদিকে আবার সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক-ও নন। আল্লাহ্ একটি ব্যক্তিক আত্মা। পরম অহম হিসেবে আল্লাহ্ অসীম, তবে তাঁর অসীমতা কালিক-ও (Temporal) নয়, দৈশিক-ও (Spatial) নয়। তার সৃজনশীল ক্রিয়াপরতার সম্ভাবনা তাঁর অসীমতায় বিদ্যমান থাকে। আমাদের এ জগত কেবল তাঁর সসীম প্রকাশ মাত্র। আল্লাহ্র অসীমতা এক অসীম ধারা (Infinite series) সম্বলিত, তবে সেটি এ ধারা মাত্র নয়। আল্লাহ্ পরম অহম হিসেবে সর্বজ্ঞাতা। (বারী[৩৬] : ২০০৮, পৃ: ৪৯৬)

মুসলিম দর্শনে 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন বায়েজিদ বোস্তামী। তিনি 'হামে উস্ত' (সবই সে) সর্বেশ্বরবাদের গোড়াপত্তন করেন। এরপর তাঁর 'সোব্হানী' (মহিমা আমারই) ঘোষণা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' প্রকাশ করতে গিয়ে হাল্লাজ বলেছিলেন, 'আনাল হক ' (আমিই সৃষ্টিশীল সত্য) এবং এ কারণে তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছে। এরপর ওমর ইবনুল ফরিদ বলেছিলেন 'আনা হিয়া' (আমিই সে) । এসব সুফিসাধকগণ 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করলেও এর কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে করেন নি বলেই শরীয়তপন্থীগণের চাপের মুখে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। এরপর মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি তাঁর 'ফুসুসুল হিকাম' ও 'ফতুহাতুল মক্কিয়া' গ্রন্থে 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদের' বিস্তারিত দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ধারণা জ্ঞানমূলক ও ধর্মীয় চেতনার মিশ্রনজাত তত্ত্ব হবার কারণে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। মূলত 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ', বুঝতে হলে দার্শনিক চেতনার 'মূল ঐক্যনীতি' ও ধর্মীয় চেতনার 'পরম সত্তা' বা আল্লাহ্র প্রকৃতি বোঝা দরকার। 'মূল ঐক্যনীতি' মানব সভ্যতার আদি থেকেই দার্শনিকগণ খুঁজে পেতে প্রয়াস চালান। গ্রিক পন্ডিত থেলিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৪৮) পরম একত্বের সন্ধানে আত্মশক্তি নিয়োগ করে দেখতে পান যে, বিশ্বজগতের সবকিছুর পিছনে একটা কারণ রয়েছে। আবার সে কারণেরও আরেকটা কারণ রয়েছে। এভাবে কারণ অনুসন্ধান করে মূলের দিকে যতই যাওয়া যায় কারণের ব্যাখ্যা ততই কমে আসে। এতে তিনি মনে করেন যে, মূলে হয়তো একটা মাত্র কারণ পাওয়া যাবে যা থেকে বস্তুর উৎপত্তি আরম্ভ হয়েছে। তিনি পানিকে 'মূল কারণ' বলে উল্লেখ করেন। এমনি করে বিশ্বজগতের 'আদিকারণ' অনুসন্ধানে আরো অনেকে আত্মনিয়োগ করেন। এনাক্সিমান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬১১-৫৪৭) 'অসীম অনির্দিষ্ট

কিছু একটা', এনাকসিমেনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮-৫২৪) 'বায়ু', এম্পেডোকল্‌স 'মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন', ডেমোক্রিটাস 'অবিভাজ্য পরমাণু', বৃটিশ দার্শনিক লক, বার্কলে ও হিউম 'ধারণা ও সংবেদন'-এর মধ্যে মূল ঐক্যের সন্ধান পান। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো কল্যাণের ধারণার মধ্যে, এরিস্টোটল বিশুদ্ধ আকারের মধ্যে, স্পিনোজা পরম দ্রব্যের মধ্যে, হেগেল পরম ব্রহ্মেরমধ্যে মূল ঐক্য দেখতে পান। (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : পৃ: ১৫৩)

অপরপক্ষে পরম সত্তার ঐক্য ধর্মীয় চেতনার মূল কথা। পরম সত্তার সাথে মানুষ ও বিশ্বজগতকে সম্পর্ক অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আছে ।মানুষ পরম সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায়, ঐক্য স্থাপন করতে চায়, তাতে পূর্ণতা অর্জন করে

সুখী হতে চায়, জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হতে চায়, প্রেমাস্পদরূপে সৌন্দর্য উপভোগ করে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু সে নিজ প্রকৃতির বাঁধার কারণে সহজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ফলে সে এমন একটা পরম সত্তাকে স্বীকার করে যিনি প্রভু, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, দাতা, সৃষ্টিকর্তা, পরিচালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা। তিনি সর্বজ্ঞানী, গুপ্ত ও ব্যক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। তিনি একমাত্র উপাসক এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা যায়। তিনি এক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভূ। ধর্মীয় চেতনায় মূল ঐক্য বা পরম ঐক্যকে জগতের অর্ন্তব্যাপী সত্তা হিসেবে মনে করা হয়। পরমাত্মা বিশ্বজগত থেকে ভিন্ন নয় এবং বিশ্বজগতও পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। একের যোগফলই বহু। (তদেব, পৃ: ১৫৩)বহুত্বের মাঝে একত্ব কিভাবে মিশে আছে ইবনুল আরাবি তা ব্যাখ্যা করার জন্য ইবনুল আরাবি অনেক রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি দপর্ণ ও প্রতিরূপের রূপক দ্বারা বলেন যে, এ বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তু একটি দপর্ণ। পরম সত্তা এ দর্পণে তাঁর প্রতিরূপ প্রকাশ করে। দর্পণগুলো নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে পরম সত্তার প্রতিরূপ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রূপে ও আকারে প্রকাশ করে। এরপর তিনি দ্রব্য ও গুণের রূপক দ্বারা বলেন যে, দ্রব্যের মধ্যে গুণ যেভাবে মিশে আছে বহুর মধ্যে এক সেভাবে মিশে আছে। আবার খাদ্য যেভাবে দেহের সাথে মিশে যায় বহুও তেমনি একের সাথে সেভাবে মিশে যায়। গাণিতিক সংখ্যা একের উপমা দিয়ে তিনি বলেন যে, এক বহুর ভিত্তি। এক না হলে কোনো সংখ্যা বা বহুর উৎপত্তি অলীক ধারণা। একইভাবে তিনি একটা চক্রের কেন্দ্রবিন্দুর উপমাও প্রদান করেন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতিও তাঁর বেশ কয়েকটি গযলে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ও কম্পাসের রূপক ব্যবহার করে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' ব্যক্ত করেছেন:

صفات وذات چو از هم جدا نمی بینم

به هرچه می نگرم جز خدا نمی بینم

যেহেতু জাত ও সেফাত একে অন্য থেকে পৃথক নয়

যেদিকে তাকাই খোদা ভিন্ন কিছুই দেখিনা । (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ১৫৪)

আর হাফিযকে মহান প্রভুর সৌন্দর্যের আসন এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, দুনিয়ার কাজকর্মে তাঁর মন নেই। তিনি মাতাল অবস্থায় নির্ঘুমবহু রাত কাছিয়েছেন। এতে তিনি গর্ববোধ করে বলেছেন-

مرا بکار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نخفته ام بخیالی که میپزم شبها

خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১৯, তদেব, পৃ: ১১)

মৎকৃত অনুবাদ: দুনিয়ার কাজ-কর্মে আমার মনোযোগ ছিলো না

তোমার সাজানো-সুন্দর মুখটিই কেবল আমার নজরে/দৃষ্টিতে ছিলো।

আমি গর্বিত এ জন্য যে, এ চিন্তায় নিমগ্ন থেকে বহু রাত ঘুমাতে পারি নি,

বহুরাত আমি মাতাল থেকেছি, মদ্যশালা কোথায়?

১১৪

ঐশীবাদী মতবাদে এবং মুতাকাল্লিমদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টি (তথা কর্মের) কর্তা। সৃষ্টির সংখ্যা যত আল্লাহ্র এই কর্তৃত্বও তত। সবকিছুই স্বাধীনভাবে এবং মধ্যস্থতা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিকগণ বিভিন্ন সৃষ্টিক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমিকরূপে সৃষ্টিতে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ তাঁরা বলেন আল্লাহ্ প্রথম আক্লকে সৃষ্টি করেন, প্রথম আক্ল দ্বিতীয় আক্লকে সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় আক্ল তৃতীয় আক্লকে সৃষ্টি করেন। এভাবেই পৌঁছায় সক্রিয় আক্লে। তারপর সবশেষে পৌঁছায় অনুভব জগতে। মোটকথা আল্লাহ্র জন্য কর্মগত বহুত্ব মেনে নেন। কিন্তু কালাম শাস্ত্রজ্ঞগণ বহুত্বকে মাধ্যম ও মধ্যস্থতা ছাড়াই জানেন। তাঁরা মধ্যস্থতাসহ এবং মধ্যস্থতা ছাড়া, একটি সৃষ্টিশীলতার মধ্যস্থতা ছাড়া আর অশেষ স্রষ্টায়ীত্বকে মধ্যস্থতাসহ বিশ্বাস করেন। বিপরীতে আ'রেফগণ বিশ্বাস করেন, গোটা জগত একটিমাত্র তাজাল্লীর দ্যুতি, তার বেশি নয়। অনাদি অনন্ত পর্যন্ত তা আল্লাহ্র এক বিচ্ছুরণেই সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটাই সর্বস্ব। তাঁরা এই নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এ রূপেই অর্থ এবং ব্যাখ্যা করেন থাকেন- "আমার কাজতো একটি মাত্র।" (কামার: ৫০)।দার্শনিকগণ বলেন "কার্য ও কারণ"। আ'রেফগণ মূল কার্যকারণ তত্ত্বকেই ভুল মনে করেন। তাঁরা বলেন, কার্যকারণ সেখানে প্রযোজ্য হয় যেখানে আল্লাহ্র কোন দ্বিতীয় অস্তিত্ব থাকে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে তাজাল্লী এবং মুতাজাল্লী, যহুর (বা প্রকাশ) এবং মাযহার (বা প্রকাশস্থল)। কিন্তু সাদরা দর্শনে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কার্য-কারণের গবেষণাকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, যার ফলাফল তাজাল্লীর দ্বারা একীভূত হয়েছে। যেমন মোতাহ্হারী (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১১৫) অনূদিত একটি গযলে হাফিয বলেন–

তোমার চেহারার প্রতিচ্ছবি যখন পানপাত্রের আয়নায় পড়ে

আ'রেফ তখন শরাবের হাসিতে কাঁচা নেশায় মজে।

তোমার চেহারার সৌন্দর্য যখন এক ঝলক আয়নায় এসে পড়লো

এতসব নকশা তখন কল্পনায় উদ্ভাসিত হলো।

এতসব বিচিত্র সুরা আর রঙ্গিন নকশার ছবি যা প্রকাশ পেলো

সবই যে সাকির মুখের একটি মাত্র প্রতিফলন যা পানপাত্রে পড়লো

প্রেমের অহঙ্কার সকল খাস লোকদের জিহবাকে স্তব্ধ করে দেয়

তার বিরহের কথা কোথা থেকে সাধারণের মুখে মুখে ছড়ালো।

আমি যে মসজিদ থেকে শুঁড়িখানায় নষ্টপুরীতে পৌঁছেছি তাতো স্ব-ইচ্ছায় নয়

অনাদিকালের বিধানেই ছিল যা হয়েছে আমার পরিণাম।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সম্পর্কে শত শত জিজ্ঞাসা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষের মনকে আলোড়িত করে এসেছে। মানুষ নানাভাবে আল্লাহ্কে সন্ধান করেছে। আল্লাহ্র রহস্য সন্ধানী সুফি-সাধকগণও সর্বাগ্রে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন আল্লাহ্র সত্তার রহস্য। ধারণার বিভিন্নতা অনুযায়ী সুফি মরমীবাদকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন:

১.ইজাদিয়া

২.শহুদিয়া ও

৩.ওয়াজুদিয়া

'ইজাদিয়া' মতবাদী সাধকদের ধারণা, আল্লাহ্ অনস্তিত্বের মধ্য থেকেই এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজের 'সত্তা' তার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বলা যায় যে, শরীয়তপন্থী মুসলমানদের ধারণার সঙ্গে এ 'ইজাদিয়া' ধারণার সম্পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে।

'শহুদিয়া' মতের অনুসারীদের ধারণা, এ বিশ্বজগত ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র মহিমার বাস্তব বিকাশ দ্বারা এমন পরিপূর্ণভাবে আবৃত হয়ে রয়েছে যে, অপর কোন কিছুরই নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। এ মতের অনুসারী সাধকগণ মনে করেন যে, এ দুনিয়াটা হচ্ছে একটি দর্পণের মতো এবং এ দর্পণে আল্লাহ্র গুণাবলীই প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। এ ধারণাকে (Pantheism) বা সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত বলে মনে করা হয়।

'ওয়াজুদিয়া' মতের অনুসারীদের ধারণা, সমগ্র বিশ্বজগত এ একটি মাত্র 'সত্তা-ই' বিরাজমান, আর সে সত্তা হচ্ছে বহুমুখী বিকাশের মহিমায় মহিমান্বিত আল্লাহ্রই পরম সত্তা। সকল সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিদ্যমান, এরূপ ধারণা পোষণ করে এ মতবাদী সাধকগণ 'হামা ওস্ত' (সবই তিনি) মর্মবাণী গ্রহণ করে সাধন পথে অগ্রসর হয়েছেন। এ 'ওয়াজুদিয়া' মতবাদকে (Monism) বা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। (রহমান[৪৫] : ২০১২, পৃ: ৫৫)

আল্লাহ্র সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে সকল মতবাদী সাধকগণই মনে করে থাকেন যে, স্বয়ম্ভূ পরম সত্তা গোঁড়াতে ছিলেন নির্গুণ ও নিঃসম্পর্ক 'জাত' বা অস্তিত্বস্বরূপ। পরবর্তী পর্যায়ে এ অস্তিত্ব 'চৈতন্য সত্তা' রূপে বিকশিত হয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট হয়েই অবতারণ করেছেন। এ স্তরকে বহুরূপের মধ্যে ঐক্যের বিকাশ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। জামি তাঁর সুফিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিখ্যাত 'লাওয়াহি' গ্রন্থে বলেছেন–"বিভিন্ন পর্যায় ও অস্তিত্ব-রূপ হলো ঐক্যেরই বিস্তারিত অবস্থা"। কাজেই বলা যায় যে, 'ওয়াহ্দিয়াত' সংজ্ঞা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, পরম সত্তার বিভিন্ন বিকাশ বা অবস্থা মূলত 'এক' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ওয়াহ্দিয়াত'- এর পর্যায়ে আল্লাহ্র সত্তা যখন জীবন, জ্ঞান, শক্তি, উদ্দেশ্য, শ্রবণ, দর্শন ও কথন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে নিজেকে বিকশিত করে তোলেন, তখন তাকে বলা হয় 'লাহুত' বা ঐশী শক্তি। (রহমান[৪৫] : তদেব, পৃ: ৫৬-৫৭)

ইবনুল আরাবিকে 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বা আদর্শ বলে ধারণা করা হয়। যেমন তিনি বলেন-

There is only one being and the physical world is the manifestation of the one being. Nothing exixts beside the one being. যেমনিভাবে হাফিয (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১৯, পৃ: ১১) বলেন–

মৎকৃত অনুবাদ: প্রতিটি ফুল যা বাগানের সৌন্দর্য বাড়ায়

তাঁরই সাহচর্যের জন্য বর্ণ ও গন্ধ প্রবাহিত করে।

তুমি এই ভিখারীর প্রতি একটু দৃষ্টি দাও, কেননা

হাফিযের হৃদয়টা প্রেমের ধন-ভান্ডার ।

হাফিযের অধ্যাত্মবাদে জাবারিয়া মতবাদ

এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরী । প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা অন্যান্য জাতির মতো ভাগ্যে বিশ্বাস করতো । এই সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিতেন । আল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ও অস্বীকৃতির পরিণতি হিসেবে 'জাবারিয়া' সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । আরবি 'জাবর' শব্দ হতে 'জাবারিয়া' শব্দটি উদ্ভূত । 'জাবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধ্যতা, নিয়তি, অদৃষ্ট । অদৃষ্টবাদ বা আল্লাহ্‌তায়ালা'র

স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাস করার জন্য এই সম্প্রদায় 'জাবারিয়া' (অদৃষ্টবাদী) সম্প্রদায় নামে পরিচিত । জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর মূল বক্তব্য হচ্ছে- জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘটিত হয়ে থাকে । মানুষের কোনো ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই । মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয় । সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম শক্তির অধীন । মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত– তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে পুরষ্কার দেবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন । (হালিম[৭১] : ২০১২, পৃ: ৬৫) মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের একটি রক্ষণশীল অংশ 'জাবারিয়া' নামে পরিচিত । জাহম বিন-সাফওয়ান আবু মিহরাজ (মৃত্যু-৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । তিনি খোরাসানের গর্ভণর আল-হারিস বিন-সুরয়িজের সচিব ছিলেন । তিরমিযে তিনি তাঁর মতবাদ প্রথম প্রচার করেন । তিনি বলেন- 'বাস্তবিক মানুষ কাজ করে না, তবু রূপকার্থে সূর্য যেমন কিরণ দেয় কিংবা যন্ত্রের চাকা যেমন চলে বলে বলা হয়ে থাকে, মানুষও তেমনিভাবে কাজ করে বলে বলা হয়ে থাকে' । (হামিদ, ঢালী[৬৯] : ২০১০, পৃ: ৪০) উমাইয়া শাসকগণ জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁরা চরম অদৃষ্টবাদী ছিলেন । সম্ভবত নিজেদের অপকর্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে প্রচার করতেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত– তার কোনো স্বাধীনতা নেই । সুতরাং মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয় । (আলম[১] : ২০১২, পৃ: ২০৮)

শাহরিস্তানি জাবারিয়া সম্প্রদায়কে দুটো দলে ভাগ করেন, এক, গোঁড়া বা চরমপন্থী জাবারিয়া, দুই, মধ্যমপন্থী জাবারিয়া । চরমপন্থী জাবারিয়াদের মতে কোনো অর্থেই মানুষ কিছু করে বা মানুষের কার্যশক্তি আছে বলে স্বীকার করে না । মধ্যমপন্থী জাবারিয়াদের মতে মানুষের শক্তি আছে বলে স্বীকার করে, তবে সেই শক্তি কার্যের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না । শাহরিস্তানি জাবারিয়াদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা উল্লেখ করেন । যেমন: জাহনিয়া, নাজ্জারিয়া ও জাবারিয়া । নাজ্জারিয়া উপদলটি দুই শতাব্দী পরে আশারিয়া সম্প্রদায়ের রূপান্তরিত হয় । এই উপদলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাদের কোনো মতানৈক্য ছিলো না । তারা সবাই মানুষের অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিলেন । (হালিম[৭১] : তদেব, পৃ: ৬৬) *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন* গ্রন্থে (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ১৪২) উল্লেখিত জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ তাদের মতবাদের সমর্থনে পবিত্র কোরআন শরিফের যে সব আয়াতসমূহ তুলে ধরেছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. তোমার কাছে যে কল্যাণ আসে তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এবং তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তা তোমার নিজের কারণে (৪:৭৯);

২. আমরা তাদের প্রতি কোনো জুলুম করি নি বরং তারাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (১১:১০১);

৩. প্রতিটি বস্তুর ভান্ডার আমাদের কাছে এবং আমরা পরিজ্ঞাত পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি (১৫:২১);

৪. আমরা প্রত্যেকের ভাগ্য তার কাঁধে বেঁধে দিয়েছি (১৭:১৩);

৫. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না (২৩:৪৪);

৬. তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের তকদির (পরিমাণ) নির্দিষ্ট করেছেন (২৫:২);

৭. যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন; তিনিই আমাকে খাবার ও পানীয় দান করেন (২৬:৭৯-৮০);

৮. তারা (রাসূলগণ) বললো, "তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথে আছে" (৩৬:১৯);

৯. সূর্য তার গন্তব্যের দিকে ধাবমান, এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদির (৩৬:৩৮);

১০. যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং যে বিপদগামী হয় সে নিজের ধ্বংসের জন্যই তা করে (৩৯:৪১);

১১. তোমাদের ওপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল (৪২:৩১);

১২. যে সৎ কর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে; আর কেউ মন্দ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে (৪৫:১৫);

১৩. মানুষ যার জন্য চেষ্টা করে তা ব্যতীত আর কিছুই পায় না (৫৪:৩৯);

১৪. নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক বস্তুকে তকদির অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি (৫৪:৪৯);

১৫. তিনি মানুষকে শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার তকদির নির্দিষ্ট করেছেন (৮০:১৯);

১৬. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, পূর্ণতা দিয়েছেন, তকদির দিয়েছেন এবং তিনি হিদায়েত দান করেন (৮৭:১-৩);

১৭. আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছাক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, কারণ তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (২:২৮৪);

১৮. (হে রাসুল) বলুন, হে প্রভু, তুমিই রাজশক্তির মালিক। যাকে খুশি তুমি রাজত্ব প্রদান করো, আর যাকে খুশি রাজ্যচ্যুত করো। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমারই হাতে সমস্ত কল্যাণ এবং তুমিই সব বিষয়ে পরম শক্তিমান (১:২৬);

১৯. আপনি আপনার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন পরে সুসম্পন্ন করেছেন এবং তিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, তৎপর পথ প্রদর্শন করেছেন (৮৭:১৯)।

উর্পযুক্ত আয়াতসমূহের ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণ, বিধান ও সম্ভাবনা অনুসারে ঘটে। কোন বস্তু সৃষ্টির পর তার পূর্ণতা তকদির বা নির্দিষ্ট বিধান মতে সম্ভাবনা অনুসারে সঠিক পরিমাণে হয়। এ তকদির আল্লাহ্ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আছে। মানুষ মহিমান্বিত আল্লাহ্র নিয়মানুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পূর্ণতা লাভের সম্ভাব্য ক্ষমতা অর্জন করে এবং এ প্রদত্ত ক্ষমতার নাম তকদির। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু তবুও সে তকদিরের নিয়মের অধীন। মনীষীগণ তকদিরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন-

(১)তকদিরে হকিকি বা অপরিবর্তনীয় তকদির

(২) তকদিরে মালিকি বা পরিবর্তনশীল তকদির। (দ্রষ্টব্য : চিশ্তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ১৪২)

মানুষ চেষ্টা ও কর্ম দ্বারা যে সব বিষয়ের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, রুমির মতে তা-ই তকদিরে হকিকি, যেমন- জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি। তকদিরে হকিকিকে দর্শনের ভাষায় চিরন্তন ও স্থান-কালের উর্ধ্ব (লা-মাকান) বলা হয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্ প্রদত্ত

সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে যে-পরিবর্তন হয় তার নাম তকদিরে মালিকি। মানুষ স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে বিকল্প গ্রহণ করত চেষ্টার মাধ্যমে যে ফল লাভ করে তা-ই তকদিরে মালিকি। প্রত্যেক ধর্মই তকদিরে বিশ্বাস করে। সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে যে, তকদিরে যা লেখা আছে তা দ্বারাই সে পরিচালিত হয় এবং তকদিরলিপি অনুযায়ী মানুষের জীবনের সকল কার্য ও ঘটনা ঘটে। এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষ তার ইচ্ছা, চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতার পরিমাণ বা সম্ভাবনা অনুযায়ী কর্মের জন্য দায়ী। যার যতুটুকু বুদ্ধি বা জ্ঞান তার সে পরিমাণ দায়িত্ব। মানুষ স্বল্প বুদ্ধি, স্বল্প দৃষ্টি, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প চিন্তাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কতগুলো নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে। এ নিয়ম-নীতির নির্দিষ্ট মাত্রা, পরিমাণ ও সম্ভাবনাকেই তকদির বলা হয়। মানুষের জন্মের পূর্বেই সমস্ত বিষয় তার তকদিরলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তদনুযায়ী এ বিশ্বে তার কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। এ কথা যথার্থ। (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৪২)

ইমাম গায্‌যালি তকদিরলিপি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো- মানুষ তার তকদিরলিপি বাস্তবায়নের জন্যই কর্মসাধন করে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, কারো তকদিরলিপিতে দুর্ভাগ্য লেখা থাকলে আল্লাহ্ তার মনে এমন বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে দেন যা করলে তার দুর্ভাগ্য বাস্তবায়িত হয়। অথবা যার তকদিরে দোজখ ভোগ লিপিবদ্ধ আছে তাকে দিয়ে আল্লাহ্ কু-কর্মসমূহ করিয়ে ছাড়েন। অথবা যার তকদিরে বিদ্বান হওয়া লিপিবদ্ধ আছে তার মনে বিদ্যা শিক্ষার প্রবল আগ্রহ আল্লাহ্ জাগিয়ে দেন। ইমাম গায্‌যালির মত মেনে নিলে ঘুরে ফিরে সে কথাই এসে দাঁড়ায় যে, তকদিরলিপি বাস্তবায়নের অনুকূলে আল্লাহ্ ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, সৎ-অসৎ কাজ মানুষকে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে করিয়ে ছাড়ছেন। আবার সেই Horns of a dilemma এসে যায় যে, আল্লাহ্ই যখন মানুষকে দিয়ে পাপ কাজ করাচ্ছেন তখন তারা শাস্তি ভোগ করবে কেন? ইমাম গায্‌যালির মত মেনে নিলে কর্মের কোনো মূল্যায়ন থাকে না। অথচ পবিত্র কোরআনে বার বার বলা হয়েছে যে, মানুষের অর্জন বা উপার্জন অণু-পরমাণু পরিমাণও হিসাব করে প্রতিদান দেয়া হবে। (তদেব, পৃ: ১৪৩) সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাব্‌রি মতাদর্শন হচ্ছে বাধ্যবাধকতাবাদের বিষয়। এ মতবাদের অনুসারীরা হাফিয সম্পর্কে বলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের কোনো প্রকার স্বাধীনতা নেই। নিরঙ্কুশভাবেই সে বাধ্যগত, কর্তৃত্বহীন তথা অধীন। মানুষ যখন অনুভব করে সে পরাধীন তখন তার জন্য এই বিষয়টি খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই যন্ত্রণাটা তখন আরোও তীব্র হয় যখন সে অনুভব করে তার পরাধীনতা কোনো কিছুর বিনিময়ে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। হাফিযের অনেক কবিতায় এই যন্ত্রণারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন তিনি বলেন-

رضا به داده بده وزجبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشادست

من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

که به هر دست که می پرورم می رویم

مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی

چنانکه پرورشم می دهند می رویم

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

"যা লেখা হয়েছে তাতেই রাজী থাকো, কপাল থেকে গিরা খোলার কোন কাজ নেই,

কারণ আমার আর তোমার জন্যে স্বাধীনতার দরজা হয়নি খোলা-

আমি যদি হই কাঁটা কিংবা নয়নাভিরাম বাগিচার ফুল, এটাই ঠিক যে আমি যে মালির

হাতে প্রতিপালিত ঠিক তেমনি গজাবো-

আমার এই দুর্বা ঘাসের গালিচা হওয়া দোষ ধরো না, আমাকে যেমন প্রতিপালন করা হবে

তেমনই তো গজাবো আমি,

গোলাপ ও ফুলের ব্যাপারে এটাই বিধির বিধান যে, এটা হবে বাজারী প্রদর্শনীর নমুনা,

আর ঐটা পর্দানশীন।" (মোতাহ্হারী[৪০] : পৃ: ১৭৬)

আবার অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, যারা উচ্চতর স্তরে পৌঁছে গেছেন তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই । কারণ তারা পৌঁছাননি, তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছে। তিনি বলেন-

জিব্রাইল যদি মদদ করে পুনরায়, তাহলে

মসীহ যা করেছেন তা সম্পাদন করবে অন্যরাও ।

পবিত্র অন্তরাত্মাই দান গ্রহণের পাত্র হতে পারে; নতুবা, যে কোন ঢিল-পাথর তো

আর মণি-মুক্তা হয় না। (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৭৬)

তকদিরলিপি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানেও চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। The Encyclopaedia of Religion(vol. 5. 1987)- এ বলা হয়েছেFaithful in his theistic inheritance Isaac Newton (1642-1727 A.D.) interpreted his astronomical observation and calculations in terms of God's design. বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তকদির সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তার মতে, মানুষের জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষের শুক্রানু ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয় । পুং শুক্রানুর সেক্স ক্রোমজমের সিম্বলxy এবং স্ত্রী ক্রোমজমের সেক্স সিম্বল xxএ দুটোর মিলনের ফলে যে জাইগোট তৈরী হয় তার ভেতর DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) ও RNA (Ribonucleic Acid) থাকে। এই জাইগোট ধীরে ধীরে পুর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়। এ কোষের ঘরকে বলা হয় মাইক্রোকন্ড্রিয়া এবং কোষের যাবতীয় জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রন করে প্লাজমা মেমব্রেন। কোষের ভেতরে থাকে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিওপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন জড়বস্তুকে বলা হয় অরগাষ্টিক পদার্থ এবং এর তরল অংশকে বলা হয় হায়ালোপ্লাজম। এ কোষটি অতিসূক্ষ্ম আঠালো পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। হকিংস বলেন 'এ আঠালো পদার্থ এত ক্ষুদ্র যে, একটা বালুকণার কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। এটা এত আঠালো যে, পৃথিবী থেকে চন্দ্র পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেও এরelasticity অভাব হবেনা বা এতে কোন চিড় ধরবেনা। এ অতি ক্ষুদ্র আঠালো পদার্থটির ভেতর গাণিতিকভাবে মানুষের ভাগ্য লেখা আছে। মানুষ কী করবে, কী খাবে, কীভাবে কোথায় তার মৃত্যু হবে, তার পরিণতি কী হবে ইত্যাদি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে যা মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন, ২০০১ অনুষ্ঠানে উপাচার্য ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরীর ভাষণে স্টিফেন হকিংস- এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- 'জীব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে হিউম্যান জিন্স্ প্রকল্প সার্থকভাবে শেষ হয়েছে। তিনশ কোটি DNA Base Paris-এর মাধ্যমে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল কর্মকান্ড, হোক তা চিন্তাশক্তি অথবা শারীরিক অবকাঠামো, রোগ সংবেদনশীলতা, জীবন বা মৃত্যুর সম্ভাবনা, সংকেত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানের এসব তথ্য ও তত্ত্ব শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মহিমান্বিত আল্লাহ্র মহত্বের প্রতি স্বাভাবিকভাবে মাথা সেজদাবনত হয়ে পড়ে। একই সাথে পবিত্র কোরআনের শাশ্বত ও অবিসংবাদিত তত্ত্বের জন্য আনন্দে বুক ভরে যায় এই ভেবে যে, পবিত্র কোরআনে

আল্লাহ্ যে-সব বিষয় বান্দার জন্য প্রেরণ করেছেন তা বিজ্ঞান বহু কষ্ট করে গবেষণার মাধ্যমে কিছুটা হলেও বের করতে সক্ষম হচ্ছে আর তাতে পবিত্র কোরআনের মহত্ব দিন দিন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে।

কিয়ামত সর্ম্পকে হাফিযের ধারণা

হাফিযের বেশ কিছু কবিতায় কিয়ামতকে অস্বীকার করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আসলে সেখানে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট নয় যে কিয়ামত বলে কিছু আছে কি-না । তিনি মানুষকে এ সব বিষয়ে চিন্তা করে শক্তি ক্ষয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করে বলেন যে, যেহেতু জগতের কর্মকান্ড সবই শুন্য, জগতের রহস্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়, সর্বত্রই নিরঙ্কুশ বাধ্যবাধ্যকতা ক্রিয়াশীল, অতএব আমরা কেউ জানি না পুনরায় আবার একত্রিত হতে পারবো কি-না । বরং কখনো আবার আস্থার সাথে বলেন আসলে আমরা পুনরায় আর একত্রিত হবো না। তিনি বলেন-

بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن

فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن

বন্ধুর ঠোঁটে চুমু খেতে ছেড়না প্রথমেই

কারণ হাত আর ঠোঁট থেকে তুমি বিরক্ত হবে অবশেষে

সুযোগ মনে করো এই কথা যে এই দুই পথের মিলন মঞ্জিল

পার হয়ে গেলে একসাথে মেলা যাবেনা আর। (উদ্ধৃতি : মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৭৯)

অন্য একটি বিখ্যাত গযলে তিনি বলেন-

মদ্য ও পেয়ালার চাইতে সুখ চিন্তা কি আছে আর

তারপর না হয়, দেখা যাক শেষ পরিণাম কি দাঁড়ায়

মনের দুঃখ আর কতো সহ্য করা যায় দিন তো ফুরিয়ে যায়

যেন মনও নেই, সময়ও নেই কি হবে এখন

পান করো মদ, দুঃখ করো না, হুজুরের উপদেশ নিও না

সাধারণের কথার মূল্য কি আর শুনে

তোমার শ্রেয় পারিশ্রমিক এটাই যা ভোগে কাজে লাগে

জানো তো যে, শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত থেকে কি হবে লাভ। (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৭৯)

আবার অন্য একটি গযলে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, তিনি হয়তো কেয়ামতের দিন বিজয়ী হতে পারবেন না। অর্থাৎ তাঁর প্রেমাস্পদকে খুঁজে পাবেন না। তিনি বলেন এই সৃষ্টি জগতে যা কিছু অস্তিত্বমান সবই মহান আল্লাহ্পাকের নেয়ামত। আর তাই

তিনি স্বীয় প্রভুকে পাবার জন্য অনবরত ক্রন্দন করছেন। তার বিশ্বাস হয়তো কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর প্রেমাস্পদকে খুঁজে পাবেন। যেমন তিনি বলেন-

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده‌اند بـه مستی زمام ما
ترسم کـه صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی‌فشان
باشد کـه مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلـک و کشتی هلال
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৪, তদেব, পৃ: ৩)

Intoxication pleases my Beloved and my Lord

To the wine, they would assign, my life's design.

What if on Judgment Day, no favor would be gained

From eating bread and leaving a forbidden water so fine?

Hafiz, let a tear drop or two leave your eyes,

May we ensnare the Bird of Union, divine.

The sea of the skies and the gondola of the moon

With the grace of the Master, radiantly shine. (Ghazal 11: www.hafizonlove.com)

ফানা ও বাকা

'ফানা' আরবি শব্দ । এর অর্থ হলো বিনাশন। এই শব্দের অর্থ আত্মবিশ্বাসও হয় । তবে এর অর্থ আত্মার ধ্বংস নয় । কেননা আত্মা অমর, শ্বাশত ও চিরন্তন। আসলে 'ফানা' হলো আত্মগরিমা, আত্ম-অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, নিন্দা, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে আল্লাহ্‌র গুণাবলী লাভ করা। যার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র সিফাতের মাঝে মানবীয় সিফাত বিলীন করে দেওয়া এবং সবশেষে আল্লাহ্‌র মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে নিজস্ব অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'ফানা'। সাধক যখন খারাপ দোষ পরিত্যাগ করে নিজের কু-প্রবৃত্তিকে বিলীন করে দেয় তখন (عالم وحدت)এ পরিণত হয় এবং নিজেকে বিলীন করে দিয়ে (مقام بقا)-তে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন-

هرکه در دریای او گم بوده شد

دائما گم بوده و آسوده شد

"যে ব্যক্তি সমুদ্রের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে

যদিও সে চিরদিনের জন্য নিজেকে হারিয়েছে, তবুও সে পরিতৃপ্তি পেয়েছে।" (রশিদ[৪২] : ১৯৮৪, পৃ: ১৭১)

পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনই হচ্ছে সুফিবাদের একমাত্র কাম্য। এ মিলনের দুটি দিক রয়েছে। নঞর্থক ও সর্দথক। নঞর্থক দিকটি হচ্ছে 'ফানা' আর সদর্থক দিকটি হলো 'বাকা'। 'ফানা' শব্দের অর্থ বিলোপ। এ অবস্থায় সালেকের বস্তু চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার বিলোপ ঘটে। তবে জাগতিক বস্তু সম্পর্কে চেতনার বিলুপ্তি সুফি সাধনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। জাগতিক চেতনার বিলুপ্তির মাধ্যমে সুফিগণ আল্লাহ্‌র চেতনা লাভ করেন। এ চেতনাই হচ্ছে 'বাকা'। অতএব বলা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর সব কিছুর বেলায়ই 'ফানা' প্রযোজ্য। কিন্তু 'বাকা' শুধু আল্লাহ্‌র বেলায়ই প্রযোজ্য। (নূরী[২৬] : ২০১৩, পৃ: ৬৫)এই ফানা সম্পর্কে হযরত রাসুল (সাঃ) বলেন- "মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর"। এই মৃত্যু বা ফানা বরণ করতে হলে প্রেমই হলো একমাত্র মাধ্যম। তাই নিজের অস্তিত্ববোধকে অসীম অস্তিত্বের মাঝে হারানোর জন্য সাধক এ সময় প্রেমের শরাব পান করেন। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর অনূদিত মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

প্রেমিকের প্রতি যদি প্রেমাস্পদের দয়াদৃষ্টি না থাকে

তখন সে পালকহীন পাখি, আফসোস তার অসহায়ত্বে। (রুমী[৪৩] : তদেব, পৃ: ৩৫)

এফ ষ্টেইনগাসের আরবি-ইংরেজী অভিধানে 'ফানা' অর্থ লেখা হয়েছে- Perishableness, nothingness, non-existence. এছাড়া বিভিন্ন অভিধানে 'ফানা' শব্দটির ইংরেজী অর্থ হচ্ছে- Death, Demise, Depature, Decease, Waste, Destruction, Extinction, Finishing, Wreckage, Satan, Licking, Beating, Striking, Endless sleep, Everlasting, Sleep, Eternal sleep, Rebirth, Subsidence, Retreat, Departure, Removal, Flight, Break, Deduction, Subtraction, Separation, Breakage, Disappearance, Evanescence, End, Depth, Bottom, Condition, Limit, Termination, Beyond, Heightening, Leaping over, Development, Extinction,Cancellation,Quietus,Annulment,Dying,Restraint,Continence,Slowness,Loss,Impairm -ent, Inertia, Emergency, Waste, Annihilation, Elapsing, Renunciation, Abstinence, Cessation, Destruction, killing, Ruin, Inversion, Reversion, Infringement, violation, Exception.

যুক্তিবাদী সুফি দার্শনিক ইবনুল আরাবি (মৃত্যু-৬৪১ হিজরী/১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) 'ফানা' শব্দের অর্থ নিম্নরূপ বুঝিয়েছেন-

১. অতীন্দ্রিয় অর্থে 'ফানা' হলো- অজ্ঞানতা হতে দূরে চলে যাওয়া বা মুক্তি লাভ করা । 'ফানার' মধ্যে সাধক নিজ আত্মার বিলুপ্তি সাধন করে না বা নিজ আত্মা ত্যাগ করে না বরং একটি 'আকার' হিসেবে তার অনস্তিত্বকে বুঝতে পারেন।

২. তাত্ত্বিক অর্থে 'ফানা' হলো- অবভাসিক (Phenomenal world) জগতের বিভিন্ন আকার হতে চলে যাওয়া বা মুক্ত হওয়া এবং এর সার্বিক দ্রব্যের মধ্যে অবস্থান করা বোঝায়। তিনি এ সম্পর্কে বলেন যে, একটা আকারের 'লয়প্রাপ্ত হওয়া' বা পরিবর্তন হওয়ার নামই 'ফানা'। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ নিজেকে একটি আকার হতে অন্য একটি আকারের মধ্যে প্রকাশ করতে চান তখন প্রথম আকারটি পরিবর্তন করে নতুন আকার ধারণ করেন। এই প্রথম আকারের পরিবর্তন সাধনের নাম হলো 'ফানা'। অন্যদিকে তিনি 'বাকা' শব্দ দিয়ে সমগ্র ঐকের একত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত লাভ করা ও ঐশী জ্ঞানের মাঝে চিরন্তনরূপে বিরাজ করা বুঝিয়েছেন। (সরকার[৬০] : তদেব, পৃ: ১৪৮)

মহাকবি হাফিযও ফানাতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাবলী রচনা করেছেন।'Prayer of Love and Death' শিরোনামে ফানাতত্ত্ব বিষয়ক হাফিযের একটি গযল অনুবাদ করেছেন A. Z. Foreman. যেমন-

مژده وصل تو کو کز سر جان بر خیزم

طایر قدسم و از دام جهان بر خیزم

به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و مکان بر خیزم

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

پیشتر زان که چو گردی ز میان بر خیزم

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

تا به بویت ز لحد رقص کنان بر خیزم

خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات

کز سر جان وجهان دست فشان بر خیزم

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش

تا سحرگه ز کنار تو جوان بر خیزم

روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

تا چو حافظ ز سر کون و مکان بر خیزم

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৮০, তদেব, পৃ: ১৭১)

Send word we'll meet! From this life to you there I will arise!

I'm heaven's bird, and from this worldly snare I will arise.

Upon your love, if you should summon me to be your slave

From all existence and its rule, I swear I will arise.

Lord! Bid your cloud of guidance send its sweet rains on me soon,

For soon as scattered dust blown everywhere I will arise.

Come sit beside my dust with wine and song. Then, dancing out

From my deep grave, drawn by the scent you bear, I will arise.

Arise, my love. Display to me your stature and your grace.

Clapping my hands, freed of this world we wear, I will arise.

Though I am old, hold me all through the night in your embrce

Then from your side young in the morning's air I will arise.

The day I die grant but a breath of time to see your face.

As Hafiz then, from this world's when and where, I will arise. (http://poemsintranslation .blogspot.com)

ইবনুল আরাবির পূর্বে ফানাতত্ত্বের ওপর এত ব্যাপক আলোচনা আর কেউ করেন নি। তিনি 'ফানার' দুটি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন-

১. ফানার এক অবস্থা হলো– আত্মার সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন। এই অবস্থাকে নিদ্রার সাথে তুলনা করা যায়।

২. ফানার দ্বিতীয় অবস্থা হলো– স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের এক তন্ময় অবস্থার মধ্যে আত্মার বিলুপ্তি সাধন । এই অবস্থায় সাধকদের কাছে পরমাত্মার সামগ্রিক ঐক্য প্রকাশ পায়। (সরকার[৬০] : তদেব, পৃ: ১৪৮)

ইবনুল আরাবির মতে 'ফানা' সাতটি ধারাবাহিক স্তরের বা পর্বের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়া। 'ফানা'র প্রত্যেক স্তরের সাথে সাথে একটি করে 'বাকা'র স্তর রয়েছে। যা ত্যাগ করা হয় তা অবভাসিক ও 'ফানা' যে অবস্থায় উন্নীত হয় তাই তখনকার 'বাকা'। 'ফানা' ও 'বাকা' একই জিনিসের দুইটি দিকমাত্র। 'ফানা' বাহ্যিক দিক আর 'বাকা' অভ্যন্তরীণ দিক। আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই 'ফানা' হবে। সর্বশেষে 'বাকা' বলতে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই বুঝায়। ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী গ্রন্থে (সরকার[৬০] : তদেব, পৃ: ১৪৯-১৫১) উল্লেখিত ফানার সাতটি স্তর নিম্নরূপ:

১. প্রথম স্তরে সুফি সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকার পণ করেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশকেই তিনি একমাত্র যথোচিত বলে মনে করেন।

২. এই ধাপে সুফি সকল প্রকার কার্য থেকে বিরত থাকেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র পরমসত্তা এবং বিশ্বের একমাত্র চালক।

৩. এই পর্বে সুফি উপলব্ধি করেন যে, জাগতিক বস্তুর গুণাবলী মূলত আল্লাহ্‌র গুণাবলী থেকে উৎসারিত, কাজেই আমরা যা শুনি বা দেখে থাকি- এই সমস্ত গুণাবলীই আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে দান করেছেন।

৪. চর্তুথ স্তরে সুফির 'ফানা'র বিলোপ ঘটে। তিনি তখন তাঁর প্রতিভাসিক সত্তার অস্তিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী পরমসত্তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হন।

৫. এই স্তরে সুফি পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত মহাসত্যকে উপলব্ধি করেন এবং জাগতিক চিন্তা-ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি তখন একমাত্র পরমসত্তার চিন্তায়-ই আত্মনিয়োগ করেন এবং একমাত্র তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন।

৬. এই পর্বে 'ফানা' বলতে এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছুকে জাগতিক বস্তুর পরিবর্জন বা পরিত্যাগকে বুঝায়। এখানে সাধকগণ আল্লাহ্‌র অসংখ্য অবস্থা এবং বিভিন্ন প্রকাশের প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি অনুভব করেন।

৭. সপ্তম স্তরে আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলী হতে 'ফানা' হতে হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বিশ্বের কারণ হিসেবে চিন্তা না করে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তারূপে ধ্যান করতে হয়। এই ধাপে সুফির ভাবনা হলো এই বিশ্ব পরমসত্তার প্রকাশস্থল মাত্র। অদ্বৈতবাদী দর্শনের এটাই সর্বশেষ রূপ। যেমন-কবি হাফিয তাঁর একটি চমৎকার গযলে বলেন-

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است
در مذهب ما باده حلال است ولیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است
در مجلس ما عطر میامیز که ما را
هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است
از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر
زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است
تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کوی خرابات مقام است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
با محتسبم عیب مگویید که او نیز
پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کایام گل و یاسمن و عید صیام است

(www.hafizonlove.com)

Amidst flowers, wine in hand, my lover I embrace

King of the world is my slave on such a day in such a place.

Bring no candles to this, our festive feast, tonight

Full moon is pale beside the light of my lover's face.

Drinking of wine, our creed has sanctified

Yet without you, drinking wine is disgrace.

My ears only hear the song of the harp and the reed

My eyes see your ruby lips, and the cup chase.

Keep perfumes away from our feast tonight

The fragrance of your hair, our feast will grace.

Speak not to me of sweetness of candy and sugar;

Since my lips, sweetness of your lips, did once trace.

Your treasures are hidden in the ruins of my heart

And my path to the tavern has now become sacred space.

Speak not of disgrace; that's my fame and my base

And fame and high place, I despise and debase.

Drunk and disconcerted and demented and deceived

Show me one who's not, within our town and our race

Fault not the pious one, because he, also, like us,

Is seeking love and grace, in his own way, at his own pace.

Hafiz, wine in hand, always your lover embrace

Cause flowers and joy fill this festive time and space. (Ghazal 46 : www.hafizonlove.com)

ইবনুল আরাবির পর জালাল উদ্দিন রুমি (মৃত্যু- ৬৭২ হিজরী/১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর কাব্যে সুফি দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'মসনবি' ও 'দিভা'ন-ই-শামস তাবরিযি' আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র ও সুফিদর্শনের মধ্যমণি। তিনি তাঁর গ্রন্থে ফানাতত্ত্ব অতি চমৎকারভাবে কাব্যিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

مردان خدا گر خدا نباشد

لیکن ازخدا جدا نباشد

"মানুষকে খোদা কয়, মানুষ খোদা নয়

কিন্তু মানুষ থেকে খোদা পৃথকও নয়।" (হাদী[৭৪] : ২০১৫, পৃ: ১৭০)

রুমির মতে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। কেউ তাঁর মধ্যে বাস না করলে বেঁচে থাকার আশা করতে পারে না। যিনি ফানা হন তিনি সার্বিক মরণশীল নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি বলেন যে, ফানা হওয়ার অর্থ ধ্বংস হওয়া নয়; এটা একটা পরিবর্তন মাত্র। প্রতিপালকের পরম সত্তায় অস্তিত্বশীল অবস্থায় বেঁচে থাকার মানেই পরশমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনায় রূপান্তরিত হয়- তদ্রূপ পরিবর্তন। তিনি আরো বলেন যে, আগুনে পোড়ালে লোহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে গৌরবান্বিত হয়ে যদি বলে 'আমি অগ্নি'; কারো সন্দেহ থাকলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখো, ফানাপ্রাপ্ত মানুষের অবস্থাও ঠিক একই রকম। মহিমান্বিত আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে বলেন-

১. (বলো) আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি; রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর। (আল- কোরআন-২:১৩৮)

২. আল্লাহ্‌র প্রকৃতির (ফেতরাত) অনুসরণ করো, যে প্রকৃতিতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (আল- কোরআন-৩০:৩০)

(চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৩৩-৩৪)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা হাদিস-ই-কুদসিতে বলেন-

"যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন তাকে আমি এমনভাবে বন্ধু বলে জানি যে, আমি তার কান হই, যা দ্বারা সে শোনে; আমি তার চোখ হই, যা দ্বারা সে দেখে; আমি তার হাত হই, যা দ্বারা সে ধরে; আমি তার দুটি পা হই, যা দ্বারা সে চলে।" মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেন-

اگر گردی تو در توحید فانی

بحق یاری باقی زندگانی

"ফানা হয়ে যদি তাঁর একত্ববাদের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারো

তবে তুমি বন্ধুরূপে তাঁর সত্তায় স্থিতি তথা বাকা লাভ করতে পারবে।" (রশিদ[৪২] : তদেব, পৃ: ১৬৪)

উপমহাদেশের আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী বলেছেন-

মনসুরের মতো আমি ফানার আস্তানায় গিয়েছি

বাকার শত নূর সেখানে আমাকে আলিঙ্গন করেছে।

তুমি যদি তাঁর চেহারা দেখতে চাও, আমার চেহারার দিকে তাকাও

আমি তাঁরই দর্পণ, সে আমার থেকে পৃথক নয়। (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৩৪)

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির সিলসিলার প্রখ্যাত সুফি সাধক আমির খসরু বলেন-

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی

تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تودیگری

"আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ হলাম, তুমি প্রাণ হলে

এরপর কেউ যেন বলতে না পারে– আমি একজন, তুমি আরেকজন।" (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৩৪)

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (মৃত্যু-৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ/২৬১হিজরী) সর্বপ্রথম ফানাতত্ত্ব প্রর্বতন করে সর্বেশ্বরবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। বায়েজিদ মনে করতেন আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হয়ে সুফিগণ আত্মবিলোয় ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করলে উপাসক ও উপাস্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ ঐশী প্রেমের মওতায় একদিন বায়েজিদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো- "পবিত্রতা আমার, শ্রেষ্ঠতম গৌরব আমারই"। মওতার অবসান ঘটলে উপস্থিত ভক্তগণ তাঁকে তাঁর বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন- "হায়! সর্বনাশ! তোমরা আবার কখনো আমার মুখে এরূপ কথা শোনামাত্রই আমাকে মেরে ফেলো"। এরপর অন্য একদিন মওতাবশতঃ তিনি পুনরায় একই বাক্য উচ্চারণ করলে ভক্তগণ তাঁকে কতল করতে উদ্যত হলো। তখন তারা দেখতে পেলো সারা ঘরে হাজার হাজার বায়েজিদ অবস্থান করছেন। ফলে কাকে তারা কতল করবে তা নির্দিষ্ট করতে পারলো না। অপর একদিন আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত অবস্থায় বায়েজিদ বলেছেন- "প্রকৃতপক্ষে আমিই আল্লাহ্‌, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর"। এমন কথা নবিকুল শিরোমণি সরওয়ারে কায়েনাদ রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো প্রকাশ্যে বলেন নি;

কিন্তু বায়েজিদ বলেছেন এবং তাঁর পরবর্তী সুফি দার্শনিকগণ এটা সর্মথন করে বলেছেন যে, তন্ময়তার স্থান সকল প্রকার নৈতিকতা, প্রার্থনা ও জ্ঞানের উর্ধ্বে। (তদেব, পৃ: ৩০)

ইরানের আধুনিক কবি মুহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ারও এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন-

সজাগ হও, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে

এই জগতের পরিপূর্ণ মুক্তি কোথায় পাবে?

তাও কোনো জ্ঞান দিয়ে যার মধ্যে না আছে আধাত্মিকতা, না আছে আত্মসর্মপণ

তোমার হৃদয়ের ব্যাথার মাঝেই খুঁজে দেখো, ঔষধ খুঁজে পাবে। (হাদী[৭৪] : তদেব, পৃ: ১৭২)

বায়েজিদ আল্লাহ্‌র আহাদিয়াত তথা ঐকল্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই নিজের মধ্যে বায়েজিদকে না দেখে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে দেখেছেন। যে তন্ময়তা বা মত্ততায় আবিষ্ট হয়ে তিনি এসব উক্তি করেছেন সে অবস্থাকেই 'ফানা' নাম দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ফানাতত্ত্বের কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। তাই বলে এ কথা বলা যাবেনা যে, তিনি অকস্মাৎ ফানাতত্ত্ব ইসলাম দর্শন প্রক্ষেপ করেছেন। ইসলামের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও অনেক আধ্যাত্মিক বাণী ছিলো। সভ্যতার উন্মেষ হতেই মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে যোগসূত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে স্রষ্টাকে জানার ও চেনার উপায় খুঁজতে থাকে। তাইতো সক্রেটিস বলেছিলেন–Know thyself (অর্থাৎ নিজেকে চেনো)। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ফানাতত্ত্ব বিষয়ক বহু উদ্ধৃতি রয়েছে। রাসুলে পাক (সাঃ) এর শিক্ষার মধ্যে ফানাতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আসহাবে সুফ্‌ফার সদস্যগণ শুধুমাত্র ইবাদত করার জন্য মসজিদে নববির বারান্দায় পড়ে থাকতেন না। তাঁরা কোরআন দর্শনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু প্রথমত খেলাফত ও পরবর্তীতে অজ্ঞ উমাইয়া ও আব্বাসিয় রাজত্বের দোর্দন্ড প্রতাপে এসব দার্শনিক বিষয় কেউ প্রকাশ করতেন না। তা না হলে কেন আবু হোরায়রা চিৎকার করে বলেছিলেন- "রাসুল (সাঃ) আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন যা প্রকাশ করলে তোমরা আমার খাদ্যনালী কেটে ফেলবে"। উমাইয়াদের পতনের পর দু একজন ছিলেন একটু আলাদা। এদের মধ্যে বায়েজিদই প্রথম। বায়েজিদের পর মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু-৩১০ হিজরী/ ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'আনাল হক' (আমি চিরসত্য) তত্ত্ব প্রকাশ করে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর 'আনাল হক' তত্ত্ব ফানা তত্ত্বের নামান্তর মাত্র। হাল্লাজের সমসাময়িক সুফি ওমর ইবনে ফরিদ তাঁর 'আনা হিয়া' (আমিই সে) তত্ত্ব প্রকাশ করেন।কবি হাফিয আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের দিনটিকে পবিত্র 'লাইলাতুল কদরের' রাতের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি অতি চমৎকার একটি গযলে বলেন-

ধন্য খোদা, মিললো আমার মহাশ্বৈর্য আজকে রাত,

এলো আমার দীন কুটীরে মোর মানসী অকস্মাৎ,

রূপ মাধুরী দেখার আশায় করনু আমি প্রণিপাত,

ধন্য খোদা, তোমার শোকর, সফল আমার আজকে রাত,

আমার জীবন-তরু বুঝি মুঞ্জরিলো স্পর্শে তার

ধন্য হলো জীবন মম দর্শনে মুখ চন্দ্রমার,

আজকে আমার রক্ত-কণা করবে সৃষ্টি 'আনাল হক'

মনসুর আমি হলেম আজি, শূলে আমার শান্তি হোক,

শব-কদরের মহাপুণ্যে আজকে আমি পুণ্যবান

রাত্রি জেগে ধন্য হলুম পেয়ে প্রিয়ার স্পর্শখান।

সাধ জাগে মোর, যাক গে জীবন, যেমন গেলো মনসুরের

ফেলব খুলে আজ নিশিতে পর্দা ঘন রহস্যের।

১২৯

বধু তুমি বিত্তশালী আমি দীন বিত্তহীন

রূপের যাকাত দিয়ো আমায়, হয়ো না কো হৃদয়হীন।

ভয় করে মোর হাফিজ বুঝি লয় পাবেগো আজ নিশায়

আজকে রাতে যে-কোলাহল ভীড় করেছে তার মাথায়। (হাফিজ[৬৪] : ১৯৮৪, গযল নং-১০)

সুফি জগতের প্রাণ তাপসগুরু শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (মৃত্যু-৬২৭ হিজরী/১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' রচনা করে সুফি দর্শনের দিগন্ত উন্মোচন করেন। তিনি তাঁর 'মান্তেকুত তায়ের' (পাখীদের কথোপকথন) গ্রন্থে অতি চমৎকার রূপকের মাধ্যমে ফানাতত্ত্বের পর্যালোচনা করেন। এ গ্রন্থের উপাখ্যান হলো ঃ বনের সকল পাখী এক হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ হুদহুদ পাখীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা আরম্ভ করে। পাখীরা একজন বাদশাহ নির্বাচনের ঐকমত্য প্রকাশ করে। হুদহুদ বললো পাখীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সী-মোরগ এবং সে সপ্ত উপত্যকার পরপারে 'কাফ' নামক স্থানে অবস্থান করে। সকল পাখী সী-মোরগকে দেখার অভিলাষ প্রকাশ করলে হুদহুদ জানায় যে, সেখানে যাবার পথ দুর্গম। আলোচনা শেষে পাখীরা হুদহুদকে পথ প্রদর্শক হিসাবে মনোনীত করে। যাত্রার সময় উপস্থিত হলে দেখা গেলো প্রায় সকল পাখী মুখ ভার করে বসে রয়েছে। বুলবুল গোলাপ বাগান ছেড়ে যেতে চায় না, তোতা অপরূপ দেহ নিয়ে বিদেশে যেতে নারাজ, হাঁস জলপথ চায়, পেঁচা চায় রাতের অন্ধকার ও ভাঙ্গা বাড়ি এবং বাজপাখী রাজার প্রিয় বলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। হুদহুদ যুক্তি দিয়ে পাখীদের আপত্তি খন্ডন করলে হাজার হাজার পাখী যাত্রা শুরু করে। সী-মোরগের কাছে পৌঁছতে যে সাতটি উপ্যত্যকা অতিক্রম করতে হয়ে তা নিম্নরূপ–

১.সন্ধানঃ এখানে সঠিক পথ নির্বাচনের জন্য ধৈর্য ধারণ করে কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং জড় জগতের আকাঙ্খা ত্যাগ করতে হয়। অনেক পাখি এসব মেনে চলতে না পেরে এ উপত্যকায় বাদ পড়ে যায়;

২.প্রেমঃ অবশিষ্টরা এ উপত্যকায় পৌঁছে। কিন্তু এটি আরো কঠিন। এখানে প্রেমিকের ধৈর্য, সহনশীলতা, দারিদ্র ও বিশ্বাসের অগ্নি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করে এবং অনেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। ফলে এ উপত্যকায়ও অনেক পাখি বাদ পড়ে যায়।

৩.জ্ঞান ঃ প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকার আর্কষণে এ উপত্যকায় উপনীত হয়। এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতামূলক বা প্রজ্ঞামূলক জ্ঞান নয়। এ জ্ঞান হলো– হৃদয় ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আত্মা-পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ করে এবং প্রেমিক প্রেমাস্পদের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে বেহুশ হয়ে পড়ে। যারা এ জ্যোতি বহনের ক্ষমতা লাভ করে না তারা সম্মুখ পানে আর অগ্রসর হতে পারে না;

৪.নির্লিপ্ততাঃ এ উপত্যকায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অনটন, লোভ-লালসা, মোহ-মায়া থেকে পথিক মুক্ত হয়ে যায়।

৫.একত্বঃ পার্থিব জগতের সকল আর্কষণমুক্ত হয়ে পথিক 'একত্ব' উপত্যকায় উপনীত হয়। এখানে সে সকল বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মাঝে পরম ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে;

৬.বিস্ময়ঃ এ উপত্যকায় পথিক এত বিহ্বল হয়ে পড়ে যে, আমি, তুমি, এক ও বহু ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারে না। তারা নিজেরা বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না। তাদের প্রেমিকাকে তারা চিনে না এবং কেন ভালোবাসে তাও জানে না। কেন এ পথ অবলম্বন করে পাড়ি জমিয়েছে তাও বোঝে না। তাদের ধর্ম কী সে কথার উত্তর তাদের কাছে পাওয়া যায় না।

৭.আত্মবিলোপনঃ এ উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে প্রেমিক সকল আত্মচেতনা হারিয়ে ফেলে এবং কালা, বোবা, নির্বাক-নিঃসাড় হয়ে পড়ে। প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক থেকে বিছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদে 'ফানা' হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক ও

অভিন্ন হয়ে যায়। (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৩২)

হযরত ইমাম গায্‌যালি (রহঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সা'আদত' এর তৃতীয় খন্ডের সম্পূর্ণটুকু বিনাশন বা ফানা সম্পর্কিত। এ গ্রন্থে তিনি ১০টি পরিচ্ছেদে ১০টি বিষয় বিনাশন করে তার বিপরীতে গুণ অর্জন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে বিষয়গুলো বিনাশন করতে বলেছেন তা হলো–

১. মন্দ স্বভাব

২. অতিরিক্ত কামভাব এবং ভোজন লিপ্সা

৩. অতিরিক্ত কথনস্পৃহা

৪. ক্রোধ ও ঈর্ষা

৫. সংসারাসক্তি

৬. অর্থলিপ্সা ও কৃপণতা

৭. মান মর্যাদা ও সুযশের লিপ্সা

৮. ইবাদতসমূহে রিয়াকারী (লোক দেখানো মনোভাব) এবং মুনাফেকী (কপটাচার)

৯. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং

১০. গূরূর অথার্ৎ মন্দকে ভালো মনে করা এবং গাফলত অর্থাৎ ধর্মে-কর্মে অবহেলা শিথিলতা ও অমনোযোগিতা । (গায্‌যালী[১৭] (রঃ) : ২০০৯, পৃ: ৩৪০)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ফানা হলো- বিনাশন বা ধ্বংস। এ বিনাশন ব্যক্তির বিনাশন নয় বা ব্যক্তিসত্তা ধ্বংস করে সমাজ, জীবন, কর্ম পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ধ্যানে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা অর্থে যদি ফানা গ্রহণ করা হয় তা হলে দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানবকল্যাণ ইত্যাদি স্থবির হয়ে পড়বে। আত্তার ও আরাবি ফানা স্তরে উন্নীত হবার যে ৭টি স্তর দেখিয়েছেন তাতে উভয়ই সংসার ত্যাগ বা বিরাগী জীবনের কথা বলেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি যদি সংসার বিরাগী হয়ে পড়ে তাহলে সৃষ্টির ক্রমবর্ধিষ্ণুতা স্থবির হয়ে

পড়বে। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। অবশ্য আত্তার তাঁর হুদহুদ পাখীর রূপকে বলেছেন ৭টি স্তরের বিভিন্ন স্তরের বেশির ভাগ পাখী ঝরে পড়েছে। হাজার হাজার পাখীর মধ্যে মাত্র ত্রিশটি পাখী সী-মোরগের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। কাজেই অবশিষ্টদের জন্য ফানা হবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য– এ ষড়রিপুকে, সকল কু-প্রবৃত্তিকে, সকল মন্দকে ধ্বংস করে আল্লাহ্‌র ঐকল্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তাঁর ইবাদত সম্পন্ন করা ও আমলে সালেহায় (কল্যাণকর কাজে) প্রবৃত্ত হওয়া। এ ফানা সমাজকে সঠিক সুন্দর ও শান্তির আকর করে দেবে। নিম্নে ফানা বিষয়ক একটি রূপক গল্প বর্ণিত হলো-

একদিন একলোক জরুরী প্রয়োজনে বিদেশ থেকে তার নিজের এলাকায় যাওয়ার জন্য যাত্রা করলো । এক নদীর ঘাটে গিয়ে সন্ধ্যায় সে সর্বশেষ ফেরি ধরতে পারে নি। ফলে সে রাতে নির্জন স্থানে অবস্থান করতে ভয় পেলো। অল্প দূরে একটি প্রদীপ জ্বলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো। ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দিলে একজন লোক বেরিয়ে এলো। তিনি তার আগমনের হেতু জানতে চাইলে লোকটি সবিস্তারে সব বলে তার ঘরে রাত্রি যাপনের অনুমতি প্রার্থনা করলো। ঘরের মালিক বললো- "আমি ফকির মানুষ, তুমি রাত্রি যাপন করতে পার তবে ঘরে এমন কিছু নেই যা তোমাকে খেতে দিতে পারি। যদি তোমার খুব তাড়া থাকে তা হলে নদীর পাড়ে

গিয়ে বলো- ওই ফকির আমাকে পাঠিয়েছে যে কখনো অন্ন স্পর্শ করে নি; ওই ফকির আমাকে পাঠিয়েছে যে কখনো নারী স্পর্শ করে নি; হে নদী, আমাকে ওপারে যাবার পথ করে দাও" । একথা বলে লোকটি নদী পার হয়ে গেলো । কিন্তু ফকিরের স্ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর সব কথা শুনেছে এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলো- "তুমি একটা মস্ত বড় মিথ্যাবাদী; আমি তোমার মিথ্যাবাদিতা সকলের কাছে ফাঁস করে দেব। প্রতিদিন দু'বার তোমাকে রান্না করে খাওয়াই আর তুমি বললে অন্ন স্পর্শ করো নি। আমার তিনটি সন্তান আর তুমি বললে কোনো নারী স্পর্শ করো নি। এতে তুমি তোমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছো"। ফকির প্রমাদ গুনলেন। পরদিন নিজের আঙ্গিনায় একটা সামা (ভক্তিমূলক গান) অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। একটা প্রদীপে টইটম্বুর করে তেল ভরে স্ত্রীর হাতে তা দিয়ে দরজায় বসিয়ে দিলেন এবং বললেন- "এ প্রদীপ থেকে একফোঁটা তেল পড়ে গেলে তোমার সাথে আমার তালাক হয়ে যাবে"। সামা শেষে ফকির স্ত্রীকে জিজ্ঞেসা করলেন–"কোন সামাটি তোমার বেশি ভালো লেগেছে"? স্ত্রী বললেন–"আমি কোনোটিই শুনতে পাই নি"। যে শপথ তুমি দিয়েছ সে কারণে আমি প্রদীপের দিকে মনোযোগী ছিলাম। সামা শুনতে পারি নি'। ফকির বললেন–"যে সামা অনুষ্ঠানে বসে থেকেও তুমি সামা শুনতে পাও নি, সেভাবেই আমি অন্ন ও নারী স্পর্শ করি না"। এ গল্পে ফানার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিদিন খেয়ে অন্ন গ্রহণ না করা, সন্তান থাকা সত্ত্বেও নারী স্পর্শ না করা এবং সামার আসরে বসেও সামা শুনতে না পারা ফানার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এ চূড়ান্ত অবস্থায় অর্থাৎ ফানা অবস্থায় একজন আধ্যাত্মিক সাধক নিজের সবকিছু ভুলে গিয়ে ঐশী চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁদের কর্ম-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি এ সবকিছু আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমে সমাহিত হয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ অপার্থিব ও ইন্দ্রিয়াতীত। তাঁকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা জানা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষতা দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানতে হয় । সুফি সাধকগণ মনে করেন আত্মিক উৎকর্ষতা দ্বারা ছোটো-খাটো প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। কারণ পুতঃপবিত্র হৃদয়ে তা প্রতিফলিত হবেই। এ পর্যায়ে সুফি-সাধকরা আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন অবস্থায় তাঁর চারপার্শ্বের সবকিছুতেই সত্যের প্রকাশ লক্ষ্য করেন। সুফি আল্লাহ্‌র সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে আত্মিকভাবে একীভূত হন। আর এ-স্তরে সাধক ব্যক্তিগত চেতনাকে মুছে দিয়ে ঐশী চেতনায় উন্নীত হন। এ বিস্মৃতি বা আত্মচেতনায় অবলুপ্তির স্তরকেই সুফিতত্ত্বে 'ফানা' বলে।

সাধক আল্লাহ্‌র চৈতন্যময় অস্তিত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে আপন অস্তিত্ব খুঁজে পায়। তরিকতের জগতে ফানার ৪টি স্তর রয়েছে। যেমন-

১.ফানা ফিন নাফ্‌স বা ফানা ফিল ওজুদ

২.ফানা ফিশ শায়েখ

৩.ফানা ফির রাসুল এবং

৪.ফানালিল্লাহ্

১. ফানা ফিন নাফ্স বা ফানা ফিল ওজুদ

ফানার এই প্রথম স্তরের কাজ হচ্ছে যাবতীয় নাফ্সে আম্মারাহ্, কু-প্রবৃত্তি, দৈহিক ও জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আকর্ষণ ধ্বংস করা। অর্থাৎ ষড়রিপুকে পদমিত করে অহং বা আমিত্বকে গুড়িয়ে দিয়ে ঐশী গুণাবলী লাভ করা এই স্তরের কাজ। হযরত বু আলী শাহ কলন্দর (রহঃ) বলেন-

تا توی که یار گردد یار تو

چون نباشی یار باشد یار تو

"যতদিন তোমার তুমিত্ব থাকবে, ততদিন তোমার বন্ধুকে পাবে না,

যখন তোমার তুমিত্ব থাকবে না, তখন তোমার বন্ধু তোমার হবে।" (চিশ্তী[১৮] : ২০০৯, পৃ: ৫৬)

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) বলেন-

তুমি বন্ধুর অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছো কত;

একবার নিজের দিকে তাকাও, দেখবে তুমিই সকল নামের প্রকাশ

তুমি এটা লক্ষ্য করো না যে, তুমি মাটি থেকে সৃষ্ট আর মাটি ছিলো অন্ধকার

বরং লক্ষ্য কর তুমিই হচ্ছো খোদার সৌন্দর্যের আয়না। (চিশ্তী[১৮] : ২০০৯, পৃ: ৫৬)

২.ফানা ফিশ্ শায়েখ

যখন সাধকের নাফ্স ভাল হয়ে যায় তখন সাধক এসব কু-প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করে আল্লাহ্ ও রাসুলের সকল বিধান পালন করে। তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আরো একটু উপরে যাওয়ার জন্য পীরের দরকার হয়। এই স্তরে সুফি-সাধক পীরের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। পীরের সর্বপ্রকার গুণাবলী লাভ করা এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও বাসনা পীরের ইচ্ছায় পরিণত করাই এ স্তরের উদ্দেশ্য। জালাল উদ্দিন রুমি বলেন-

قال را بگزار مرد حال شو

پیش مرد کاملی با مال شو

"তোমার ভেতরে যদি আল্লাহ্কে পেতে চাও

তাহলে একজন পীরে কামেলের নিকট নিজেকে বিলীন করে দাও।"

পীরের আদেশ সাধকের মন মতো হোক বা না হোক তা মেনে চলতে হবে। (চিশ্তী[১৮] : ২০০৯, পৃ: ৫৮)

পীরের আদেশের প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাফিয তাঁর প্রথম গযলেই বলেন-

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها

মৎকৃত অনুবাদ: যদি তোমার খাঁটি পীর তোমাকে বলে জায়নামাজকে শরাব দ্বারা রঙিন করো, তবে তুমি তাই করো

কেননা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সকল পথ-ঘাট সম্পর্কে তিনি অবহিত ।

একদিন একজন পীর তাঁর মুরিদকে হাফিযের উপরোক্ত বেইত দুটো পড়ে শোনালেন । তখন মুরিদ বললো- "হুজুর! আমি এর অর্থ বুঝলাম না । কারণআল্লাহ্‌র হুকুম হচ্ছে পবিত্র জায়গায় নামাজ আদায় করা আর হাফিয বলেন, পীরের কথামতো নাপাক শরাব

দ্বারা জায়নামাজ রঙিন করে নামাজ আদায় করতে হবে" । তখন পীর তাকে বললেন যে, "তুমি যদি আসল অর্থ বুঝতে চাও তাহলে এই এক হাজার টাকা নিয়ে এখনই বেশ্যাপাড়ায় চলে যাও । সেখানে অমুক নামে একজন মহিলা আছে তার সাথে তুমি খারাপ কাজ করে আসো । তবেই তুমি আসল অর্থ বুঝতে পারবে" । এ কথা শুনে মুরিদ টাকাটা নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে পীরের শিখিয়ে দেয়া নাম ধরে ডাকলেন । একজন দারোয়ান এসে বলল- "তুমি কে? এখানে কি চাও? এ মহিলার এক রাতের মূল্য এক হাজার টাকা" । মুরিদ বললো- "আমি এক হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত" । দারোয়ান দরজা খুলে দিতেই মুরিদ দেখতে পেলো একজন অতিশয় সুন্দরী রমণী সুসজ্জিত খাটের উপর বসে অঝোরে কাঁদছেন । মুরিদ তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । রমণী বললো- "আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার লাভ কি? আপনার উদ্দেশ্য পূরণ করে চলে যান" । যেহেতু মুরিদ এখানে এসেছে হাফিযের ঐ পংক্তি বোঝার জন্য, তাই সে বারে বারে তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো । তখন সেই রমণী বললো- "আমি একজন খুব পরহেযগার মুসলমানের কন্যা । ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে এক ছেলের সাথে বিয়ে দেন । আমার ও আমার স্বামীর আপন বলতে কেউ ছিলো না । আমার বিয়ের পরপরই স্বামী দেশান্তরি হয়ে নিখোঁজ হন । তার কিছুদিন পর আমার বাবা মারা যান । এমতাবস্থায় যখন আমি দিন কাটাতে থাকি তখন একদিন এক দুষ্ট চরিত্রের লোক আমাকে জোর করে ধরে এনে এক হাজার টাকা মূল্যে এই বেশ্যাপাড়ায় বেশ্যাপতির নিকট বিক্রি করে দেয় । আমি অনেক অনুরোধ করে এই মহাপাপের কাজে লিপ্ত হতে অস্বীকার করি । অবশেষে বেশ্যাপতি আমাকে ছয় মাসের সময় দিয়ে বলে, তুমি যদি এই ছয় মাসের মধ্যে আমাদের ক্রয়মূল্য এক হাজার টাকা ফেরত দিতে পারো, তবেই তুমি মুক্তি পাবে । কিন্তু ছয় মাস পর হতে প্রতিদিন বেশ্যাবৃত্তি করে এক হাজার টাকা আমায় দিতে হবে । ছয় মাস গতকাল শেষ হয়েছে । আজ থেকে আমার ভাগ্য খুবই খারাপ আর আপনি হলেন প্রথম পুরুষ । তাই দারোয়ান দরজা খুলে দিয়েছে । এতোদিন এ ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো । এটাই হলো আমার দুঃখের কারণ । এখন আল্লাহ্‌ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই" ।

এই আশ্চর্য ঘটনা শুনে মুরিদ তার নাম জিজ্ঞাসা করলো । তার নাম পরিচয় জানার পর মুরিদ নিশ্চিত হলো এই মহিলাই তার স্ত্রী । আর রমণীও তার স্বামীকে চিনতে পারলো । তখন উভয়ই কান্না শুরু করলো । তখন মুরিদ আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করে পীরের নিকট গিয়ে বললো,"হুজুর, আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি । নিশ্চয়ই কামেল পীরের আদেশ মতো শরাব দিয়ে জায়নামাজ রঙিন করে নামাজ আদায় করা উচিত ।"

অতএব ফানা ফিশ্‌ শায়েখ অর্জন করতে হলে একজন সাধককে যে কাজ করতে হবে তা হলো-

১. পীরের নিকট বায়াত হতে হবে ।

২. পীরের হুকুম বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে ।

৩. নিজের ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে পীরের ইচ্ছায় চলতে হবে।

৪. পীরের আচার-আচরণ, ওঠা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে।

৫. পীরের চেহারাকে ধ্যান করতে হবে। (চিশ্‌তী[১৮] : তদেব, পৃ: ৫৯-৬১)

৩ .ফানা ফির রাসুল

ফানা ফিশ্‌ শায়েখ যখন অর্জিত হবে তখন ফানা ফির রাসুল এর সূচনা। এই স্তরে এসে সুফি-সাধক রাসুল (সাঃ) এর সকল প্রকার গুণাবলী অর্জন করার জন্য সাধনা শুরু করেন এবং সাধক ধ্যানের মাধ্যমে রাসুল (সাঃ) এর চেহারা (বা নূরে মোহাম্মাদ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং নূরে মোহাম্মদীতে সবকিছু বিলীন করে দিয়ে ফানা ফির রাসুল লাভ করেন অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর মাঝে বিলীন হয়ে যান। তার আর্দশসমূহ সাধকের মাঝে চলে আসে। পবিত্র কোরআনের সুরা আল-ইমরানের **৩১** নং আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন-

> "আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসেন আর পাপ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

সাহাবায়ে কেরামগণের পীর ও রাসুল ছিলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই তাদের ফানা ফিশ্‌ শায়েখ এবং ফানা ফির রাসুল একজনই। কিন্তু আমাদের এই দুটো বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্জন করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে ফানা ফির রাসুল হাসিলের ঘটনার মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেদিন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, সেদিন হযরত আলী (রাঃ) একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি নিম্নরূপ :

তিনি স্বপ্নে দেখেন ফযরের আযান হচ্ছে। তিনি ওযু করে মসজিদে নববিতে যাচ্ছেন। দেখেন নামাজ শুরু হয়ে গেছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নামাজের ইমামতি করছেন। তখন তিনি পেছনের কাতারে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষে একজন মহিলা কিছু খেঁজুর নিয়ে আসলো। মহিলা বললো- "হে রাসুল (সাঃ), আমার নতুন গাছের খেঁজুর, আপনারা সবাই মিলে খেয়ে নিন"। তখন রাসুল (সাঃ) সব সাহাবীদের মাঝে একটি করে খেঁজুর বিতরণ করলেন। হযরত আলী (রাঃ)-কেও একটি খেঁজুর দিলেন। খেঁজুরটি খুবই সু-স্বাদু থাকায় তিনি আরো একটি খেঁজুর রাসুল (সাঃ) এর নিকট চাইলেন। রাসুল (সাঃ) বললেন- "এটা সম্ভব নয়, কারণ খেঁজুরের পরিমাণ কম। আর তোমাকে একটা দিলে সব সাহাবীদেরকেও একটা করে দিতে হবে"। এই স্বপ্ন দেখা শেষ হলে হযরত আলী (রাঃ) ফযরের আযান শুনতে পেলেন। তিনি ওযু করে মসজিদের দিকে যেতে লাগলেন আর রাতের স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। স্বপ্নের মাঝে তিনি যে খেঁজুর খেয়েছিলেন তার স্বাদ এখনো তাঁর মুখে লেগে আছে । তিনি মসজিদে গিয়ে দেখেন নামাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং হযরত ওমর (রাঃ) নামাজের ইমামতি করছেন। তিনি পেছনের কাতারে দাঁড়ালেন। হযরত আলী (রাঃ) দেখলেন স্বপ্নে রাসুল (সাঃ) কে যে সুরা দিয়ে নামাজ আদায় করতে দেখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) সেই একই সুরা দিয়ে নামাজ আদায় করছেন। যখন নামাজের সালাম ফেরানো হলো, সাথে সাথে একজন মহিলা এসে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- "হে আমিরুল মো'মেনিন, আমার নতুন গাছের খেঁজুর, আপনারা সবাই মিলে খেয়ে নিন"। তখন হযরত আলী (রাঃ) এর রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেলো। হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত সকলকে একটি করে খেঁজুর দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) কেও একটি খেঁজুর দিলেন। তিনি খেঁজুরটি খেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । কারণ স্বপ্নে তিনি যে খেঁজুর খেয়েছিলেন সেটার স্বাদ, এখন যে খেঁজুর খেলেন তার স্বাদ একই রকম। খেঁজুর খাওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) আরো একটি খেঁজুর চাইলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- "ভাই আলী, আল্লাহ্‌র নবী স্বপ্নে তোমাকে একটি খেঁজুর দিয়েছিলেন। তাই আমিও তোমাকে একটি খেঁজুর দিয়েছি। যদি স্বপ্নে তুমি দুটি খেঁজুর পেতে তাহলে আমিও তোমাকে দুটি খেঁজুর দিতাম"। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, হয়তো আলী (রাঃ) স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, বাস্তবেও তাই ঘটেছিলো। শুধু স্বপ্নে রাসুল (সাঃ) কে ইমামতি করতে দেখেছেন আর বাস্তবে ইমামতি করেছেন হযরত

ওমর (রাঃ) । কারণ হযরত ওমর (রাঃ) ফানা ফির রাসুল অর্জন করেছিলেন । ফানা ফির রাসুল অর্জিত হবার পর সাধক ফানাফিল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হন ।

৪.ফানাফিল্লাহ্‌

এই স্তর সম্পর্কে ফকির আবদুর রশিদ বলেন-

> "ফানা ফির রাসুল লাভের পর নুর-ই-মুহাম্মদীর মাধ্যমে নুর-ই-তাজাল্লী লাভ হয় । নুর-ই-তাজাল্লীর দীদারের মাধ্যমে সাধক ধ্যানের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হন । এই স্তরে সুফি ধ্যান ও তন্ময়তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে মুছে দিয়ে জাতের অসীম চেতনায় উন্নীত হন এবং সাধকের ব্যক্তিগত চৈতন্য আল্লাহ্‌র মোরাকেবা ও প্রেমে সমাহিত হয় । একেই ফানাফিল্লাহ্‌ বলে" । (রশিদ[৪২] : তদেব, পৃ: ১৭৪)

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এই স্তর সম্পর্কে বলেন-

عشق آن شعله ست کو چون بر فروخت

هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت

> "প্রেমের ভয়ানক আগুন যখন জ্বলে ওঠে,
>
> তখন মা'শুক ছাড়া অন্য সবকিছুকে জ্বালিয়ে ফেলে ।" (চিশ্‌তী[১৮] : ২০০৯, পৃ: ৬৫)

ওলিদের জীবন পর্যালোচনা করলে ফানাফিল্লাহ্‌র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । এর মধ্যে মনসুর হাল্লাজ (রহঃ)- এর ফানাফিল্লাহ্‌র ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । ঘটনাটি নিম্নরূপ :

মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এর একজন বোন ছিলো । তিনি নিয়মিত রাতের অন্ধকারে বাগদাদের মরুভূমির নির্জন জায়গায় গিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করতো । যখন বাড়ি ফেরার সময় হতো তখন আল্লাহ্‌পাক ফেরেশতাদের ডেকে বলতেন- "আমার প্রেমের এক পেয়ালা শরবত তাঁকে এনে পান করাও" । তিনি তা পান করে বাড়ি ফিরতেন । মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এই রহস্যের সন্ধান পেয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন । একদিন বোন ঘর হতে বের হলে তিনিও তাঁর পেছনে চললেন । বোনের ইবাদত শেষ হবার পর সাথে সাথে ফেরেশতারা তাঁর হাতে প্রেমের এক পেয়ালা শরবত দিলেন । সে সামান্য পান করতেই পেছন হতে মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) বললেন- "বোন, আমাকে একটু দাও" । পেছন ফিরে ভাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন- "আফসোস, আমার রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল । তুমি যে এটা পান করতে চাও, আমার বিশ্বাস এর প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারবে না" । কিন্তু মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) তা পান করবেই । তিনি পেয়ালার অবশিষ্ট শরবতটুকু পান করলেন । পান করার সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে বিলীন হয়ে গেলেন । তাঁর মুখ থেকে বের হতে লাগলো 'আনাল হক' অর্থাৎ আমিই খোদা । তিনি শহরে প্রবেশ করে প্রকাশ্যে এ কথা বলতে লাগলেন । লোকজন তাঁকে কাফের হওয়ার ভয় দেখালো । কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হলেন না । শুধু বলতে লাগলেন 'আনাল হক' । মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এর এই খোদায়ী দাবীর কথা শুনে আল্লাহ্‌পাক রাগ হন নি বরং খুশি হয়েছেন । যেমন কবি বলেছেন-

> "ফেরাউন আল্লাহ্‌র শত্রু, সে অহংকার করে 'আনাল হক' বলে আযাবের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে,
>
> আর মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) 'আনাল হক' বলে খোদার নূরের মধ্যে মিশে চির অমর হয়ে গেছে ।"

আস্তে আস্তে এ কথাটা বাদশাহ্‌র নিকট পৌঁছে গেলো । বাদশাহ্‌ তাঁকে ডেকে 'আনাল হক' বলা ত্যাগ করতে বললেন । তিনি এ কথাটাও বললেন যে, আমার কথা না শুনলে তোমাকে শূলে দিতে বাধ্য হবো । মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) কোনো উত্তর না দিয়ে শুধুই

'আনাল হক' বলতে লাগলেন। বাদশাহ্ প্রথমে তাঁকে জেলখানায় আটকে রাখলেন। একদিন বাদশাহ্ তাঁকে দেখার জন্য জেলখানায় গিয়ে দেখেন তিনি নেই। অথচ তাঁর হাত-পায়ের বেড়ী মাটিতে পড়ে আছে এবং জেলখানার দরজাও ঠিকমতো তালাবদ্ধ আছে। বাদশাহ্ অবাক হয়ে ফিরে আসলেন। পরদিন আবার বাদশাহ্ জেলখানায় গিয়ে তাকে ঠিকভাবে বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর হাত ও পায়ের বেড়ী ঠিক আছে, মুখে কেবল 'আনাল হক' বলছেন। বাদশাহ্ ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন বাস্তবেই মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) একজন আল্লাহ্-পাগল ব্যক্তি। বাদশাহ্ আবার তৃতীয় দিন সেখানে গিয়ে দেখেন জেলখানাও নেই, মনসুর হাল্লাজ (রহঃ)ও নেই। তিনি সেখানে মস্ত বড় একটি নদী দেখতে পেলেন, চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। বাদশাহ্ অবাক ও ভীত হয়ে ফিরে এসে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, তিনি আসলেই একজন প্রকৃত আল্লাহ্-প্রেমিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চতুর্থ দিন আবার বাদশাহ্ জেলখানায় গিয়ে দেখলেন সবকিছুই ঠিকই আছে। তিনি বসে শুধু 'আনাল হক' বলছেন। বাদশাহ্খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন, মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) বাদশাহ্কে চিন্তিত দেখে বললেন- "হে বাদশাহ্! আমাকে শূলে দিন, তাহলে আমি মা'শুকের সাথে বিনা পদার্য় মিলিত হতে পারবো"। তখন বাদশাহ্ বললেন- "হে মনসুর! তোমাকে শূলে দেওয়ার জন্য যে ফতোয়া জারী করা হয়েছে তাতে ১০১ জন আলেমের স্বাক্ষর লাগবে। কিন্তু তাতে ১০০ জন আলেমের স্বাক্ষর রয়েছে, আলেম হিসেবে তুমিই সেই স্বাক্ষর দিলে ১০১টি স্বাক্ষর পুরা হয়"। এই কথাশুনেতিনি সেফতোয়ায়স্বাক্ষর করে দিলেন। কিন্তু তিনি যদি তখনো 'আনাল হক' বলা ত্যাগ করতেন তাহলে

সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তিনি 'আনাল হক' বলা ত্যাগ না করেই ফতোয়ায় স্বাক্ষর করলেন।

মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) কে শূলে দেয়ার তারিখ নির্দিষ্ট করা হলো। এই ভীষণ কান্ড দেখার জন্য চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ আসতে লাগলো। বাদশাহ্ তাঁকে গোপনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো– 'মনসুর! আমি একদিন জেলখানায় গিয়ে দেখি তুমি সেখানে নেই। অথচ তোমার হাত ও পায়ের বেড়ী জেলখানায় পড়ে আছে। দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখি তুমি ঠিকভাবেই আছো। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি সেখানে তুমি নেই, শুধু পানি আর পানি। চর্তুথ দিন গিয়ে দেখি তুমি সঠিকভাবেই আছো। এর রহস্য দয়া করে আমায় বলো'। মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) বললেন- "প্রথম দিন আমি আল্লাহ্র সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছিলাম। তাই প্রথম দিন আপনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ্র সাথে দেখা করে আমি ফিরে এসেছি, তাই দ্বিতীয় দিন আপনি আমাকে জেলখানায় দেখতে পেয়েছেন। তৃতীয় দিন আল্লাহ্ স্বয়ং আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তাই তাঁর নূরের মধ্যে সবকিছু ফানা হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্ যখন বিদায় নিলেন তখন সবকিছু ঠিক হয়ে গেলো। তাই চর্তুথ দিন আপনি আমায় সঠিকভাবে দেখেছেন"। একথা শুনে বাদশাহ্ আফসোস করে বললেন- "হে মনসুর! তোমার অবস্থা আমি বুঝেছি কিন্তু শরীয়তের হুকুম জারী না করে পারি না। আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও"।

মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) যে সময় কারাগারে ছিলেন ঐ সময় তিনশত কয়েদি কারাগারে ছিলো। তিনি ইশারা করতেই জেলখানার দরজা খুলে গেলো। সব কয়েদীরা চলে গেলো। যাওয়ার আগে তাঁকে বললো- "আপনি আসবেন না"? তিনি বললেন- "প্রভুর সাথে আমার একটা গোপন ব্যাপার আছে, যার মীমাংসা হবে শূলে চড়ে"। পরদিন প্রহরীরা জেলখানায় এসে দেখে জেলখানা শূন্য। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। এ খবর বাদশাহ্র নিকট পৌঁছালে বাদশাহ্ হুকুম দিলেন তাঁকে চাবুক মেরে হত্যা করার জন্য। তাঁকে যখন চাবুক মারা হলো তিনি কোন শব্দ করলেন না। আরোও উচ্চস্বরে 'আনাল হক' বলতে লাগলেন, আর প্রতিটি চাবুকের বারিতে শোনা যাচ্ছিল- "হে মনসুর! ভয় পেয়োনা"। পরিশেষে তাকে শূলে দন্ডিত করা হলো। কিন্তু তিনি কোনো প্রকার শব্দ করলেন না। তিনি 'আনাল হক' বলতে বলতে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে গেলেন। তাঁর শরীরের রক্তবিন্দুগুলো মাটিতে পড়ামাত্র 'আনাল হক' বলতে লাগলো। এমনকি শরীরের প্রতিটি লোম হতে 'আনাল হক' উচ্চারিত হতে লাগলো। সবাই এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলো। অতঃপর তাকে আগুনে পোড়ানো হলো। কিন্তু ছাই হতে 'আনাল হক' উচ্চারিত হতে লাগলো। তখন তার দেহের ছাইগুলো দজলা নদীতে ফেলে দেওয়া হলো। তা নদীতে ফেলামাত্র নদীর পানি উপচে দেশ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) ঐশী ক্ষমতার বলে ভবিষ্যত জেনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর দেহভস্ম দজলা নদীতে ফেললে তা ভীষণ আকার ধারণ করবে। তখন যদি তাঁর পোষাক নদীকে দেখানো হয়, সে শান্ত হয়ে যাবে।

হঠাৎ শিষ্যের এ কথাটা মনে পড়ে গেল। সে তাই করলো। সাথে সাথে বিপর্যয় থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পেল। পরবর্তীতে লোকজন সেই পোষাকটি দাফন করলেন। (চিশ্‌তী[১৮] : তদেব, পৃ: ৬৫-৭১)

ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন যুগের কবি সোহরাব সেপেহ্‌রির অনেক কবিতায় অধ্যাত্মবাদ সুস্পষ্ট। ফানাতত্ত্ব বিষয়ক 'BODHI' শিরোনামে তাঁর একটি সুন্দর কবিতা রয়েছে। কবিতাটি Mahvash Shaheghঅনুবাদ করেছেন এভাবে-

There was a special moment,

All doors were open.

No leaves, no branches,

The garden of annihilation had appeard.

Birds of places were silent,

This silent, that silent,

The silence itself was utterance.

What was that area?

Seems an ewe and a wolf,

Standing side by side.

The shape of the sound, pale

The voice of the shape, weak

Was the curtain folded?

I was gone, he was gone,

We had lost us.

The beauty was alone.

Every river had become a sea,

Every being had become a Buddha. (www.perlit.sailorsite.net)

সাঈদ অনূদিত একটি গযলে (সাঈদ[৫৬] : গযল নং- ৪৮, ২০১২, পৃ: ১৮০) হাফিয বলেন-

তোমার সনে মিলনের সুখবর মনে আমি জেগে উঠি।

আত্মা আমার গৃহমুখী রাখি বেহেশত-আকুল গিরগিটি ॥

সে তো জাগবে আরও উঁচুতে দুনিয়ার ফাঁস করে মুক্ত ।

প্রেমের স্বরে ডাকবে তখন সেবক আমাকে তারই ভক্ত ॥

আর 'বাকা' শব্দের অর্থ হলো ঐশী সত্তায় অবস্থান করা । ফানার শেষ পর্যায়ে শুরু হয় বাকার প্রাথমিক স্তর । এই স্তরে সুফি-সাধক আল্লাহ্‌র চেতনার সাথে আত্মলীন হয়ে যান এবং তাঁর সকল ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিলীন হয়ে যায় । তাই সুফিদের মতে ফানা হলো পরিশোধিত জীবনের শেষ পর্যায় আর বাকা হলো আল্লাহ্‌র জ্যোতি লাভের প্রাথমিক স্তর । এই সম্পর্কে জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান বলেন–

> 'বাকা' শব্দের অর্থ হলো- আল্লাহ্‌তে স্থিতি লাভ করা (one with Allah) । ফানাফিল্লাহ্‌ অবস্থায় যখন সাধক স্বীয় অস্তিত্ববোধকে হারিয়ে ফেলে তখন তাঁর আপনাতে আপনার কিছুই থাকে না । এ অবস্থায় সেখানে আল্লাহ্‌ই বিরাজ করেন । সাধক আল্লাহ্‌তে ফানা হবার পরই বাকা স্তরে উন্নীত হতে পারে । ফানায় যখন 'শূন্যত্বের শূন্য' সৃষ্টি হয় তখনই বাকা বা সেখানে ফিত্‌রাল্লাহ (আল্লাহ্‌ প্রকৃতি ও স্বভাব) এবং তার অস্তিত্বের অনুরূপ রূপ প্রকাশ পায় । সে জন্যই

আল্লাহ্‌ বলেন তিনি মানুষকে তার নিজের ফিত্‌রাতে সৃষ্টি করেছেন (আল কোরআন-৩০:৩০) । হাদিসে

কুদসিতে আল্লাহ্‌ বলেন- "নিশ্চয়ই আমি আদমকে স্বীয় আকৃতিতে (সুরতে) সৃষ্টি করেছি" । মানুষ আল্লাহ্‌র

প্রতিনিধি । প্রতিনিধিকে নিধির মতোই হতে হয় ; না হয় প্রতিনিধি হওয়া যায় না । ফানাফিল্লাহ্‌তে বিনাশন বা

ধ্বংস, অপরপক্ষে বাকাবিল্লাতে পুনর্জীবন লাভ । সেজন্যই ফানা স্তর হচ্ছে নঞর্থক (Negative), আর বাকা

সদর্থক (Positive) । বাকা অবস্থাকে একটা উদাহরণ দিয়ে এভাবে বলা যায় যে, যদি এক বালতি পানি নদীতে

ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে নদী থেকে আমরা এক বালতি পানি তুলতে পারবো সত্য কিন্তু প্রথমে বালতিতে যে পানি

ছিলো তা আলাদা করে তুলে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এরূপভাবে আল্লাহ্‌তে স্থিতিকে বাকা বলে" । (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) :

তদেব, পৃ: ৪১)

সাধক যখন বাকা পর্যায়ে উন্নীত হন তখন আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না । তখন তিনি আল্লাহ্‌র সাথে একত্ব হয়ে যান । আল্লাহ্‌ এবং তাঁর দুরত্ব থাকে না । বরং তাঁর কথা ও জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও কথায় পরিণত হয় । সসীমের এভাবে অসীমে রূপান্তর প্রক্রিয়া বা বাকায় পৌঁছা খুবই কঠিন । মূলত বাকা বা স্থিতি অর্জনই মানুষের মূল সত্তার দিকে যাওয়া । সবকিছুই তার মূলের দিকে ধাবিত হয় । এটাই পরম সত্য । রুমি তার মসনবিতে বলেন–

آنچه از دریا به دریا می رود

از همآنجا کأمد، آنجا می رود

از سر که سیل های تیز رو

وز تن ما جان عشق آمیز رو

"সাগর থেকে যা এসেছে সাগরেই চলে যায়

যেখান থেকে এসেছে সেখানেই সব ফিরে যায়

পর্বত শিখর থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসে বন্যা

আর আমাদের দেহ হতে ছুটে যায় প্রেমাসক্ত প্রাণ ।" (রুমী[৪৩] : তদেব, পৃ: ২৩৭)

আর হাফিয বলেন:

একদিন দেশে ফিরে যাবো এই নির্বাসন থেকে,

যদি যাই অভিজ্ঞান নিয়ে যাবো পূর্বাপর দেখে ।

এই দীর্ঘ পথ যদি নিরাপদে পাড়ি দেয়া যায়

আবার উঠবো গিয়ে পুরনো সেই সরাইখানায় ।

এক হাতে পেয়ালাটি, অন্য হাতে রবাবটি ধরে

পথের বর্ণনা আমি করে যাবো বন্ধুর আসরে । (হক[৭৩] : গযল নং-৫৬, ২০১৪, পৃ: ৮৫)

উল্লেখ্য যে, 'রবাব' শব্দের অর্থ হলো বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ।

আল্লামা ইকবাল আবেগপ্রবণ কবি ও দার্শনিক । তিনি নিষ্ক্রিয় ও কর্মবিমুখ বৈরাগ্যের বিরোধী । সে কারণে অনেকে তাঁকে সুফি বলে স্বীকার করে না । মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে অর্থাৎ ২০এপ্রিল, ১৯৩৮ সনে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতার শেষ দু' পংক্তিতে লিখেছেন-

এ ফকিরের জীবন খেলা এখানেই হলো শেষ

দোসরা তত্ত্বজ্ঞানী হয়তো আসবে, হয়তো আসবে নাকো । (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৪০)

তাঁর কাব্যে তিনি আল্লাহ্-তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, জগৎ-জীবনতত্ত্ব, খুদি বা আত্মাতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন । তাঁর ওপর পাশ্চাত্যের ভাববাদী দার্শনিকদের প্রভাব থাকলেও তিনি জালাল উদ্দিন রুমি কর্তৃক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন বলে লিখেছেন–"রুমির প্রতিভা-দীপ্তি উদ্দীপ্ত করেছে আমাকে" । আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আবেগ প্রবণতা অপরিমেয় । তাঁর বক্তব্য হতে তা অনুমেয় । তিনি বলেন– "গুনাহ্ না করলে আমিই খোদা হতাম । আমার গুনাহ্ হতেই তোমার খোদায়ি প্রকাশ পায় । তোমার রহমত সর্বদা আমার গুনাহ্‌র মুখাপেক্ষী । আমি ব্যতীত তুমি কখনো খোদা হতে পারতে না" । বাকাবিল্লাহ্‌র স্তরে উপনীত হয়েই তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

"কার নেশায় মত্ত হয়ে তুমি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো?

তুমিই রাস্তা, তুমিই পথিক, তুমিই পথ নির্দেশকারী ।

তুমি বোকার মতো ভাবছো তোমাকে কেউ শরাব পান করিয়ে দেবে;

তুমিই শরাব, তুমিই পেয়ালা, তুমিই সাকি এবং তুমিই শরাবের মজলিস ।"

এই স্তরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা রুমি বলেন–

الله الله گفته الله می شود

این سخن کی باور مردم شود

"আল্লাহ্ আল্লাহ্ জপ্‌তে জপ্‌তে মানুষই আল্লাহ্‌ময় হয়ে যায়

এ কথা কি করে সাধারণ লোক বিশ্বাস করে?" (রশিদ[৪২] : তদেব, পৃ: ১৭৭)

বাকার এ স্তরকেই উদ্দেশ্য করে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) বলেন-

হে হৃদয়, শরাবাসক্তদের এশকের হলকায় আসো

তোমাকে বাকার শরাব থেকে এক ঢোক দেয়া হবে।

কাছে আসো, দোজাহানকে উৎকণ্ঠা ও হয়রানির পেয়ালায় রাখো

এ দুনিয়ার জুয়ার বাজিতে যা পেয়েছো তাই নিয়ে এসো।

যদি বাকা তালাশ কর তবে প্রথমেই তোমাকে ফানা হতে হবে

যে পর্যন্ত না তুমি ফানা হবে সে পর্যন্ত খুঁজে পাবে না বাকার রাস্তা। (চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ৩৮)

বাকাবিল্লাহ্ সাধকের সর্বশেষ স্তর। মোট কথা এ স্তরে সুফি-সাধক আল্লাহ্‌র চিরন্তন, শ্বাশত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস, আরিফবিল্লাহ প্রভৃতি লকব ও সম্মানের অধিকারী হন। তিনি এ স্তরে অমরতা লাভ করে চিরজীবি ও চিরঞ্জীব হন। এ স্তরে তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ময় হয়ে যান। বাকাবিল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই স্তর। হাফিয প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থেকেছেন। তিনি বলেছেন:

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا کـه راز پنـهان خواهد شد آشـکارا
کشـتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد کـه بازبینیم دیدار آشـنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی بـه جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانـه سلامت
روزی تـفـقدی کـن درویش بی‌نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی‌پسندی تـغییر کـن قـضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
اشـهی لـنا و احـلی من قبله الـعذارا
هنـگام تنـگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کـند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر کـه در کف او موم است سنگ خارا
آیینـه سـکـندر جام می است بنـگر
تا بر تو عرضـه دارد احوال مـلـک دارا
خوبان پارسی گو بـخـشـندگان عـمرند
ساقی بده بـشارت رندان پارسا را
حافظ بـه خود نپوشید این خرقه می آلود
ای شیخ پاکدامـن مـعذور دار ما را

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩, তদেব, পৃ: ২)

O pious of the heart, I am lost in a love, so great

O pain the hidden secrets will become open debate.

Shipwrecked we just float, O favorable wind arise,

May we one more time gaze upon that familiar trait.

Passage of time and the stars, are but what we fantasize

For compassion and kindness, it is never too late.

In the circle of wine and roses, nightingale's song is prize

With the aroma and the wine your senses satiate.

O thou compassionate one, life giver and the wise

One day bestow thy grace upon this mendicant's state.

For peace of this world and the next, understand what I advise

Magnanimity the lot of friends, and with foes try to relate.

In the land of repute, our passage they will dispute

If this will not suit, don't stay mute, and transmute dictates of fate.

When destitute and in need, let your love and passion breed

Life's alchemy, essence and seed, unimagined wealth shall create.

If unruly with pride, with a candle's zeal your flame will rise

Beloved turns stone to lava, and molten wax manipulate.

The Grail contains but wine, if only you realize

Then the Kingdom of the world, at your feet prostrate.

The good and wise Magi, forgivers of lives and lies

Bearer bring good news, drunkards' wine consecrate

With this wine stained robe, Hafiz would never disguise

O untainted pure Master, exempt us from this fate. (Ghazal no 5 : www.hafizonlove.com)

হাফিযের দৃষ্টিতে প্রেম

পৃথিবীতে মানুষের মুখ হতে 'প্রেম' শব্দটি যতো বেশী উচ্চারিত হয়, অন্য কোন শব্দ হয়তো এতো বেশি উচ্চারিত হয়না। ধর্মগ্রন্থে, সাহিত্যে, ইতিহাসে এমনকি বিজ্ঞানেও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক মানুষের অন্তরের এই মহৎ আবেগকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। এ সম্পর্কে *মুরলীর বিলাপ* গ্রন্থের (দ্রষ্টব্য : হক[৬৫] : ১৯৯৬, পৃ: ২৫-২৬) বেশ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ।বিশ্ববিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক বেকন বলেন-

> "Nuptial love maketh mankind, friendly love Perfecteth it, but wanton love corrupteth and embaseth it."

অর্থাৎ: বিবাহিত প্রেম মানবজাতি সৃষ্টি করে, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রেম সেটাকে পরিপূর্ণতা দেয়; কিন্তু লাম্পট্য প্রেম সেটাকে কলুষিত ও হেয় করে। শেকস্পিয়ার পাগল, প্রেমিক ও কবিকে একই শ্রেণীভুক্ত করে বলেন–

> "The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact."

অর্থাৎ: পাগল প্রেমিক ও কবির মন কল্পনায় ঠাসা থাকে। তিনি আরো বলেন–

> "Love looks not with the eyes but with the mind.
>
> And, therefore, the winged Cupid is painted blind."

অর্থাৎ: প্রেম চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে।

সে জন্য পাখাযুক্ত প্রেম দেবতাকে অন্ধ করে চিত্রিত করা হয়।

বাইবেলে বলা হয়েছে :

> "He that loveth not knoweth not God for God is love."

অর্থাৎ: যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বরই প্রেম ।

হাফিযের সমগ্র দিভা'নে যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে, সেই প্রেমকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি । যেমন,

১. عشق مجازی বা দুনিয়াদারীর প্রেম

২. عشق حقیقی বা অধ্যাত্মপ্রেম

মাযা'য শব্দের অর্থ হচ্ছে রূপক বা যা বাস্তব নয় । অতএব 'এশ্‌কে মাযা'যি' শব্দের অর্থ হলো 'রূপক প্রেম' । সুফিগণ দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জীবনের প্রতিচ্ছবি ভাবেন । অতএব বলা যায় পার্থিব জগতের জাগতিক প্রেমই রূপক প্রেম ।হাফিযের দিভা'নের বহু জায়গায় রূপক প্রেমের বর্ণনা রয়েছে । রূপকধর্মী গযলের জন্যই তিনি বিশ্বখ্যাত হয়েছেন । যেমন তিনি বলেন–

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شراب مدام

ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار ندیمی نیک نام

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی

دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بز مگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیر امنش چون روضة دارالسلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب

دو ستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام

باده ی گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

نقلش از لعل نگارو نقلش یا قوت خام

عمزه ی ساقی یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام

هرکه این عشرت نخواهد خوشدلی برویتباه

و آنکه این مجلس نجوید زندگی بروی حرام

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩১৯, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ১৪৪)

কাজী আকরম হোসেন এই গযলটির অনুবাদ করেছেন এভাবে-

পিরীত লীলা, বয়েস কাঁচা, চুনীর পানা লাল শিরাজী,

প্রেমের সভা, প্রাণের সখা, নেশার মাঝে খোশ-মেজাজি;

মিছরি-মুখী সাকীর সেরা সুধা সুরের গায়ক ভায়া,

সাধু আচার বন্ধু রতন সঙ্গী গুণে যুগের গাজি;

আবেহায়াত হ'তে বাড়া পুণ্য প্রভা হেন প্রিয়া,-

রূপসী এক দৃপ্ত শোভায় পূর্ণ চাঁদে দেয় যে লাজই;

ফুলেল সুরা মিঠে কড়া হাল্কা এবং সোয়াদ ভরা,

উপমা যার পিয়ার অধর আর রঙীলা পেয়ালী রাজি;

হৃদয়-আরাম সভা-গেহ প্রাসাদ সম ফিরদউসের,

স্বর্গ হেন পুষ্প কানন সাজিয়ে তাহার রূপের সাজি;

সংগী সবে ইষ্টকামী কর্মী যত গুণী সুজন,

তত্ত্বজ্ঞানী বন্ধু সকল দিল্‌দরদী কাজের কাজী;

সাকীর দিঠি শানায় অসি বুদ্ধি বিচার হরণ তরে,

পরান পিয়ার কেশের গুছি নিত্য করে লুঠ্‌তরাজি;

জ্ঞানের ভরা রসিক-শেরা শিরীন অধর হাফিজ সম,

ভুবন উজল দাতা প্রবর তুলা যাহার কিউয়াম হাজী;

সংগ এমন চাহে যে জন প্রাণের খুশি উশুল তাহার,

ত্যাজিবে যে এ আনন্দ জীবন তাহার ফেরেববাজী । (হোসেন[৭০] : ২০১২,পৃ: ২০২)

আর 'হাকিকি'শব্দের অর্থ হলো প্রকৃত বা সত্যিকারের । কাজেই 'এশ্‌কে হাকিকি' দ্বারা আমরা প্রকৃত প্রেমকেই বুঝে থাকি । এই প্রেমই হচ্ছে অধ্যাত্মপ্রেম ।

যেমন হাফিয বলেন-

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس
گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده‌ام که مپرس
آن چنان در هوای خاک درش
می‌رود آب دیده‌ام که مپرس
من به گوش خود از دهانش دوش
سخنانی شنیده‌ام که مپرس
سوی من لب چه می‌گزی که مگوی
لب لعلی گزیده‌ام که مپرس
بی تو در کلبه گدایی خویش
رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
همچو حافظ غریب در ره عشق
به مقامی رسیده‌ام که مپرس

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২৭৯, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ১২৪)

Ask not what sorrows for love I endure

Ask not of parting poisons that make me impure.

I have traveled the world and in the end

Ask not what lover I willingly allure.

Longing for a vision, at her door

Ask not of the tears that I pour.

With my own ears I heard her last night

Ask not of her words, harsh yet demure.

Bite not your upper lip and speak not

Ask not what sweet lips I may secure.

In my mendicant state without you

Ask not of my pain and need for a cure.

On the path of Love,Hafiz, lost & unsure

Ask not of his standing, high and pure.(Ghazal no 270 : www.hafizonlove.com)

অধ্যাত্মসাধনায় প্রেম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন-সেতুই হলো এই প্রেম। স্রষ্টা আমাদের প্রেমাস্পদ আর আমরা তাঁর প্রেমিক। অধ্যাত্মবাদের প্রধান লক্ষ্যই হলো আল্লাহ্‌র প্রেম লাভ করে তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। পবিত্র হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'কেউ যদি আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম করতে চায়, আল্লাহ্‌ও তার সাথে প্রেম করেন'। আর তাই

আধ্যাত্মিক সাধকগণ সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের আকাঙ্খায় সম্মুখপানে ছুটে চলেন। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনই তাঁর কাছে বেহেশ্‌তস্বরূপ। আর হাফিযের দিভা'নের সর্বত্রই এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল ছিলেন । তিনি বলেন-

درنمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم آن کز ناز نینان بخت بر خوردار داشت

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৮, তদেব, পৃ: ২০)

"আমাদের প্রার্থনা ও মিনতি সুন্দর বন্ধুর নিকট কোন ফলে আসে না,

সেই ব্যক্তি সুখী যে প্রিয়তমদেরনিকট সৌভাগ্য লাভ করে।

উঠ সেই তুলির উপর আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করি,

কেননা আর্শ্চয এই সকল পটের, তাঁহার দিক নির্ণয়ের যন্ত্রের ঘূর্ণনে সে দেখে।" (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ১৫৯)

হাফিযের দিভা'নে 'শা'হেদ' বা প্রেমিকা এবং 'শা'রাব' বা সুরা এ দুটি শব্দ এতো বেশি এসেছে, যা থেকে বুঝা যায় তিনি একজন আধ্যাত্মিক প্রেমিক ছিলেন। সাম্প্রতিকালের একজন লেখক প্রমাণ করেছেন যে, হাফিয নারীর ব্যাপারে লাজুক ছিলেন আর তাঁর সাহসও ছিলোনা। আর নারীরা সবসময় সাহসী ও অহংকারী পুরুষদের ভালবাসে। আর এ কারণে হাফিয সবসময় অন্তর্জ্বালায় পুড়তেন এবং স্বীয় প্রেমে খুব কমই পৌঁছতে পারতেন। ঐ লেখক একথা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, মাঝে মাঝে নারীরা তাঁকে উপহাস করতো। কিন্তু হাফিযের ব্যাখ্যাদানকারীরা এই দিকটি সর্ম্পকে সবসময় নীরব থেকেছেন। তবে একটা কথা বলা যায় যে, তাঁর কাব্যগ্রন্থের একটি জায়গায়ও প্রমাণ মেলে না যে, হাফিযের প্রেমিকা একজন পূর্ণ নারী ছিলেন। অবশ্য হাফিযের কিছু কিছু গযল এরূপ যা প্রেমিকার ওপরে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগযোগ্য। উপরোক্ত লেখকের এই বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাফিয প্রেমের ক্ষেত্রে সফল লোক ছিলেন না। কারণ তাঁর কবিতায় অনেক রোদন রয়েছে। যেমন তিনি বলেন–

دعای گوشه نشینان بلا بگرداند

چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری

"নির্জনচারীদের দোয়া বালা-মুছিবত দেয় ফিরিয়ে

কেন চোখের এক কোণ্ দ্বারা তাকাওনা আমাদের প্রতি?" (দ্রষ্টব্য : মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৭)

অন্যত্র নারীদের সুদর্শন যুবকদের প্রতি আসক্তির বিষয়ে তিনি বলেন-

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم

ما در دهرندارد پسری بهتر از این

আমি ঐ সুদর্শন যুবকের প্রতি আসক্ত না হয়ে কি করি

জগত এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বালক আর জন্ম দেয়নি। (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৭)

ইবনুল আরাবি প্রেমের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন–

১.স্বাভাবিক প্রেম তথা মানবীয় প্রেম

২.আধ্যাত্মিক প্রেম এবং

৩.ঐশী প্রেম

ঐশী প্রেমই সব কিছুর উৎস। ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটায়। প্রেমিক তখন বুঝতে পারে সকল সত্তার মূল সত্তা এক। আর তিনিই পরম সত্তা স্বয়ং আল্লাহ্ নামে অভিহিত। তবে ইবনুল আরাবি হাল্লাযের মতো এক আত্মায় মিশে যাওয়ায় বিশ্বাসী নন। প্রেম সর্ম্পকে মুনসুর হাল্লাযের উক্তি হলো-'আমিই সে, যাকে আমি ভালবাসি। আমি যাকে ভালবাসি সে-ই তিনি ও আমি। আমরা দুটি আত্মা একই দেহে বাস করি। যদি আপনি আমাকে দেখেন, তবে আপনি তাঁকেই দেখেন।আর যদি আপনি তাঁকেদেখেন, তবে আপনি আমাদের দু'জনকেই দেখেন'। ইবনুল আরাবির বহু পূর্বেই ইব্নে সিনা বলেছেন– 'প্রেম সবকিছুর মূল পরিচালক। এই প্রেম সকল বস্তু ও সত্তাকে পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়'। যেমন হাদীসে রয়েছে যে-'আল্লাহ্ পরম সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন'। (দ্রষ্টব্য : হাযারী[৬৮]: ২০০৮, পৃ:৪৩)অপরদিকে মহান প্রভুর রূপের জ্যোতির্ময় আলোকশিখার মাঝে হাফিযের দৃষ্টিশক্তি ম্লান হয়ে যায়, তিনি নিজের অজান্তেই অনুভব করেন প্রভুর সমস্ত রূপ-সৌন্দর্যকে। প্রভুর প্রেমের অমিয় সেতু বন্ধনে হাফিয এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে, সৃষ্টিকর্তার রহমত থেকে তাঁকে আলাদা করা যাবেনা। তাইতো হাফিয প্রভুর প্রেম দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করতে চায় । অন্তরের সব শূন্যতা দূর করতে চায়। যেমন একটি রুবাইয়্যাত এ হাফিয বলেন:

রক্ত-রাঙা হ'ল হৃদয়

তোমার প্রেমের পাষাণ-ব্যথায়।

তোমার ও-রূপ জ্ঞান-অগোচর

পৌঁছে নাকো দৃষ্টি সেথায়।

জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়

তোমার আকুল অলক-দামে,

সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা

দেখ্‌ছি ওরে ছাড়ানো দায় ॥ (ইসলাম[৫] : ২য় খন্ড, ১৯৯৩, পৃ: ২১)

ইবন রুশদ তাঁর প্রেমতত্ত্বে সার্বজনীন ধর্মের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন- ধর্মের দুটি রূপ রয়েছে । একটি আভ্যন্তরীণ সত্য এবং অপরটি বাহ্যিক রূপ। আভ্যন্তরীণ রূপটা প্রেমভিত্তিক। সত্যের অভাবে ধর্মের বাহ্যিক রূপ আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি ধর্মের বাহ্যিক রূপ উঠিয়ে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়– 'বৈচিত্রময় পৃথিবীর সৃষ্ট সকল পদার্থ স্রষ্টার নির্দশন। বিশ্বের প্রতিটি বিষয়ে যে মহাশক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তার উপর নির্ভর করাই সার্বজনীন ধর্ম । এটি গরীয়ান ও মহীয়ান ধর্ম'। আসলে তিনি 'ধর্ম' শব্দটি দ্বারা প্রেমকেই বুঝিয়েছেন। মানুষের অন্তরে যিনি বিরাজমান, তাঁকে সন্ধানের জন্য কোনো মন্দির, মসজিদ বা গীর্জার প্রয়োজন নেই। প্রেম থাকলে অন্তরের ধনকে অন্তরেই সন্ধান করা যায়। (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ৪৩)আল্লামা ইকবাল 'প্রেম' পরিভাষাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে প্রেম মানে আকাঙ্খা করা, আয়ত্তাধীন করা এবং এর সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে এসবকে জানার জন্য মূল্যবোধসমূহ ও চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করা এবং প্রচেষ্টা চালানো। ইকবাল এরকম প্রেমের জন্য সাধনা করেছেন ।ইকবাল কাব্যে *মুসলিম মানস ও মানবতা* গ্রন্থের (দ্রষ্টব্য : সিরাজী[৫৮] : ২০১৩, পৃ: ১৭৪) আলোকে বলা যায়–

نه شعر است اینکه بروی دل نهادم

گره از رشته معنی گشادم

به امیدی که اکسیری زند عشق

مس این مفلسان را تاب دادم

"যার ওপর আসক্ত হয়েছি তা কবিতা নয়

রহস্যের গিঁটই আমি খুলে দিয়েছি,

প্রেম একদিন অমরত্ব সুধা বিলাবে বলে

এই নিঃস্বদের তাম্রকে উত্তাপ দিয়েছি।"

তিনি জ্ঞানের তুলনায় প্রেমের প্রতি ছিলেন ভীষণভাবে আগ্রহী। তাঁর এ প্রেম কেবল খোদার সান্নিধ্য লাভের জন্যই। তিনি বলেন–

جز عشق حکایتی ندارم

پروای ملامتی ندارم

از جلوه علم بی نیازم

سوزم گریم تپم گدازم

প্রেম বিনে আমার আর কোনো বক্তব্য নেই

ভৎর্সনাকারীদের কোনো পরওয়াই করিনা আমি,

জ্ঞানের প্রতিভাসের প্রতি আমি অমুখাপেক্ষী

আমি বিগলিত হই, উষ্ণতা পাই, কাঁদি আর দগ্ধীভূত হই ।(সিরাজী[৫৮] : ২০১৩, পৃ: ১৭৯)

হাফিয শিরাযি তাঁর প্রেয়সীর রূপ-সৌন্দর্যকে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন, যা মা'শুকের চেহারার আলোকবর্তিতার প্রতিফলন। আর প্রেয়সীর সৌন্দর্যকে ফুলের সাথে তুলনা করেছেন, যার তরতাজা ভাব মা'শুকের চিবুকের টোল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রেমাস্পদের বাগানের ঘ্রাণ নিয়ে নিজেকে ধন্য করতে চেয়েছেন। তাঁদের দুজনের প্রাণ যেন সেখাানে একাকার হয়ে গেছে। আসলে তিনি নিম্নোক্ত গযলটি দ্বারা মহান প্রভুর রূপ-সৌন্দর্যই বর্ণনা করেছেন-

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدستهای
بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی میکند دلدار را آگه کنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو
کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی
تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما
میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২, তদেব, পৃ: ১)

The bright moon reflects your radiant face

Your snowcapped cheekbones supply water of grace

My heavy heart desires an audience with your face

Come forward or must reture, your command I will embrace.

Nobody for good measures girded your fields

Such trades no one in their right mind would chase.

Our dormant fate will never awake , unless

You wash its face and shout brace, brace!

Send a bouquet of your face with morning breeze

Perhaps inhaling of your scent, your fields we envision & trace.

May you live fulfilled and long, O wine-bearer of this feast

Though our cup was never filled from your jug or your vase.

My heart is reckless , please, let Beloved know

Beware my friend, my soul your soul replace.

O God, when will my fate and desires hand in hand

Bring me to my Beloved hair, in one place?

Step above the ground , when you decide to pass us by

On this path lie bloody,the martyrs of human race.

Hafiz says a prayer, listen, and say amen

May your sweet wine daily pour upon my lips and my face.

O breeze tell us about the inhabitants of city of Yazd

May the heads of unworthy roll as a ball in your polo race.

Though we are far from friends, kinship is near

We praise your goodness and majestic mace.

O Majesty, may we be touched by your grace

I kiss and touch the ground that is your base.(Ghazal no 12 : www.hafizonlove.com)

প্রেমের উৎস সম্পর্কে আল্লাহ্পাক ‘সুরা হিজর’ এর ২৯ নং আয়াতে বলেন–

“আমি যখন তাঁর আকৃতি সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তাঁর প্রতি সিজদা করিও ।”

শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার তাঁর রচিত বেশ কিছু মসনবিতে প্রেমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সুফি সাধকগণ তা মেনে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন:

"প্রেম হলো নিজ অস্তিত্ব হতে মুক্ত হওয়া

এবং চির সত্যের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা।" (হক[৬৫] : তদেব, পৃ: ২৭)

অন্যত্র তিনি আরও বলেন–

در دل عاشق چو عشق آتش فروخت

هرچه جز معشوق بود آن را بسوخت

"প্রেমিকের হৃদয়ে যখন প্রেম আগুন ধরিয়ে দেয়

তখন তা তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রেমাস্পদ ছাড়া আর যতো কিছু আছে সব কিছুকে পুড়িয়ে ফেলে।"

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক বলেন–

"আর যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছেন তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত । কিন্তু তোমরা বুঝতে

পারোনা।"(সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৪)

কোরআনের এই আয়াত অনুসরণ করে হাফিয বলেন-

"যার হৃদয় প্রেমে উজ্জীবিত হয়েছে সে কখনো মওে না।

(আমরা যারা প্রেমিক) পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে আমাদের নাম চিরকালের জন্য রেকর্ড করা হয়েগেছে।"(হক[৬৫] :তদেব, পৃ: ২৮)

এই উপমহাদেশের সুফি-সাধকগণের মধ্যে লালনের অধ্যাত্মবাদের সাথে হাফিযের অধ্যাত্মবাদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। লালনের দর্শনে ফারসি কবিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুফি-সাধকগণ মূলত প্রেমিক। প্রেমহীন কর্ম ও ধর্ম উভয়ই তাদের কাছে অর্থহীন। প্রেম ছাড়া ধর্ম পালন হয়না, ইবাদত হয়না, সমস্ত ইসলামী দর্শনবিদ এবং সব তরিকার সুফিগণ একমত যে, প্রেমই সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ, প্রেমই সমগ্র সৃষ্টি ও মানব জীবনের লক্ষ্য। এই প্রেমতত্ত্ব সেই বুঝে যে নিজেকে চিনে 'আমি' এর তত্ত্ব বুঝতে পারে। একে আত্মতত্ত্বও বলা যায়। আর এই আত্মতত্ত্ব জানার মাধ্যমে পরমাত্মা তথা সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভ করা যায়। হাদিস শরীফে আছে– 'যে নিজেকে চিনে সে তার প্রভুকে চিনে। লালন বলেন–

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়।

'আমি' শব্দের অর্থ ভারি

আমি সেতো আমি নয় ॥(রসুল[৪৬] : ২০১৩, পৃ: ১৩২)

চাতক পাখি যেমন মেঘের জল পান করার জন্য অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, অন্য পানি পান করে না, তেমনি লালনের ভাষায় প্রেমাস্পদকে না পেলে প্রেমিকের এমন দশা হয়। চাতকের মতো ব্যাকুলতা না থাকলে তাকে পাওয়া যায়না। তিনিবলেন–

চাতক পাখীর এমনি ধারা,

তৃষ্ণাতে প্রাণ যায় গো মারা,

অন্য বারি খায়না তারা-

(থাকে) মেঘের জন ব'লে ॥

মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি,

তবু চাতক মেঘের ভুখি,

অমনি মত হ'লে আঁখি

সে ধন মিলে ॥(রসুল[৪৬] : তদেব, পৃ: ১৩৮)

অন্যত্র লালন বলেন-

"ইশ্‌কে আল্লা ইশ্‌কে রসুল,

ইশ্‌কে ভাই জগতের মূল

ইশ্‌কে বিনা ভজন-সাধন

সবকিছু হয় ভুল ॥"(তদেব, পৃ: ১৩২)

আর হাফিযের মতে প্রভুর আলিঙ্গন পাবার জন্য অনেক প্রেমিক ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। প্রভুর মিলনের পথ থেকে সরে ব্যর্থ হয়ে কেউ মৃত্যুকেই সঙ্গী করে নেয়, কেউ অমরত্ব লাভ করে আবার কেউ প্রতীক্ষায় থাকে সারাজীবন । হাফিয সেই প্রতীক্ষাকারীদের দলে, তাদেরই একজন হয়ে প্রভুর প্রেম-বন্দনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে অনন্তকালের জন্য। যেমন মোস্তাক আহ্‌মাদ তাঁর *দিওয়ান-ই-হাফিজ* গ্রন্থে (আহ্‌মাদ[২] : ২০১৪, পৃ: ৯৯) কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত একটি রুবাইয়্যাত-এ বলেন–

আলিঙ্গন ও চুম্বন হায়

মরল তোমার ধেয়ান ক'রে

তোমার ঠোঁটের চুমু না পেয়ে

পান্না-চুনি গেল ম'রে

কাহিনী আর বাড়াবনা

অল্পে সারি কল্পকথা,-

মরল কেহ ফিরে এসে

প্রতীক্ষাতে জীবন ধ'রে ॥

হাফিয সুন্দর সমূহের সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন। এদিক থেকে প্রেমখেলায় তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন । তাঁর ভাষায়–

به لا به گفتمش ای ماهرخ چه باشد اگر

به یک شکر ز تو دل خسته ای بیاساید

به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند

که بوسه تو رخ ماه را بیالاید

"না দ্বারা বললাম তাকে হে চাঁদমুখ কি দোষ তাতে যদি

একটি শোকরের মাধ্যমে তোমার থেকে কোনো পরিশ্রান্ত মন শান্তি পায়,

হেসে বলল হে হাফিজ! তোমার কদাকার মুখের চুম্বন

চাঁদমুখকে কলুষিত করুক আল্লাহ্‌র তা পছন্দনীয় না।" (উদ্ধৃতি : মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৮)

আবার কখনো কখনো নারীরা হাফিযকে বোকা বানাতো। যেমন তিনি বলেন–

به عشوه گفت که حافظ غلام طبع توام

ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق

"অভিমান করে বললো হে হাফিজ আমি তোমার স্বভাবের গোলাম

দেখ এই নারী আমাকে কতোটা ঠকায় আর বোকা মনে করে।" (উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ: ৮৮)

তবে এখানে একটা কথা বলা জরুরী যে,উপরোক্ত পংক্তিগুলোতে হাফিয যে নারীর কথা বলেছেন, সে সধবা নারী। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন–

প্রতিপালক হে, এ হৃদয় উদ্ভাসী প্রদীপ সে কার ভিটা থেকে

আমাদের প্রাণ জ্বলে যায় জিজ্ঞেস করোপ্রিয়তমা কার সে? (মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৯)

প্রেমদর্শন সম্পর্কে প্লেটোর মত হচ্ছে পরম সত্তা অতীন্দ্রিয় জগতের সত্তা, ধারণার উৎস পরম ধারণা এবং 'এরস' বা প্রেম বিশ্বের মূলনীতি। তাঁর মতে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুরই একটা করে সূক্ষ্ম আর্দশ বা ধারণা আধ্যাত্মিক জগতে আছে। প্রকৃতিতে যে বস্তুর প্রকাশ ঘটে, তা আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত মূল ধারণার জড়ের মাধ্যমে স্থূল প্রকাশ মাত্র। এই সকল মূল আর্দশ ধারণা প্রকৃত সত্তা । ধারণাগুলো আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত। সেগুলোর বহিঃপ্রকাশই প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু। সৌন্দর্য একটি গুণ। আর এই গুণও মূল আর্দশ ধারণা বাপরম সৌন্দর্যের প্রকাশ মাত্র। সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুতে সৌন্দর্যের যে বিকাশ দেখা যায়, সেটাই হচ্ছে পরম সৌন্দর্য। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা পরম সত্তা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা। ইসলামের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইবনে সিনা প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন– প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম ও প্রকৃতির কার্যকরী শক্তি। প্রেম পরম সৌন্দর্যের দিকে আর্কষণ ও ব্যক্তিগত অমরতা অর্জনের শক্তি। (সরকার[৬০] : ২০১৪, পৃ: ২২৯) আর হাফিয তাঁর প্রেমাস্পদের স্মরণে সর্বক্ষণ ব্যকুলথাকে ।

তাঁরদৃষ্টি পলকহীন অবস্থায় তাঁর (প্রেমাস্পদের) দিকেই তাকিয়ে থাকে। দুনিয়ার সবার চোখে যখন ঘুম নেমে আসে, তখন হাফিযের নির্ঘুম চোখ তাঁর প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দর্শনে দগ্ধ হয়ে যায়। সে সারাক্ষণ প্রেয়সীর চিন্তাতেই ধ্যানমগ্ন থাকে। যেমন একটি রুবাইয়্যাত-এ তিনি বলেন–

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که چشمدر نیامد ما را

(শিরাযি[৫২] : রুবাঈয়্যাত নং- ৭৪২, তদেব, পৃ: ২৮৯)

কাজী নজরুল ইসলাম এই রুবাইয়্যাতটির অনুবাদ করেছেন এভাবে-

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,

দৃষ্টি আমার পলক-হারা।

তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ

পা চলেনা-যে পথ ছাড়া।

হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে

নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,

আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,

দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা ॥(ইসলাম[৫] : ২য় খন্ড, ১৯৯৩, পৃ: ১৯)

রুমির মরমীতত্ত্বের ভিত্তি হলো প্রেমতত্ত্ব । প্রেমকে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে। হেগেলের ন্যায় রুমিও এক অনন্ত পরম সত্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু জীবন ও ইতিহাসের গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি হেগেলের মতো নয় (thesis), প্রতিনয় (antithesis) ও সমন্বয় (synthesis) এর দ্বান্দ্বিকতার শরনাপন্ন না হয়ে বরং অগ্রসর হয়েছেন এক অজাগতিক প্রেমেরদিকে। এ প্রেমটাই আর্কষণ সৃষ্টিকারী এক সর্বাত্মক আধ্যাত্মিক শক্তি। তাঁর মতে প্রেম বলতেই বুঝায় এক সৃজনী-শক্তিকে। হেগেলের মতে, সৃষ্টি অগ্রসর হয় বিপরীত শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে। কিন্তু রুমির মত হলো যা বিপরীত তা আসলে বিরুদ্ধভাবাপন্ন নয়, বরং প্রেমের স্পর্শে আগে থেকেই দৃশ্যমান। পরমস্রষ্টা আল্লাহ্ এই প্রেমের স্রষ্টা, আর তাই তা অগ্রসর হয় আল্লাহ্রই অভিমুখে ॥(ইসলাম[৭] : ২০০৪, পৃ: ১৯৭) মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি প্রেমকে আয়নার সাথে তুলনা করেছেন। প্রেমের ধর্মই হলো নিজেকে প্রকাশ করা। প্রেমাসক্ত কেউ তার আসক্তির কথা চেপে রাখতে পারে না। কোনো না কোনোভাবেই তা প্রকাশ পায়। ঠিক একটাস্বচ্ছ আয়নার সামনে যা কিছুই আসবে, তা প্রতিফলিত হবে। তেমনিভাবে প্রেমের মাঝে প্রকাশিত হবে প্রেমিকের স্বরূপ। আর তখন প্রেমাস্পদও ধরা দেবে প্রেমিকের নিমগ্ন-চিত্তের আয়নায়। রুমি বলেন–

عشق خواهد کین سخن بیرون بود

آینه غماز نبود چون بود

آینه ات دانی چرا غماز نیست

زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست

এই চমৎকার পংক্তিগুলো ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী অনুবাদ করেন নিম্নোক্তভাবে:

প্রেম চায় এ তত্ত্বকথা বাইরে প্রকাশ হোক

আয়না প্রতিবিম্বকারী নাহলে তা কিভাবে হবে?

তোমার আয়না কেন প্রতিফলনকারী নয়, তা জানো কি?

কারণ, তার চেহারার মরিচা পরিষ্কার হয়নি। (রুমী[৪৩] : ২০০৮, পৃ: ৩৬-৩৭)

কাজেই প্রেমিকের হৃদয়ের আয়না মরিচা পড়ার আগেই পরিষ্কার করতে হবে। তারপরই সেই নূরকে সে উপলব্ধি করতে পারবে।

বাংলার লোক-সংস্কৃতির কোন একজন সাধক বলেছিলেন– 'অসাধ্য সাধন করিলে প্রেমের কিছু গন্ধ মিলে, ফেরেশতা পারে না যেতে,

প্রেম গিয়াছে সেখানে'। (রুমী[৪৩]: তদেব, পৃ: ১৫)

হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী(রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কাসিদায় বলেন–

سقانی الحب کاسات الوصال

ففلت لخمرتی نحوی تعال

"প্রেম আমাকে পান করালো মিলন সুধা ভর পেয়ালায়

বললাম ঃ আমার প্রেম সুরাকে আমার পানে এসো ত্বরা।" (রুমী[৪৩] : তদেব, পৃ: ১৫)

অন্যান্য সুফি-সাধকগণের মতে হাফিযও বলেন- আল্লাহ্‌র দিদার লাভের আশায় তাঁর মনযিলে পৌঁছতে হলে প্রেমের ডানা ছাড়া পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। প্রেম-ভালবাসা, প্রেমাসক্তি ছাড়া কোন সাধকই এ পথ অতিক্রম করতে পারেনা। তাই প্রেমের স্থান অনেক উর্ধ্বে। হাফিয বলেন-

طفیل هستی عشقند آدمی وپری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش

که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری.

می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند

به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری

طریق عشق، طریقی عجب خطرناک است

نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری.

“প্রেমের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ ও জিনপরি

প্রেম-অনুরাগ দেখাও তবেই হবে সৌভাগ্য নসীব ।

হাফেয! চেষ্টা কর, প্রেম হতে যেন বঞ্চিত না হও ।

কারণ, কোনো দক্ষতা নাই এমন দোষসহ দাস কেউ কিনবে না ।

প্রভাতের মদিরা,সকালের ঘুমের মজা আর কতকাল

নিশির কাকুতি, শেষ রাতের আহাজারীর সাধনা কর ।

প্রেমের রাস্তা ঃ বড়ই বিপজ্জনক সড়ক সেটি

আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, জানিনা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে কিনা ।”(মোতাহ্‌হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ১৭৬)

আল্লামা ইকবাল বিচার-বুদ্ধি তথা আক্‌লকে খোদাপ্রদত্ত অবদান বলে মনে করতেন । তাঁর মতে আক্‌ল ও আমল (কর্মপ্রচেষ্টা) যদি একত্রে থাকে এবং একই তালে চলে তবে অনেক ভালো হতো । তিনি বলেন–

عقل خود را بر سرگردون رساند

عالم اثبات را افسانه خواند

بسکه از ذوق عمل محروم بود

جان او و ارفته ی معدوم بود

“আক্‌ল নিজেকে আকাশে উন্নীত করেছে

বির্মূত বিশ্বকে কল্পকাহিনী বলে অভিহিত করেছে,

যেহেতু তা কর্মের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিলো

তার প্রাণ নিশ্চিহ্নতায় রূপান্তরিত হলো ।” (সিরাজী[৫৮] : ২০১৩, পৃ: ১৭৫)

প্রেম ও আক্‌ল-এর তুলনামুলক আলোচনা করতে গিয়ে ইকবাল আরো বলেন–

بنده عشق از خدا گیرد طریق

می شود بر کافر و مومن شفیق!

کفر و دین را گیر در پهنای دل

دل اگر بگریزد از دل، وای دل!

گرچه دل زندانی آب و گل است

این همه آفاق، آفاق دل است!

"প্রেমের অনুগত বান্দা খোদার কাছ থেকে নেয় পথের দিশা

কাফের ও মু'মিন উভয়ের জন্যই হয় দয়াশীল, উদার

কুফ্‌র ও ধর্ম উভয়কেই ধারণ করে হৃদয়ের প্রশস্ততায়

হৃদয় থেকে যদি হৃদয় পালিয়ে যায়, আফসোস সে হৃদয়ের জন্য

যদিও হৃদয় এই পানি ও মাটির কারাগারে বন্দী

এতো যে দিগন্ত, সে তো হৃদয়ের দিগন্ত!" (সিরাজী[৫৮] : তদেব, পৃ: ১৭৫)

সৃষ্টির উৎপত্তির প্রশ্নে একজন সাধক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি এসবের উপর নির্ভর করে না, বরং তারা প্রেমের ওপর

নির্ভর করে। তাই তারা বলেন যে, আক্‌ল একটি রক্ষণশীল শক্তি। আর প্রেম হলো বৈপ্লবিক শক্তি। অর্থাৎ আক্‌লের দায়িত্ব হলো রক্ষা করা। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সবসময় চায় সর্তকতা অবলম্বন করতে, নিজেকে সংবরণ করতে। আর সবকিছু নিজের জন্যই চায়। আক্‌লের রক্ষণশীল শক্তির ওপরে প্রাজ্ঞ দার্শনিক অধিক নির্ভর করে থাকেন। প্রেম হলো এর বিপরীত। আসলে প্রেম এমন একটা শক্তি, চাই তা আল্লাহ্‌র সত্তায় হোক বা সৃষ্টির সত্তায়, প্রকাশ পাবেই। হাফিযের মতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রেমের দ্বারা, জ্ঞান বা আক্‌লের দ্বারানয়। যেমন হাফিয বলেন-

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১৯৫, তদেব, পৃ: ৮৭)

শহীদ আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহ্‌হারী উপরোক্ত বেইতগুলোর কাব্যানুবাদ করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

"অনাদিকালে তোমার সৌন্দর্য ছটা তাজাল্লী ঘটালো

এতে ইশ্‌ক সৃষ্টি হলো আর গোটা বিশ্বে আগুন ছড়ালো

যখন প্রকাশিত হলো তার অপরূপ, দেখতে পেলো ফেরেশতা নেই প্রেম

আগুনের রূপ নিলো অভিমানে এবং আদমের প্রতি ছুড়লো ওই অগ্নিবান।"(মোতাহ্‌হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১২১)

আর ফরিদ উদ্দিন আত্তার বলেন- প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা কাজ করতে থাকে। যেখানে ত্যাগ নেই সেখানে প্রেম নেই। যারা আত্মত্যাগ করেন তারা অমর। তিনি বলেন-

عقل میگوید که خود را بیش کن

عشق می گوید که ترک خویش کن

"বুদ্ধি বলে নিজেকে বাড়াও,

আর প্রেম বলে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করো।"(হক[৬৫] : তদেব, পৃ: ২৭)

আর হাফিযের দৃষ্টিওপ্রেমের দিকেই আবদ্ধ। সর্বত্রই তিনি প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেন-

এর আগে তোমারএর বেশি ছিলো প্রেমিকদের নিয়ে চিন্তা

তবে আমাদের প্রতি তোমার দয়াশীলতা দিক-দিগন্তে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। (মোতাহ্হারী[৪০] : পৃ: ১২১)

অতঃপর বলেন-

"এ সবুজ পৃথিবী ও রঙিন আসমান রূপ লাভের আগেই

প্রিয়তমার ভ্রূকূটি আমার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিল।" (তদেব, পৃ: ১২২)

আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে ভীত হলো কিন্তুমানুষ তা বহন করলো।" (সুরা আহযাব,আয়াত-৭২) এই আমানতটাই হলো প্রেম। মানুষই হলো একমাত্র সৃষ্টি যার মধ্যে এই আমানত বহন করার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো। হাফিয বলেন-

عقل می خواست کزان شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشا که راز

دست غیب آمد و بر سینه نا محرم زد

"আকল চেয়েছিলো ঐ প্রেমাভিমান শিখা থেকে প্রদীপ জ্বালাতে

আত্মসম্মানের বজ্র চমকিত হয়ে জগতকে লন্ডভন্ড করে দিলো।

দাবীদার চাইলো রহস্য অবলোকন করবে গোপন সব রহস্যভেদ

অদৃশ্য হাত এসে ওই না-মাহরামের বুকে মারলো প্রচন্ড আঘাত।" (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ১২১)

হাফিযের বহু গযলে তাঁর প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজেকে 'প্রেমভিখারী' বলে ভাবতেন। প্রেমাস্পদের বিরহ-যাতনায় আর কেউ যেন তাঁর মতো দূরে সরে না থাকে। তার প্রিয়ার রূপের আলোয় মসজিদ আর মদ্যশালা আলোকিত হয়ে ওঠে। হাফিয সবসময়ই তার ধ্যানেই মগ্ন থাকেন। যেমন আবদুল হাফিজ অনূদিত একটি গযলে তিনি বলেন–

কেউ দেখেনি রূপটি তোমার হাজার প্রেমিক প্রেম-ভোলা,

ঘুম টুটেনি ফুল বালাদের বুলবুলিরা দেয় দোলা

তোমার কুঞ্জে এলেম আজি চমকে উঠার নেই কারণ

প্রেম ভিখারী অনেক আছে এই মুলুকে মোর মতন।

আজকে আমি দূর-বিরহী (দূরে যেন কেউ না রয়)

দুলবে কণ্ঠে কান্তা আমার– শুভ লগ্ন সুদূর নয়।

মসজিদ আর মদ্যশালা প্রেমের পথে দুই সমান,

দুই জগতে বিরাজ করে প্রিয়ার রূপের আলোর বান,

অনেক রকম উপাচারে সজ্জিত রয় ভজন ঘর

শঙ্খ-ত্রিশূল ক্রুশ-প্রতিমা পুরোহিত বা পাদ্রীবর

কেইবা এমন প্রেমিক, প্রিয়া চায়নি যাহার মুখ পানে

ব্যথা যে নেই, হাকিমে আজ আনব ডাকি কোনে ভাণে?

হাফিয কবির এ অভিযোগ পুরোপুরি নয় বেকার,

চমৎকার তার উপাখ্যান আর কথাগুলোর কি বাহার! (হাফিজ[৬৪] :গযল নং- ৪৭, ১৯৮৪)

আর খাজা মুঈনদ্দিন চিশতির মত হলো, প্রভুকে পেতে হলে তাকওয়াকে (আল্লাহ্‌র ভয় বাখোদা ভীতি বা fear of God) প্রেমের রাস্তায় প্রবাহিত করতে হবে। তিনি ভয়কে প্রেমে পরিণত করার কথা বলেছেন। ভয়ে ভীত থেকে মানুষ যত না ভালো থাকতে পারে প্রেমে তার চেয়ে অনেক গুণ ভালো থাকতে পারে। কারণ তখন প্রেমাস্পদকে হারানোর ভয় এত প্রকট হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রেমাস্পদের জন্য যে কোন ত্যাগ বা বিসর্জন তার কাছে সহজ হয়ে যায়। নিম্নোক্ত গযলে চিশতি সকল চাওয়া-পাওয়ার পর্দা সরিয়ে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শন এবং তাকওয়া অবলম্বন করার কথা বলেছেন–

ز پیش خویش برافگن نقاب دعوی را

ببین که کسوت صورت جمال معنی را

بزن به سنگ ملامت ز جاجه ی ناموس

به کوی عشق بریز آبروی تقوی را

"নিজের সম্মুখ থেকে চাওয়া-পাওয়ার নেকাব তুলে ফেলো

হৃদয়ের আয়নায় তুমি মাওলার সৌন্দর্য দেখো।

সাধুতার কাঁচ দিয়ে আঘাত করো ভৎর্সনার পাথরে

তাকওয়ার মর্যাদাকে ঢেলে দাও প্রেমালয়ে।"(চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : ২০১১, পৃ: ৪৫-৪৬)

জ্ঞান প্রেম ওসজ্ঞার পূর্ব শর্ত ।অজ্ঞানীর প্রেম সঠিক পথে চালিত নাও হতে পারে। জ্ঞানীর প্রেম পথ-পরিক্রমার স্তরসমূহ সঠিকভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। এটা সাধারণভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, অবুঝের প্রেম পাগলামি মাত্র। প্রেমিক হতে হলে জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানীর প্রেমের গভীরতা প্রগাঢ়। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সর্ম্পকে কোনো চিন্তাশীল ধারণানা থাকলে প্রেমের উদ্দীপনা জন্মায় না। তাইতো লালন বলেন,'না জেনে লালন প্রেমের উদ্দীপন/পিরীত করে মিছে'। জ্ঞানীর প্রেম তার আত্মাকে শক্তিশালী করে ক্রমাগত উর্ধ্ব দিকে নিয়ে যায় এবং পরিশেষে প্রেমাস্পদের সাথে মিলন ঘটায়। এজন্যই খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেছেন, প্রেম হুমা পাখীর মতো সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে এবং মজ্জুব (অর্থাৎ যারা ঐশী প্রেমে আত্মহারা) মজলিশ মহামিলনের মহানন্দে ভরপুর থাকে। আর দিভা'ন-ই-শামস তাব্রিজে বলা হয়েছে, প্রেম হচ্ছে আকাশ অভিমুখে উড্ডীয়মান হওয়া; প্রতি মুহূর্তে শত যবনিকা ছিন্ন করা। প্রথম মুহূর্তে জীবন-বাসনা ত্যাগ করা; শেষ ভাগে বিনা পদে চলা । এ জগতকে অদৃশ্য বিবেচনা করা এবং যা কিছু দৃশ্যমান তা না দেখা। হাছন রাজা আল্লাহ্‌কে পাবার পূর্বশর্ত প্রেম নির্দিষ্ট করে বলেন–

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে

পাবেনা পাবে না খোদা নামাজ রোজা কইলে।

খোদা যদি ধরতে চাও, তার সঙ্গে পিরীত বাড়াও

মিলিবে মিলিবে খোদা, প্রেমে তার মজিলে।

মিলবে নারে প্রাণের খোদাতছবি টনকাইলে

মিলবে না মিলবে না খোদা নাম তাঁর লইলে।

আল্লা আল্লা কইলে কিবা কলমাও পড়িলে

পাইবে নারে প্রাণের খোদা মাথা কুটিয়া মইলে।

অন্য পন্থে না যাইয়া প্রেম পন্থে গেলে

পাইবায় পাইবায় খোদা হাছন রাজা বলে।(দ্রষ্টব্য : চিশ্‌তী[১৯] (রঃ) : তদেব, পৃ: ১০৬)

মহাকবি ইকবাল বলেন-

প্রেম হচ্ছে আপাদমস্তক সান্নিধ্য

প্রেম দমনই সৃষ্টির কোলাহল।

প্রেম সত্তারলীলা, শান্ত ও স্থীত, জীবন ও মৃত্যু

প্রেম হচ্ছে গোপন সমাধান।

প্রেমের অলৌকিকত্ব হচ্ছে রাজত্ব নিরাসক্ত ও ধর্ম

প্রেমের দীনতম দাস মুকুট ও রাজ আঙ্গুরির অধিকারী।

প্রেম স্থান ও অবস্থিতি, কাল ও সৃষ্টি

প্রেম আপাদ মস্তক ধ্রুব বিশ্বাস।

প্রেমের রাজপথে সুখ-বিশ্বাস অবৈধ

প্রেমে তরঙ্গ বিক্ষোভ বৈধ, তীরের আনন্দ অবৈধ।

প্রেম অশনি বৈধ

প্রেমে প্রাপ্তি অবৈধ। (উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ: ১০৬)

আর হাফিয বলেন-

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
گرد خط او چشمه کوثر بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداخت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت

"My beloved is brighter than the sun,

Put in the heavens, my only one.

Placed the hearts upon the earth

To watch the sun's daily run."

পীর-মুর্শিদের আনুগত্য

অধ্যাত্ম সাধনার পথে পীর-মুর্শিদের আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। অনেকের ধারণা, যার কোনো পীর নেই, শয়তানই হলো তার পীর। সাধনপথে সাফল্য অর্জন করে যাঁরা আগেই কামালিয়াত্ হাসিল করেছেন এমন লোকই পীর, মুর্শিদ বা শেখের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। আউলিয়া-দরবেশদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুফি সাধনার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সুফিদের ধারণা আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন আউলিয়া-দরবেশদের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নয় বরং অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। আউলিয়া-দরবেশগণের মর্যাদা সম্পর্কে দাতা-গঞ্জবখশ্*কাশফুল মাহ্জুব* গ্রন্থে লিখেছেন–"আল্লাহ্তায়ালা বর্তমান যুগ পর্যন্তও 'বোরহানে নববী' বা নবীত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছেন আউলিয়া-দরবেশদের মাধ্যমে। তাঁরা পরম সত্যের চিহ্ন প্রতিভাত করে তোলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাহাত্ম্য যাতে মানুষ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সে মতেই কাজ করে যান। (রহমান[৪৫] : ২০১২, পৃ: ৭২)আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াটা মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে হওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসার জন্য যেমন চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপত্র উভয়ই প্রয়োজন অথবা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক কোনোটির একটি বাদ দিলে যেমন শিক্ষা লাভ করা যায় না, তেমনি সুফিবাদের

অনুশীলনে মুর্শিদের প্রয়োজন। হাফিযের কাব্য কর্মের মর্মবাণী থেকে ধরে নেয়া যায় যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে সুফিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সাধনার পর মুর্শিদের পথ নিদের্শকে অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিক সাধনায় পীরের অনুগ্রহ একান্ত অপরিহার্য। যেমন তিনি বলেন-

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائمست

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ اربر صدر ننشیند ز عالی همتی است

عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ২৮, তদেব, পৃ: ১৫)

পীরের দরবারগাহে আসল শরাবের উমেদার আমি।

খামাখা শেখের ফতোয়া গরম, ছায়ার মরম দামি ॥

যদি হাফিয রাজবেশে সিংহাসনে বসতে না পায়।

প্রেমের সম্পদ গরিবের খেদমত বাঁধা গান গায়, কী আসে যায়? ॥ (সাঈদ[৫৬] (অনূদিত) : ২০১২, পৃ: ১৬২)

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যই পীরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। (بیعت) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয় শর্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। 'বাইউন'(بیع) শব্দ থেকে (بیعت) শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। তাসাউফ শাস্ত্রের পরিভাষায় তরিকতের ওস্তাদ অথবা আধ্যাত্মিক পীর-মুর্শিদের হাতে হাত রেখে আত্মোৎকর্ষ বা আত্মিক উন্নতিকল্পে তথা আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভের দৃঢ় সংকল্পে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়াকে বাইয়াত বলা হয়। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক আত্মাকে আল্লাহ্র রঙে রাঙিয়ে তোলা, আল্লাহ্র স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া এবং আত্মাকে আল্লাহ্তে সমাহিত করে দেওয়ার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকেন কামেল পীর-মুর্শিদগণ। আত্মার উন্নতিকল্পে যেসব শর্তসমূহ রয়েছে তা মেনে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইয়াত বলা হয়। পীরের কথা মেনে চলা অবশ্যই মুরিদের কর্তব্য। 'মুরিদ'(مرید) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছুক, শিষ্য, ভক্ত। যিনি আল্লাহ্ ও রাসুলের নৈকট্য লাভের ইচ্ছুক, তিনিই তাসাউফ শাস্ত্রের ভাষায় 'মুরিদ' নামে অভিহিত। 'পীর' (پیر) ফারসি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধ, বয়স্ক, প্রবীন,পরিপক্ক, অভিজ্ঞ। যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ, পারদর্শী বা আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ, তিনিই মুসলমানদের নিকট 'পীরে কামেল' নামে পরিচিত। 'মুর্শিদ'(مرشد) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দিশারী। যিনি তরিকতের পথে তাঁর ভক্ত বা শিষ্যদেরকে দিশা দিয়ে থাকেন, তিনিই দিশারী বা মুর্শিদ নামে অভিহিত। (হাযারী[৬৮] : ২০০৮, পৃ: ২০১-২০২)

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মতে, নিঁখাত রূহ পাওয়া যায় আউলিয়ায়ে কেরামের অস্ত্র কারখানায়। অস্ত্র কারখানা মানে আল্লাহ্র ওলিদের সাহচর্য। তাঁদের দর্শন পরশ পাথরের মতো কাজ করে। তাঁদের সাহচর্যে অপূর্ণ লোকদের জীবনে পূর্ণতা আসে। তাঁরা হচ্ছেন এই দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্তায়ালার রহমতস্বরূপ। তিনি বলেন, ওলি-আউলিয়াদের সাহচর্য শত বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। মওলানা রুমী (রঃ) *মসনবী শরীফ* গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

"এমন তরবারী আউলিয়াদের অস্ত্র কারখানাতেই মিলে,

তাঁদের দর্শন লাভ তোমাদের জন্য পরশ পাথর সমতূল্য

জগতের জ্ঞানী-মনীষী সবাই বলেছেন এরূপ

জ্ঞানী-মনীষীরা জগতের জন্য রহমতস্বরূপ ।"

অন্যত্র মাওলানা বলেন–

কিছু সময় আউলিয়া কেরামের সাহচর্য

শত বছর রিয়াহীন বন্দেগীর চেয়েও উত্তম ।

অন্যত্র বলেন-

گر تو سنگ صخره و مرمر شوی

چون بصاحب دل رسی گوهر شوی

"যদি তুমি শক্ত পাথর বা কঠিন মর্মরও হও

অন্তরওয়ালাদের কাছে গেলে রত্নে পরিণত হবে ।" (রুমী[৪৩] : ২০০৮, পৃ: ২১৭)

বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনায় এসেছে বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতেন । যেমন হিজরত, জেহাদ, আর্কানে ইসলাম, সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রভৃতি প্রতিশ্রুত বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংকল্পে অটল ও দৃঢ়পদ থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতেন । মুরিদও তাঁর পীরের সঙ্গে এই শর্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, তিনি মুরিদকে যা নির্দেশ করবেন, মুরিদ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন । হাফিয বলেন (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৩৩, পৃ: ১৮):

শরাব খানার কোণ আমার সাধন প্রকোষ্ঠ,

পারসিক পীর-ই-মগানের আর্শীবাদ আমার প্রাতঃকালীন ওজিফা ।

যদি বীণার ঝঙ্কার আর শরাব সোরাহী না থাকে, তবে দুঃখ কি?

প্রাতঃকালীন ব্যর্থ 'আহ' আমার বীণার সুর হইবে ।

আমি রাজাও নই ভিখারীও নই, আল্লার হাজার শোকর

বন্ধুর দরজার ধূলির ভিখারী, আমার নিকট রাজা ।

তোমার মিলনপ্রার্থী, মসজিদ ও শরাবখানার প্রার্থী নই

এই বাসনা ছাড়া আর কোন কামনা নাই, খোদা সাক্ষী ।

তোমার দ্বারে ভিখারী হওয়া আমার রাজকীয় অপেক্ষা আনন্দের,

এই জন্য তোমার অত্যাচার ও অবিচারের অপমান আমার ইজ্জত ও পদমর্যাদার কারণ ।

সম্ভবতঃ মৃত্যুর খঞ্জর দিয়া পট্টবাস উৎখাত করিব ভাল, নতুবা বন্ধুর

ঐশ্বর্যের দুয়ার হইতে পলায়ন করা আমাদের পথ ও রীতি নয়।

সেই সময় হইতে তোমার দরজার চৌকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি,

সূর্যের সিংহাসন অপেক্ষা আমার পদমর্যাদার আসন উচ্চতর।

হে হাফিজ যদিচ পাপ আমার এখতিয়ারে নয়,

তুমি আদবের জন্য চেষ্টা কর, আর বল পাপ আমারই। (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ৫০৩)

রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য। যে কারো তোমরা অনুসরণ করবে পথ পাবে"। ইমাম গায্যালি (রহঃ) রাসুল (সাঃ) থেকে একটি হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন– "উম্মতের মাঝে নবীর যে মর্যাদা স্বীয় জামাআতে শায়েখের মর্যাদাও তেমনি। একজন কামেল পীরের আলামত সম্পর্কে তিনি বলেন, শায়খের মান-মর্যাদা তাঁর শক্তি, সম্পদ বা মোটা শরীর হওয়ার জন্য নয়; বরং জ্ঞান-বুদ্ধির ফলশ্রুতি ও মুক্তির পথে অভিজ্ঞতার দরুণই তাঁর এই অতুল মর্যাদা। তাই দেখা যায় যে, ভালো বংশীয়গণই শুধু নন– অধিকন্তু দরিদ্র, কর্পদকশূন্য পেশার অনেকেই মযার্দাবান ও সম্মানিত শায়খরূপে পরিগণিত হয়েছেন।" এ সম্পর্কে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেন-

খাঁটি পীরের পরিচয় হচ্ছে, তাঁর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং প্রেম থাকবে,

আর ভন্ডদের অবস্থা হচ্ছে, ধোঁকাবাজি ও লালসার কারণে তাদের মধ্যে নির্লজ্জতা থাকবে। (রুমী[৪৩] : তদেব, পৃ: ১০৫)

উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, শায়খ বা পীর হবেন তিনিই, যাঁর মধ্যে নিম্নোক্ত আলামতগুলো পাওয়া যাবে-

১. প্রয়োজন পরিমাণ আনুষঙ্গিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, সে জ্ঞানটা অর্জনের মাধ্যমে হোক বা উলামায়ে কেরামগণের সংশ্রবের মাধ্যমে। যাতে অন্ততঃ তিনি নিজেকে ও মুরিদদেরকে আমল ও আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন। নতুবা অবস্থা হবে এই, সে যদি নিজেই পথহারা হয় তবে আর কাউকেই পথ দেখাতে পারবে না।

২. আমল, আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণ করা। যাহেরি-বাতেনি (বাহ্যিক-আত্মিক) ইবাদতসমূহ সব সময় যথাযথ পালনে যত্নবান হওয়া।

৩. সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, বিদআতী না হওয়া।

৪. দুনিয়ার মোহমুক্ত এবং আখেরাতের অনুরাগী হওয়া।

৫. কামেল বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করা।

৬. উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় বুযুর্গ, মুত্তাকী উলামায়ে কেরামের সোহবত লাভে ধন্য হওয়া।

৭. সমকালীন ন্যায়পরায়ণ উলামায়ে কেরাম এবং মাশায়েখ তাকে ভাল জানা।

৮. তালীম-তালকীন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে স্বীয় মুরিদদের অবস্থার উপর দয়াপরবশ হওয়া। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৯. তাঁর সংশ্রবে কয়েকবার বসার ফলে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ এবং আখেরাতের অনুরাগে উন্নতি অনুভব হওয়া।

১০. যারা তাঁর নিকট বাইআত হয়েছে তাদের অধিকাংশের অবস্থা শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ বৃদ্ধি এবং দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা।

১১. সহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যিকিরসমূহের ধারক-বাহক ও সংরক্ষক হওয়া।

১২. শুধু সালেহ তথা পূণ্যবান হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং মুসলেহও হতে হবে অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সংশোধনের যোগ্যতা উভয়ই থাকা জরুরী, যাতে মুরিদ যে বাতেনি রোগের কথা বলবে, তা খুব মনোযোগের সাথে শুনে চিকিৎসা করতে পারে। (করাচী, মালেক[১২] : ১৪২৮ হিজরী, পৃ: ৮০)

আল্লাহ্র ওলিদের নৈকট্য লাভ ছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ কখনোও সম্ভব নয়। আল্লাহ্পাক বলেছেন- "ওহে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনি লোকদের জানিয়ে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করতে চাও, তাহলে তোমরা আমার মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুকরণ-অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন"। কাজেই যারা রাসুল (সাঃ) এর অনুকরণ-অনুসরণ ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করতে পারবেন। আর যুগযুগ ধরে তাঁরাই আল্লাহ্র ওলি, সুফি, দরবেশ, পীর-মুর্শিদ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে আসছেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেছেন-

مولوی هرگز نشود مولای روم

تا غلام شمس تبریزی نه شد

মৎকৃত অনুবাদ: আমি নিজে কখনোও মাওলানা রুমি হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম না,

যদি না আমায় শামস্-তাবরিযির গোলামী করার সৌভাগ্য হতো।

হাফিয তাঁর বেশ কয়েকটি গযলে বলেছেন, মদ পানে তাঁর পীরের সায় আছে। তাই জায়নামায বিছিয়ে শরাব পান করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেমন তিনি বলেন–

ফুলের ফোয়ারা দেখো বন্ধুরা আনন্দ মন কাননে ফোটাই এসো।

মগান পীরের সায় রয়েছে মদ পিয়ে আজ পরান ভরাই এসো ॥

সুখ জাগানিয়া হৃদয় তুফান সময় কেঁদে যায় ঝলমল।

জায়নামাজ বিকিয়ে শরাব না কিনে এখন উপায় কী বলো ॥ (সাঈদ[৫৬] : গযল নং- ৪৬, ২০১২, পৃ: ১৭৯)

আল্লাহ্পাক বলেছেন- "ওহে খোদা-বিশ্বাসী মুসলমানগণ, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সান্নিধ্য লাভ করো"। রাসুল (সাঃ) বলেছেন– "আমি কি তোমায় ঐ বিষয়ে অভিহিত করবো না, যা ধর্মের পথে খুবই সহায়ক। আর এ দিয়েই তুমি ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারবে। আর তা হলো আল্লাহ্র ওলিদের সমাবেশে গমন। আর যখন তুমি নির্জনে একাকী বাস করো, তখনো তুমি তোমার রসনা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রেখো"। তিনি আরো বলেন– "লোকমান তাঁর পুত্রকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি জ্ঞানী-গুণী আলেমদের সাহচর্য লাভ করাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে। অভিজ্ঞ লোকদের হিতোপদেশ খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কেননা বারি বর্ষণ দ্বারা যেমন মৃত ভুমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠে, তেমনি ঐশী জ্ঞানপ্রাপ্ত ওলিদের অন্তর্জ্যোতিতে মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠে"। এ সম্পর্কে *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা* গ্রন্থের (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ২২২-২২৫) বেশকিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

মহাত্মা শেখ আকবর (রহঃ) বলেছেন–"কামেল পীরের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার না করে তুমি আজীবন সাধনা করেও প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। তাই তুমি যদি কোনো ভক্তি-ভাজন ওলি-আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাও, তবে অবশ্যই তুমি তোমার নিজেকে তাঁর সেবায় উৎসর্গ করে দিও। তিনি তোমাকে যেভাবে পরিবর্তন করতে চান, তা তুমি মাথা পেতে নিও। তোমার নিজের সমুদয় কামনা-বাসনা পরিহার করে কেবল তাঁরই আদেশ-নিষেধ পালনে ব্রতী হয়ে যেও। তিনি যা নিষেধ করবেন, তা থেকে তুমি অবশ্যই বিরত থাকবে। তিনি তোমায় যা-ই করতে বলনে না কেন, তা-ই তুমি তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে বরণ করে নিও। তাঁরই অনুমতি নিয়ে তুমি তোমার জীবনের সবকিছুই সুসম্পন্ন করবে। তিনি যদি তোমায় সারা দিন-রাত একই জায়গায় বসে থাকতে বলেন, তবে তুমি বিনা বাক্যে, বিনা দ্বিধায় তা-ই মেনে চলো আজীবন। যাতে তিনি তোমায় আল্লাহ্‌পাকের সাথে সম্পর্কিত করে দিতে পারেন। কেননা, মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্যই হচ্ছে খোদাপাকের সন্তুষ্টি সাধন এবং তাঁরই দর্শন লাভ। পরজীবনে তাঁরই দিদার লাভ করা ছাড়া তোমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

আল্লাহ্‌পাকের রহস্যময় জগত বুঝতে হলে, জানতে হলে, চিনতে হলে, অবশ্যই পীর-মুর্শিদের পদধূলি গ্রহণ করতে হবে। হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানি (রহঃ) বলেছেন- "তোমরা আল্লাহ্‌র ওলিদের সঙ্গ লাভ করো। তাহলে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওলি হতে পারবে। তোমাদের জন্য এমন পীরে কামেলের প্রয়োজন, যিনি শরীয়তের বিদ্যায় খুবই বিদ্বান এবং আল্লাহ্‌পাকের আদেশ ও নিষেধ মতো পরিচালিত।"

ফারসি কবি আমির খসরু তাঁর মুর্শিদ ভারতের বিখ্যাত সুফি ও সাধক নিজাম উদ্দিন আউলিয়া সম্পর্কে বলেছেন- "হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) সবসময় বলতেন যে, নবী ও হাক্কানী আলেমদের সাথে ভালোবাসা রাখা হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও

উত্তম। তাই প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ্‌র ওলিদের উপদেশ মতো চলা।"

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন- "মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতে এমনই নিয়ম-কানুন প্রচলিত রয়েছে যে, ওস্তাদ ছাড়া কেউ কোনোদিন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। খোদাপাক যখন যাকে তরিকতের পথে আসার শক্তি দান করবেন, তখন তার জন্য তরিকতের মুর্শিদে কামেলের অনুসন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা পীরে কামেলের সৌজন্যেই মা'রেফাতের উচ্চমার্গে পৌঁছা সম্ভব।"

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) বলেছেন- "আমি আমার পীরে কামেলের মশ্‌ক ও বিছানা-পত্র মাথায় করে দশ বছর অবধি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছি।"

হযরত শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দেস দেহ্‌লাভি (রহঃ) বলেছেন- "শরিয়তের ইমাম ও তরিকতের পীরদের মধ্যে কোনো একজনের তাবেদারী করা সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াজেব। কেননা তাঁরাই শরিয়ত ও তরিকতের তত্ত্বাবধানে তত্ত্বজ্ঞ। অর্থাৎ নায়েবে নবীগণই শরিয়ত ও তরিকতের এলমে বাতেন সম্পর্কে অবগত।"

মহাত্মা ইমাম গায্‌যালি (রহঃ) বলেছেন-

> 'তরিকত-পন্থী তরিকতের পথে চলতে গিয়ে বহু রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অনভিজ্ঞ তরিকত-পন্থীর পক্ষে একাকী পথ চলা বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই তরিকত-পন্থীর পক্ষে পীরে কামেলের সাহচর্য লাভ করা অপরিহার্য কর্তব্য। মুর্শিদে কামেলের নিকট আপন ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দিতে হয়– তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়। কেননা মুর্শিদে কামেলের নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া মুরিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। নিজের কামনা-বাসনা ও নিজের ব্যক্তিগত অভিমতকে বিসর্জন দিয়ে কামেল পীরের আনুগত্য ও নেতৃত্ব মনপ্রাণে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া মুরিদের পক্ষে আর কোনো গত্যন্তর নেই। হৃষ্টচিত্তে পীরের আদেশ-নিষেধ পালন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া মুরিদের জন্য অত্যাবশ্যক। কামেল পীরের সাহায্য ছাড়া একাকী এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা মুরিদের পক্ষে সাধ্যাতীত সাধনার

ব্যাপার। কারণ এটা কোনো প্রকাশ্য রাজপথ নয় বরং ইহা পারলৌকিক সূক্ষ্মতত্ত্বমূলক বিষয় এবং পরপারের অদৃশ্য আত্মজগতের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ। আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার একটি মাত্র সরল-সোজা পথ রয়েছে। অথচ শয়তান এই সোজা পথে অসংখ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে। অসংখ্য ভ্রান্তপথ আবিষ্কার করে দিয়ে তরিকত-পন্থীতে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় শয়তান সদা সচেষ্ট ও তৎপর। সে ঔৎসুক্যের দৃষ্টি মেলে ওৎ পেতে বসে আছে। সুতরাং অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের সাহচর্য ছাড়া এই বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করা সা'লেকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। ইহা সাধ্যাতীত সাধনার পথ।' (হাযারী[৬৮] : ২০০৮, পৃ: ২০৯)

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে বলেন-

আপনি যখন কথা বলেন তখন আমাদের মধ্যে আত্মচেতনা সৃষ্টি হয়

আপনার জ্ঞান-সমুদ্রের প্রবাহ আরম্ভ হলে আমাদের আভ্যন্তরীণ চরাভূমিও নদীতে পরিণত হয়ে যায়।

আপনি সে ব্যক্তি, যার সাহচর্য আমাদের কাছে ধূলার ধরণী ও ঊর্ধ্বাকাশ অপেক্ষা উত্তম

আপনি সে জন, যার আলোতে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত আলোকিত।

আপনি ছাড়া আকাশও অন্ধকার

আপনার ন্যায় পূর্ণিমার চাঁদ ভূ-পৃষ্ঠে থাকলে সেখানে অন্ধকার আসতে পারে কিভাবে?(রুমী[৪৪] : তদেব, পৃ: ১৬২)

হাফিয বলেন যে, পীরের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি চিরকাল শুঁরিখানার কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি বাধ্য হয়েই মদ্যশালায় যান। যেমন তিনি বলেন–

تا ز میخانه و می نام و نـشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مـغان خواهد بود
حلـقـه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر هـمانیم که بودیم و هـمان خواهد بود
بر سر تربت ما چون گذری هـمـت خواه
کـه زیارتـگـه رندان جـهان خواهد بود
برو ای زاهد خودبین که ز چشم مـن و تو
راز این پرده نـهان است و نـهان خواهد بود
ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز
تا دگر خون کـه از دیده روان خواهد بود
چشمم آن دم که ز شوق تو نـهد سر به لحد
تا دم صبـح قیامـت نـگران خواهد بود
بخـت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد
زلـف معشوقه به دست دگران خواهد بود

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১৯৬, তদেব, পৃ: ৮৭)

অনুবাদঃ As long as wine and taven are around,

Before the Master, I bow to the ground.

To the old Master, eternally I am bound,

Have always been, will always be, on this merry-go-round.

When you pass by my tomb, ask for grace,

It’s a shrine where the drunkards abound.

The self-serving pious can’t see this

That is veiled and with eyes can’t be found.

My lovely beloved left our midst on this day,

My tears ceaselessly flow, ceaselessly my chest I pound.

And when I go to sleep in my grave,

Until awakening, my concerns soul will hound.

Hafiz please help, or else fate will astound,

Beloved’s locks around arms of others may be wound. (Ghazal no 205 : www.hafizonlove.com)

হাফিযের কাব্যে বিষন্নতা

হাফিযের কাব্যের আরেকটি দিক হলো বিষন্নতা ও উদ্বিগ্নতা। তাঁর অন্তর নানা ধরনের প্রশ্ন বা চিন্তার আঁধার ছিলো। মাঝে মাঝে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পেতেন। কখনো তাঁর কাব্যে প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আবার কখনো সবকিছু পরিত্যাগ করে অন্য জগতে প্রবেশ করার কথা বলেছেন। যেমন একটি গযলে তিনি বলেছেন–

صلاح کارکجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجا

چه نسبتست برندی صلاح و تقوی را

سماع وعظ کجا نغمه ی رباب کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه ی سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه در یابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

کجا رویم بفریاد ازین جناب کجا

مبین بسیب زنخدان که چاه در راهست

کجا همی روی ایدل بدین شتاب کجا

بشد که یاد خوشش باد روز گار وصال

خود آن کر شمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ایدوست

قرار چیست صبوری کدام خواب کجا

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৫, তদেব, পৃ: ৩)

মৎকৃত অনুবাদ:কোথায় সৎকর্ম আর কোথায় আমি মন্দ

দেখো পথের ব্যবধান কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে ।

মাতালের সাথে সততার কি সম্পর্ক রয়েছে?

কোথায় ওয়াজের লালিত্য আর কোথায় বীণার সুর ঝংকার ।

আমার হৃদয়টা ইবাদতখানা আর কপটতার পোষাক থেকে বিমুখ হয়েছে

পীরের আস্তানা-ই বা কোথায়, খাঁটি শরাব–ই বা কোথায়?

বন্ধুর মুখশ্রী থেকে শত্রুর হৃদয় কি-বা লাভ করতে পারে?

নিভে যাওয়া প্রদীপটা কোথায় আর কোথায়-ই বা সেই সূর্যালোক ।

তোমার দরবারের মাটি আমাদের চোখের সুরমাস্বরূপ ।

বলে দাও এই দরগাহ্ থেকে আমরা কোথায় যাব?

প্রেয়সীর গালের টোলের প্রতি তুমি দৃষ্টি দিওনা কেননা এ পথেই রয়েছে ফাঁদ

হে হৃদয়, তুমি এত দ্রুত আমার থেকে কোথায় ছুটে চলেছো?

মিলনের যে আনন্দময় দিনগুলো চলে গেছে, তার স্মরণেই তুমি খুশি থাকো

(প্রেয়সীর) সেই অঙ্গ-ভঙ্গিমা কোথায় চলে গেছে আর ভৎর্সনাই বা কোথায় চলে গেছে

হে বন্ধু, হাফিয থেকে আরাম-আয়েশ ও শান্তির প্রত্যাশা করোনা

কেননা শান্তি-ই বা কি, ধৈর্য-ইবা কোনটা আর আরাম-ই বা কোথায়?

এছাড়া শহীদ আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহ্হারী এ সর্ম্পকে হাফিযের গযল থেকে আরো কিছু বেইত এর উল্লেখ করেছেন–

জানা হলো না যে কেনো এসেছি আর কোথায় যাব,

মনে ভীষণ দুঃখ যে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে রয়েছি উদাসীন!

যে দরজাটাই খুললাম, দেখলাম বিস্ময়ের গহীনে তার পথ,

অগত্যা বিতাড়িত হয়ে বেছে নিলাম মাস্তানী বেখবরের পথ। (মোতাহ্হারী[৪০] : পৃ: ৭৬)

জীবনকে উপভোগ করা প্রসঙ্গে

হাফিযের বেশ কিছু গযলে জীবনটাকে উপভোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে এ জীবন চলে গেলে তা আমরা আর পাবো না। জীবনটা অনেক সুন্দর। তাই নগদ আমরা যা-ই পাবো তা নেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া উচিত। কারণ এ ভাগ্যটা আমাদের আবার নাও জুটতে পারে। তিনি হযরত আদম (আঃ) এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, তিনি শান্তির উদ্যান অর্থাৎ দারুস সালাম ত্যাগ করে দুনিয়ায় এসেছিলেন। যেমন একটি গযলে (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৭, পৃ: ৪) তিনি বলেন–

মৎকৃত অনুবাদ: হে সুফি এসো, দেখো পেয়ালার দর্পণটা এতোটাই উজ্জ্বল আর পরিষ্কার যে,

যাতে তুমি পরিষ্কার রক্তিম শরাব দেখতে পাবে।

পর্দার অন্তরালে যে গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে, তা তুমি মদ্যপায়ী মাতালের নিকট জিজ্ঞাসা করো,

কেননা এই অবস্থাটা সিদ্ধ সুফির ভাগ্যে জোটে না।

এই সী-মোরগ তো কেউ শিকার করতে পারে না

কেননা এখানে জালের বিপরীতে প্রতিকূল বাতাস বইছে

এই শরাবের জলসায় দু-এক পেয়ালা পান করে চলে যাও

অর্থাৎ প্রেয়সীর সাথে চিরন্তন মিলনের প্রত্যাশা করো না।

হে হৃদয়, যৌবন তো চলে গেছে, জীবন থেকে তো তুমি একটি ফুলও তুললে না

এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি যশ-খ্যাতি প্রাপ্তির আশা করো না।

তোমার আস্তানায় আমাদের অধিক খেদমত করার অধিকার রয়েছে,

হে খাজা, তুমি আবার এই গোলামের দিকে একটু দয়ার্দ্র দৃষ্টি দাও।

এই জীবনে নগদ যা পাও, তা নেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হও, হয়ত এই ভাগ্যটা আর না-ও জুটতেপারে।

কেননা হযরত আদম (আঃ) ও শান্তির উদ্যান ত্যাগ করেছিলেন।

হাফিয তো জা'মের ভক্ত, (অতএব) হে প্রভাত সমীরণ যাও,

বান্দার ইবাদত (বন্দেগী) সেই জা'মের নিকট পৌঁছে দাও।

হাফিয তাঁর গযলে 'সময়' বিষয়টি বহুবার বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়টি খৈয়ামের কবিতায়ও অনেক বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ সময়কে ফূর্তিতে কাটানোর সুযোগ হিসেবে গণ্য করা। যেখানে অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা থাকবে না। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা যেন বর্তমানের নগদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না করে। কাজেই এই ছোট জীবনের প্রতিটি মুর্হূতকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান সময়টাকেই সুযোগ মনে করে কাজে লাগাতে হবে। হাফিযের কবিতায় 'হা'ল' এবং 'দম' এর বিষয়টি বহুবার উল্লেখিত হয়েছে।

যেমন হাফিয বলেন–

خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کارچیست

জীবন, সাহচর্য, বাগিচা আর বসন্তের চেয়ে সুন্দর আর কি আছে

সাকী কোথায় যে প্রতীক্ষার কারণ কি?

যেটুকু সুন্দর সময় হাতে পাও গণীমতের ন্যায় গণ্য করো

কেউ জানেনা শেষ পরিণাম দাঁড়াবে কি। (মোতাহ্হারী[৪০] : ২০১২, পৃ: ৮২)

ফারসি সাহিত্যে চিন্তা-দর্শনের কাঠামোতে সবচেয়ে আলোচিত কবি হচ্ছেন ওমর খৈয়াম। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি বহু গ্রন্থ পড়েছেন, বহু চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং পরিশেষে বুঝতে পেরেছেন যে, পরম সত্য সম্পর্কে তিনি যা জানেন, তা প্রকৃত সত্য-স্বরূপ নয় বরং সত্যের ছায়া মাত্র। কারণ আমাদের পক্ষে পরম সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। যার কারণে তাঁর ওপর নাস্তিকতার অপবাদ রয়েছে। তাই তাঁর কবিতায় ভোগ-বিলাসিতা এবং এই জগতের সুখ, আরাম-আয়েশের প্রতি সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি পরিদৃষ্ট

হয়- যা নিঃসন্দেহে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস এর ন্যায় গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন নিম্নোক্ত রুবাঈয়্যাত - টিতে তিনি বলেন–

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوش باش و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

"ওঠো, চলমান জগৎ নিয়ে দুঃখ করো না,

প্রফুল্ল থাকো, একটি মুহূর্ত কাটাও আনন্দের মাঝে

জগতের স্বভাবে যদি থাকতো কোনো বিশ্বস্ততা

তোমার কাছে আসতো না পালা অন্যদের কাছ থেকে।" (তামীমদারী[২১] : ২০০৭, পৃ: ১৫০)

হাফিযের কিছু কিছু কবিতা থেকে সর্ম্পূণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিস্ময়কররূপে এই নগদ আনন্দ-ফূর্তি এসব কথাকে এক ধরনের বেপরোয়া বৃত্তি এবং বিশেষ উশৃঙ্খলপনার ব্যাখ্যা করে থাকেন। আসলে হাফিয তার জীবদ্দশায় কি কাজ করতেন, তা সুস্পষ্ট নয়। হাফিযের কিছু কিছু কবিতা থেকে বোঝা যায় যে, সময়কে ফূর্তিতে কাটানোর বিষয়টি তাঁর নিজের সর্ম্পকিত নয়। তারপরও এ বিষয়টি কবিতায় তুলে ধরেছেন এভাবে-

"সকালের সমীরণ মদ্যবিক্রেতা পীরকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা দিলো

ভোগ-বিলাস আর আনন্দ-ফূর্তির মওসুম এসে গেলো।

বায়ু হলো ঈসা মসীহের নিঃশ্বাস আর সে বাতাসে মৃগনাভির সৌরভ

গাছ সবুজ হলো আর পাখী ধরেছে সুরতান

টিউলিপ যেন আগুনের চুলা, বসন্তের বাতাস প্রবাহে

কূঁড়ি হলো ঘর্মাক্ত আর ফুল খুশীতে ফোটে।" (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৩)

হাফিযের দৃষ্টিতে ভিক্ষাবৃত্তি

হাফিযের কাব্যের আরোও একটি দিক হলো ভিক্ষা ও সন্ন্যাসবৃত্তি। 'তাসাউফ' শাস্ত্রের পরিভাষায় যে ব্যক্তি সর্বদা নিজেকে সর্ববিষয়ে অক্ষম ও অভাবগ্রস্থ মনে করে আর এ অবস্থাটা তার অন্তরে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে যে, সে বুঝতে পারে ইহকাল ও পরকাল কোনো কিছুর উপরেই তার কোনো অধিকার নেই, এমনকি কোন বস্তুর উপরও তার কোনো ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই, সৃষ্টির

আদিকালেও যেমন তার কোনো ক্ষমতা ছিলো না, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও তার কোনোরূপ ক্ষমতা নেই আর থাকবেও না, এরূপ ব্যক্তিকে সুফিগণ 'ফকির' বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে 'ফকির' তাকেই বলা যায়, যে ব্যক্তি অবিরত আল্লাহ্পাকের ইবাদতে মশগুল থাকেন। এ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন– "ইবাদতও আমার নিজের কোনো জিনিস নয় এবং এর উপর আমার কোনো আধিপত্য নেই। এটা আমার ইচ্ছা বা ক্ষমতার অধীনও নয় বরং ইবাদতের দায়ে আমি স্বয়ং মা'বুদের নিকট আবদ্ধ আছি" ।(গায্যালী[১৭] (রহ.): ২০০৯, পৃ: ৬৭৬)

এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ কথা রয়েছে- "ভিক্ষা করো, যাতে মানুষের মুখাপেক্ষী না হও" । যেমন হাফিয তাঁর গযলে বলেন-

আমার সিদ্ধান্ত যদি সক্ষম হই তাহলে

এমন কিছু করবো যাতে দুঃখের অবসান ঘটে ।

মনের মধ্যে একই সাথে পরস্পর-বিরোধী অনুভবকে লালন করা যায় না

কেননা যখন শয়তান বের হয়ে যায় তখন ফেরেশতা প্রবেশ করে ।

শাসকদের সাথে ওঠাবসা হলো দীর্ঘতম আঁধার রজনীর মতো

আলো কামনা করতে হবে সূর্য থেকে যখন সে উদিত হয় ।

দুনিয়ার কাপুরুষ আর অবিচারী শাসকবর্গের দরজায়

আর কতো বসবে যে খাজা (শাসক) বের হয়ে আসবে ।

ভিক্ষাব্রত থেকে হাত গুটিয়ে নিও না কারণ সম্ভাবনা রয়েছে

কোনো এক পথিকের পক্ষ থেকে গুপ্তধন মিলে যেতে পারে তোমার । (মোতাহ্হারী[৪০] : তদেব, পৃ: ৮৯)

অর্থাৎ হাফিয বলতে চান, মানুষের চলার পথে বসে অপেক্ষা করা উচিত। ভিক্ষা করা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। হয়তো একসময় দেখা যাবে মানুষ সেখানে আসবে, এমন অর্থ দান করবে যাতে জীবনের শেষ পর্যন্ত চিন্তামুক্ত থাকা যায় ।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মতে, এক শ্রেণীর ফকির আছেন যারা একমাত্র আল্লাহ্পাকের ভিখারী হয়ে থাকেন। আরেক শ্রেণীর ভিখারী আছেন যারা আল্লাহ্পাকের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে দুনিয়া থেকে বিরাগী হয়ে বাহ্যিক দারিদ্রে আছেন বটে, কিন্তু মোটেই ভিখারী নন বরং অন্তরের দিক দিয়ে তাঁরাই ধনী। যেমন রুমি বলেন-

"এক শ্রেণীর ভিখারী এরূপ, যারা একমাত্র আল্লাহ্র দানের আয়না ।" (রুমী[৪৪] : ২০০৮, পৃ: ৬৭০)

আর এক শ্রেণীর ভিখারী আছেন, যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তারা একান্ত ধনাঢ্য। অন্যত্র তিনি বলেন–

"অবশ্য যে দরবেশ আল্লাহ্-পিপাসু হবে

সদা তাঁর আল্লাহ্র সাথে কাজ-কারবার ঠিক থাকবে ।

পক্ষান্তরে, যে দরবেশ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের পিপাসু হবে

সে নিকৃষ্ট বোকা এবং ভাল গুণ শূণ্য (মন্দই মন্দ) সাব্যস্ত হবে।"(রুমী[৪৪] : ২০০৮, পৃ: ৬৭০)

একবার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বলতে পারো, দরিদ্র কে?" সাহাবাগণ জবাবে বললেন– "আমরা তো জানি যার কাছে টাকা-পয়সা নেই তাকেই দরিদ্র বলে"। রাসুল (সাঃ) বললেন– "না, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র নয়। আমার উম্মতের মাঝে দরিদ্র হলো ঐ ব্যক্তি যে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি পুণ্যকাজ নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিলো, কাউকে হয়তো অপবাদ দিয়েছিলো, কারো সম্পদ হরণ করেছিল, কাউকে হয়েতো হত্যা করেছিলো অথবা কাউকে প্রহার করেছিলো; তার ঐ সকল জুলুমের কারণে তার সকল সওয়াব মজলুম ব্যক্তিদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার হাত একেবারেই শূন্য হয়ে যাবে। অন্যদের হক আদায় করার আগেই যদি তার সওয়াব শেষ হয়ে যায় তাহলে জালিমের কাঁধে দিয়ে দেয়া হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গুনাহ্। তাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ আমাদের হেফাযত করুন।"(নকশবন্দী (রহঃ), আল-জাওযিয়াহ্[২৫] (রহঃ) : ২০০৯, পৃ: ৩৫৪)

এখানে একটা কথা বলা জরুরী যে, হাফিযের মতে অভাব কেবল নিঃস্বতা অর্থে নয় বরং দরবেশী অর্থে। তিনি তাঁর কবিতায় মূলত দরবেশদের কথাই বলেছেন। যেমন একটি গযলে তিনি বলেন–

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
جانا بـه حاجتی کـه تو را هست با خدا
کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است
ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
آخر سؤال کن کـه گدا را چه حاجت است

অনুবাদ: The hermit has no need to watch the stage

Since Beloved is at home, no need for pilgrimage.

O soul you have a pact with the Divine,

Then ask how should I my life manage?

O king of goodness, I swear that I'm on fire

Then ask how this beggar should I manage?(Ghazal no 33 : www.hafizonlove.com)

রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "ফকিরি আমার গৌরব। আর আমি এ দ্বারা অধিকতর গৌরব বোধ করে থাকি"। তাসাউফের পরিভাষায় 'ফকির' শব্দের অর্থ দারিদ্র নয়, বরং আল্লাহর প্রেমে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। সত্যিকারের ফকিরগণ মহান আল্লাহ্র প্রেমে পড়ে জাগতিক ধন, ঐশ্বর্য ও মান-সম্মান হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বলেই তাদেরকে 'ফকির' বলা হয়। فقرশব্দটিতে তিনটি বর্ণ রয়েছে। যেমন- ف,ق আর ر। এই তিনটি বর্ণ দ্বারা তিনটি অর্থবহ উদ্দেশ্য কে বুঝায়। যেমন- فদ্বারা 'ফানা' নির্দেশক অর্থ প্রকাশ করে। যা এই গবেষণা কর্মে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফকিরি হাসিলের পথে অসহনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ জন্যই রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "খোদা-বিশ্বাসী লোকের জন্য এই পৃথিবী কারাগারস্বরূপ। এখানে শোকার্ত বস্ত্র পরিধান করবে"। ق দ্বারা কেনায়াত বা স্বল্পে তুষ্ট থাকার অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ফকিরি লাভের পথে যত সব দুঃখ-বেদনা রয়েছে, তা সহাস্যে বরণ করে নেবার নামই ফকিরি। رদ্বারা রিয়াযাত মুশাহেদা, কৃচ্ছ্রসাধন অথবা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থায় দৃঢ়পদ থাকার অর্থ

বোঝায়। অর্থাৎ সারা জীবন নফস্‌ের বিরদ্ধে এবং প্রেমময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পথে সংগ্রামরত থাকার নামই 'ফকিরি'। (হাযারী[৬৮] : তদেব, পৃ: ১৩৬)

সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করার মানসে সুফিরা দারিদ্রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন–

১.এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই এবং তিনি কিছু চান না।

২.এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই কিন্তু কিছু দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন না।

৩.এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার কিছু নেই কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট সাহায্য চেয়ে থাকেন। কাশফ-আল-মাহবুব গুরুত্ব দিয়েছে- Plain living and high thinking আদর্শে ভগবৎপ্রেম ও আনুগত্যের অনুকূলে বলে প্রচার করা হয়েছে দারিদ্রকে। (ভিক্ষু[৩৮] : ২০০৮, পৃ: ৯৮)

এ সম্পর্কে হাফিয বলেন–

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

অনুবাদ: I am the master of demands, yet my tongue is still

In your compassion to ask is an outrage.

Essence of the Beloved is the Holy Grail,

In expressing our needs, we need not engage.(Ghazal no 33 : www.hafizonlove.com)

হাফিযের কাব্যে ধৈর্য

সুফিবাদের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হলো সবর বা ধৈর্য। সাধারণ অর্থে 'সবর' হলো বিপদে, কষ্টে, দুঃখে, আনন্দে, অনাহারে, ভোগে আল্লাহ্‌তায়ালা যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, সে সীমা রক্ষা করে জীবন-যাপন করা। কোনো প্রলোভন বা কষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার না করা। অধ্যাত্মবাদে ধৈর্যের আরো তাৎপর্যবহ পরিচয় রয়েছে। সাধকদের মতে ধৈর্য হলো শয়তানের প্ররোচনা ও মনের কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র সর্তকবাণীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন। এতে সাধকগণ সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রলোভন জয় করে সৎ কাজে অভ্যস্ত হয়। সুফিবাদে কষ্ট বা বিপদকালীন অবস্থায় ধৈর্য ধারণের চেয়ে ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন ত্যাগে ধৈর্য অবলম্বনের প্রতি বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়। বস্তুত দুঃখ, বিপদ ও মহান আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় মনের ভারসাম্য রক্ষা করাই সবর বা ধৈর্য।(খলিল[১৬] : ২০১৩, পৃ: ৩৮)

হাফিযের কবিতায়ও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাঁর মতে এ দুনিয়াদারীর চিন্তায় অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয় । সে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে পৃথিবীর গুপ্ত রহস্য জানা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে হাফিয মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস একদিন না একদিন আমরা সফল হবো। অর্থাৎ আমরা খোদার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো। যেমন তিনি বলেন (শিরাযি[৫২] : গযল নং- ১০, তদেব, পৃ: ৫)

হে সাকি উঠো, শরাবের পেয়ালাটা দাও

আর দুশ্চিন্তার শিরে তুমি ধূলি নিক্ষেপ করো

যদিও বিবেকবানদের নিকট শরাব পান দূর্নামের

আমরা চাই না সুনাম আর সুযশ

শরাবের পরিপূর্ণ পেয়ালাটা তুমি আমার হাতে দাও

যাতে আমি উন্মত্ত হয়ে এই নীলাভ রং এর পোষাক উপড়ে ফেলতে পারি।

আমাকে এমন একটু শরাব দাও যা পানে অহংকার তীব্রতর হয়,

আর অপবিত্র-অবাধ্য আত্মার শিরে তুমি ধূলি নিক্ষেপ করো।

আমার হৃদয় জ্বালানো বেদনার আর্তি

অবোধ হৃদয়ের অধিকারীদের জ্বালিয়ে ফেলে

আমার প্রেম-উন্মাদনাময় হৃদয়টা রহস্যের ধারক

আমি কাউকে বিশেষ বা সাধারণভাবে দেখতে পাই না

আমার প্রেয়সীর সান্নিধ্যে আমার হৃদয়টা জুড়িয়ে গেছে

যে কিনা আমার হৃদয় থেকে প্রশান্তি একেবারে হরণ করে নিয়েছে।

পুষ্পদ্যানের দেবদারুকে তুমি আর দেখতে পাবে না

যে দেখেছে সেই শুভ্র বদনীকে

হে হাফিয দিন-রাতের দুঃখে তুমি ধৈর্য ধারণ করো

তুমি একদিন না একদিন সফলকাম হবে।

জ্ঞানীগণ বলেন– 'ধৈর্যই ধর্ম' । প্রসন্ন বদনে দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ করা, অবৈধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকা, অদৃষ্টের আঘাত নীরবে সহ্য করা, দারিদ্রের মাঝে মানবিক ভারসাম্য সংরক্ষণ করা, নীরবে নির্দ্বিধায় বিপদ গ্রহণ করে নেওয়া, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থার দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত বিপদসমূহ পরম ধৈর্যের সাথে পরিগ্রহণ করাই সাধকদের ধর্ম। ধৈর্য দুই প্রকার । যেমন-

১.দৈহিক- যেমন শারীরিক পীড়া সহ্য করা যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেমন আঘাত সহ্য করা ইত্যাদি।

২.আত্মিক- এটি মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করে।

ধৈর্যের ব্যাপক তাৎপর্যের আলোকে আমরা নিম্নোক্ত হাদিসের উক্তিটি অনুধাবন করতে পারি- "ঈমান হলো ধৈর্যের নাম"। এ শ্রেণীর সবর উত্তম ও প্রশংসনীয়। ধৈর্যের শক্তির তারতম্যভেদে মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

১.অতি অল্প সংখ্যক, যাঁদের মধ্যে ধৈর্য স্থায়ীগুণ হিসেবে অবস্থিত, তাঁরা সিদ্ধিকূল এবং মুখাবরাবুন নামে অভিহিত।

২.যাদের মধ্যে পাশবিক অধিক শক্তিশালী এবং

৩.যাদের দুটি পরস্পর বিরোধী বাসনা অনবরত সংগ্রামরত– এ শ্রেণী মুজাহিদুল নামে পরিচিত।

ইমাম-আল-গাযযালির মতে- "ধৈর্য শয়তানের প্ররোচনা ও আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারীতে পূর্ণ বিশ্বাস। প্রলোভন জয় করে মহান আল্লাহ্‌র প্রেমের পথে টিকে থাকার এক পরম মাধ্যম হলো সব্‌র।" (খলিল[১৬] : ২০১৩, পৃ: ৩৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী । তিনি এক সময় সফরে ছিলেন। তখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছালো, তাঁর ছেলে মারা গেছে। সংবাদ পেয়েই তিনি পড়লেন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। বললেন- "সে পদার্র বিষয় ছিলো। আল্লাহ্ তাকে ঢেকে নিয়েছেন। সে একটি বোঝা ছিলো। আল্লাহ্ তাকে হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাকে এর বিনিময়ে উত্তম বিনিময় দিবেন"। তারপর তিনি দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন এবং বললেন- "আল্লাহ্ আমাকে যা করতে বলেছেন আমি তাই করেছি। মানে ধৈর্য ধরেছি। নামায আদায় করেছি"। আল্লাহ্‌পাক বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও"। (নকশবন্দী (রহঃ), আল-জাওযিয়াহ্[২৫] (রহঃ) : ২০০৯, পৃ: ২৫০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাফিযের একটি গযল 'ধৈর্য কেবল ধৈর্য' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন-

ঐ দিল্ খুশ ঠোঁট দুটি থেকে

নিয়ত পরম সুখ আমি পাই;

খোদার মেহেরবানিতে আমার

অপূর্ণ নেই কোনো বাসনাই।

পুরুষ ভাগ্য, প্রিয়াকে সজোরে

বাহুডোরে বাঁধো; কখনও চুমুক

দাও পেয়ালায়, কখনও প্রিয়ার

দিল্ খুশ ঠোঁটে রাখো তুমি মুখ।

যত গোমুখ্যু বৃদ্ধ স্থবির

ভ্রষ্টাচারী যে মোল্লা ও শেখ

আমার মদ্যপান নিয়ে ওরা

বানাল আষাঢ়ে গল্প অনেক ।

ঋষিদের মুখ নিঃসৃত বাণী

জেনে গেছি আজ ওসব ফক্কা,

সাধুসন্তের হাত থেকে যেন

আল্লা আমাকে করেন রক্ষা ।

হে প্রিয়া, তোমাকে কী ক'রে বোঝাই

তোমার বিরহে হৃদয়ে কী জ্বালা;

শতধারে চোখে জল, শত বার

শুধু জ্বলন্ত নিশ্বাস ফেলা ।

সরু ঝাউ তার তনুর আকারে

চন্দ্রিমা তার ফুটফুটে গালে,

যে ব্যাথা জাগায় হৃদয়ে যেন তা

থাকে কাফেরের চোখের আড়ালে ।

থাকলে প্রিয়ার প্রতীক্ষাগুণ

সবচেয়ে শ্রেয় সেই মাধুর্য ।

মনে মনে তুমি দোয়া আওড়াও:

হে খোদা, ধৈর্য! হে খোদা, ধৈর্য!

যে পথে গলায় ঝোলে উপবীত

বুঝো সেটা ভন্ডামির মলাট;

সুফীর ধর্মে, চলে না ওসব,

নেই কো আচারবিচারের পাট ।

তোমার ও-মুখ দেখার বাসনা

হাফিযের ভ'রে দিয়েছে চিত্ত;

ফলে, সে ভুলেছে রাতের দরূদ,

শাস্ত্রীয় সব প্রাতঃকৃত্য ॥(মুখোপাধ্যায়[৩৯] : ১৯৮৪, পৃ: ৭৭)

চতুর্থ অধ্যায়

হাফিযের মূল্যায়ন

হাফিয শিরাযি মূলত বিশ্বনন্দিত হয়েছিলেন তাঁর জ্বালাময়ী প্রেমের গযলের জন্য । এমন গযল পৃথিবীর বুকে আর কেউ কখনও লিখতে পারবে কিনা সন্দেহ। তিনি ছিলেন দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ব্রাউনের মতে হোমার, কালিদাস শেক্সপিয়র ও গ্যাটের পরেই হাফিযের স্থান। এ মহান কবির উত্থান হয়েছিল পারস্যের মুসলিম রেঁনেসার জোয়ারের সময়। মানব মনে তাঁর কবিতা এতটাই স্পর্শ করেছিল যেন পাথরও মোমের কোমলতা পেয়েছিল। এমনই একজন পাথর ছিলেন তৈমুর লং, যিনি ধ্বংসযজ্ঞ, রক্তপাত আর রাজ্য জয় ছাড়া কিছুই বুঝতেন না, তাঁর এসব কাজও বন্ধ করে দিতে সর্মথ হয়েছিলেন হাফিয কিছুকালের জন্য। তখন তৈমুর লং প্রেম আর গোলাপ কী জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন। ইউরোপের দাবি কবিতার ভেতর যে রোম্যান্টিসিজম যাকে বাংলায় বলে "গীতিভাব" তা পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে উদ্ভব হয়েছে সনেটের আবির্ভাবের মাধ্যমে। বরং রোম্যান্টিসিজম এর উদ্ভব পারস্যের

মহান কবি হাফিযের হাতে। কাজেই বলা যায় প্রেমিক-প্রেমাস্পদ, গোলাপ,লা'লে প্রভৃতি শিল্পের স্রষ্টা হাফিয স্বয়ং এবং তাঁর দিওয়ানের প্রায় প্রতিটি গযলেই তিনি এসব শিল্পের সমারোহ ঘটিয়েছেন। (সাঈদ[৫৬] : ২০১২, ভূমিকা)

ফারসি ভাষা যেমন মধুর ভাষা তেমনি "দিওয়ান ই হাফিয" গ্রন্থটি অধ্যাত্মবাদের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'দিভা'ন' শব্দের অর্থ হলো কবিতা ও গান; আমরা যাকে গযল বলে জানি সেই গযলেরই স্রষ্টা হলেন হাফিয শিরাযি। হাফিযের আগে ইরানে গযলের চর্চা হলেও তা মানুষের অন্তর-আত্মাকে এতটা স্পর্শ করতে পারে নি। হাফিযের কবিতা গান হিসাবে আবৃত্তি করা হতো, এর প্রচলন করেছিলেন হাফিযই, মজলিসে এমন আবৃত্তিকে বলা হয় "মোশায়েরা"। সংগীত পাগল মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মত্ত হয়ে ভাব ও সুরের তালে অপূর্ব নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে, এমনই শুরু হয়েছিল প্রথমে হাফিযের কবিতা ও গান নিয়ে, সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। (সাঈদ[৫৬] : ২০১২, ভূমিকা) হাফিযের সমসাময়িক লেখক মৌলানা গুল আন্দাম তার প্রশংসায় বলেন– "প্রকৃতিতে সম্মানিত, গুণে ফেরেশতা, মহত্তম মৌলানা, আল্লাহ্‌র করুণা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সাহিত্যিকগনের রচনার গুরু, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খনি, ঐশ্বরিক জ্ঞানের ভান্ডার, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিয-আল্লাহ্‌ তাঁর সমাধিকে পবিত্র করুন এবং পূণ্যলোকে তাঁর পদ উন্নত করুন। ফসিহ্‌ খাফি তাঁকে "মহত্তম মৌলানা মনীষিগণ-গৌরব শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফিয শিরাযি বলে উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্‌[৪৮]: ১৯৫৯, ভূমিকা)হাফিয সম্পর্কে বিখ্যাত অনুবাদক আবদুল হাফিজ (হাফিজ[৬৪] : ১৯৮৪, পৃ: ১৪) যথার্থই বলেছেন :

> "হাফিযের প্রায় সমসাময়িক বিখ্যাত কবি জামি তাঁর রচিত "বাহারিস্তানে" অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মাধুর্য, সূক্ষ্মতা, গভীরতা, সাবলীলতা ও সহজ-সারল্য গুণে হাফিযের কবিতা অলৌকিকতার দাবিদার। তার কাব্য কর্ম শুধু পারস্য নয় সারা মানব জাতির গৌরবের ধন।"

হাফিযকে গজল কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় যদিও তিনি তাঁর পূর্ববতী কবিদের যেমন- রুমি, সাদি, খাজু কেরমানি, সালমান সাওজি প্রমুখ কবিগণদের অনুসরণ করেছেন, তবুও নিজের প্রেমগীতি রচনার মধ্য দিয়ে কবিত্ব শক্তিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গেছেন, হরেন্দ্র চন্দ্র পালের উদ্ধৃতিতে সাদি গেয়েছেন :

> "তুমি আমাকে তিরষ্কার করেছ, আমি এতেই সন্তুষ্ট
>
> আল্লাহ্‌ তোমায় ক্ষমা করুন, তুমি আমাকে ভালই বলেছো,
>
> তুমি আমাকে কুকুর বলে সম্বোধন করেছ, আমি এতেই সন্তুষ্ট

> আল্লাহ্‌ তোমায় পুরস্কৃত করুন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহই করেছো।"

আর হাফিয সাদির উদ্ধৃত দ্বিতীয় পংক্তির স্থানে বলেছেন :

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکار خارا

"চিনি মিশ্রিত ঠোঁটের পক্ষে তিক্ত উত্তরই শোভা পায়।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন :

> "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো ।" (পাল[৩৪] : ১৩৬০ বাংলা, পৃ: ১৩১)

হাফিয শিরাযি ছিলেন ফারসি সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ইলিয়ড, শকুন্তলা, হ্যামলেট ও দিওয়ানে হাফিযের সাথে পরিচিত নয় এমন কাব্যরসিক ও সাহিত্যামোদি খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং এ গ্রন্থগুলো যে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তা কেউ অস্বীকার

করতে পারবে না। (মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ১৮৫)তাঁর সম্পর্কে তানভির আহ্মাদ (আহমাদ[৭৬] : ১৯৯১, পৃ: ২০৭) বলেছেন :

> "In the annals of famous poets and writers of Iran who enriched Persian Language and Literature the name of Hafiz is supreme. He is also unforgetable because he elevated the Persian Ode to a pitch of perfection unattained by any other poet. He is rightly called the `Morning star' of Persian literature."

অর্থাৎ: ইরানের বিখ্যাত কবি এবং লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান যিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি হাফিয। মহৎ অনুভূতিসম্পন্ন কবিতা রচনা করে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তিনি যা অর্জন করেছেন তা অন্যান্য কবিদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। তাঁকে যর্থাথই ফারসি সাহিত্যের "সকালের তারকা" বলা হয়।

হাফিয গযল কাব্য-জগতের শ্রেষ্ঠ কুসুম। তাঁর গযলে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। হাফিযের গযলে যে সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছে, প্রেমের গভীরতা ও আকুলতার যে অভিব্যক্তি রয়েছে, তা আমাদের অন্তর-আত্মাকে স্পর্শ করে। অন্যান্য সুফি সাধকদের মতো তিনিও মানব প্রেমকে অবলম্বন করে খোদাপ্রেমের গান গেয়েছেন। তাঁর অপার্থিব ভালোবাসা পার্থিব প্রেমের রূপকের দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি যে পবিত্র প্রেমের গান গেয়েছেন তার অনেকগুলো আমরা আমাদের পরিচিত প্রণয়ের গান বলে বিবেচনা করতে পারি এবং তাঁর গযলে ব্যবহৃত সাকি, শরাব, জা'ম ইত্যাদিকে আমরা পার্থিব ভোগের উপকরণ বলেও মনে করতে পারি। সকল প্রকার কুটিলতা ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে হাফিয কবিতা লিখেছেন। ধর্মের ভন্ডামি, প্রেমের ভন্ডামি এমনকি আচার-বিচারের ভন্ডামিকেও ছাড়েন নি। এসবের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, যা কখনো পুরনো হবার নয়, যেমন তাঁর প্রেমের ফুল কখনোও বাসি হবার নয়। (হোসেন[৭০] : ২০১২, পৃ: ১১) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উদ্ধৃতিতে মাওলানা আবদুর রহমান জামি (১৪১৪-১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর "নফ্‌হাতুল উনস্" নামক গ্রন্থে বলেন :

> " তিনি (হাফিয) 'লিসানুল গা'য়েব' (অদৃশ্যের রসনা) এবং 'তর্‌জুমানুল ইস্‌রার' (রহস্যের ব্যাখ্যাতা) । অদৃশ্য বিষয়ে অনেক রহস্য এবং তত্ত্ব বিষয়ে অনেক ভাব বাহ্যরূপের আবরণে এবং উপমার পরিচ্ছেদে তা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও জানা যায় না তিনি কোনও পীরের হাতে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা এবং সুফিমতের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিনা,

> তথাপি তাঁর বাক্য এমনি সুফিভাবাপন্ন যে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বরং সুফি সম্প্রদায়ের প্রধানগণের মধ্যে জনৈক (আল্লাহ্ তাদের রহস্যকে পবিত্র রাখুন) বলেছেন যে, যদি কেউ সুফি হন তাঁর নিকট "দিওয়ান-ই-হাফিয" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দিওয়ান আর নেই।" (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) আর দৌলত শাহ্ বলেন : "বিদ্বজ্জনের সম্রাট, জ্ঞানীগণের সার হাফিয তার সময়ের বিস্ময়কর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাক্য এরূপ যা মানুষের রচনার ক্ষমতাতীত। সত্যিই এতে গুপ্তের প্রতি বাসনা এবং সাধক দলের আস্বাদ আছে। এজন্য তাকে 'লিসানুল গা'য়েব' বা 'গুপ্তের রসনা' বলা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান ও গুণ অপরিসীম। কবিত্ব তাঁর নিম্নপদ। তিনি কোরআনের জ্ঞানে অদ্বিতীয় এবং বাহ্য ও গুপ্ত বিদ্যায় সকলের দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন"। (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

মহাকবি হাফিযকে মুল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক মনীষী বিভিন্ন রকম উক্তি করেছেন। বিশিষ্ট অনুবাদক মুহাম্মদ ঈশা শাহেদীর উদ্ধৃতিতে "ইরানের বুলবুল হাফিয শিরাযি" গ্রন্থে উল্লেখিত এমন কিছু উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল :

ডক্টর আব্দুল করিম সুরুষ বলেন :

"বস্তু ও আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য, মানবীয় ও খোদায়ী তত্ত্বজ্ঞান, যমীন ও আসমানের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, আল্লাহ্‌র অতি-প্রাকৃতিক বাগান ও মানব বাগানের রূপসীদের ছবি হাফিযের দিওয়ানে অংকিত। আর মানুষের কাছে যেগুলো ঘৃণ্য যেমন লোক দেখানো কাজ, ভন্ডামী, পেটপূজা, রুষ্টতা, বদমেজাজ, প্রেমহীনতা, গোঁড়ামী, অহংকার, পীরগীতির নামে প্রতারণা ও ব্যবসা প্রভৃতিকে হাফিয তীব্র অথচ মধুমাখা ভাষায় আঘাত করেছেন।" (শাহেদী[৪৯] : ১৯৯০, পৃ: ১২)

হামীদ সাবজাওয়ার বলেন :

"হাফিযের কবিতায় প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা, মিলন ও বিরহ, রোগ ও চিকিৎসা, দুঃখ ও আনন্দ পরস্পর সংমিশ্রিত। প্রেম ও রূহ্‌নিয়াতের ভাবধারা উপচে পড়েছে তাঁর কবিতায়। সততা, নিষ্ঠা ও ওয়াফাদারীর প্রশংসা মূর্তিমান। তাঁর কবিতা দুঃখী ও আশাহত লোকদের সান্তনায় ভরা। প্রতারক, ভন্ড তপসী এবং পীরগিরি ও বুজুর্গী নিয়ে ব্যবসায়ীদের সমালোচনায় মুখর। দগ্ধ তাপিত হৃদয়ের আর্তনাদ হাফিযের কবিতা। ব্যথিত হৃদয়ের বেদনাগুলো অংকিত কবিতার ছন্দে। মানব-জীবনে সহিংসতার পরিবর্তে অবিনশ্বর প্রেমের দিকে পথ দেখায় । সমস্যাতাড়িত মানুষের অন্তরে প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্‌তে আত্মসর্মপণের প্রেরণা যোগায়। সর্বোপরি হাফিযের কবিতা শাশ্বত মানবতার কাব্য । এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্বের রহস্য নিহিত"। (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ১৫)

মুহাম্মদ জওয়াদ শাক্কাকী বলেন :

"ফারসি সাহিত্যে প্রেমের কথা গেয়েছেন এরূপ লোক প্রচুর। কিন্তু তাদের কেউ হাফিযের মতো জনপ্রিয়তা ও সমাদর পান নি। এর কারণ সম্পর্কে হাফিযের নিজের কথার সাথে একমত হয়ে বলতে হয় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এসে কবিকে আলিঙ্গন করতে হবে। তখনই ইরান, ইরাক ও ভারতকে (কবিত্ব দিয়ে) জয় করতে পারবে।" (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ২০)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

"আমি জানি যে, হাফিযের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতার হৃদয়কে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ণবদের দর্শন ও সংগীত ততখানি করতে পারতো না। হাফিয ছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক আনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন না। হাফিযের কবিতাই তাঁর সৃষ্টির আকাঙ্খাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্ত করত এবং হাফিয তাঁর তৃষ্ণা মিটাতো"। (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৪২) আরহাফিয সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটে বলেন : "হে হাফিয তোমার বাণী চিরন্তনের

মতো মহান। কেননা, তার জন্যে আদি ও অন্ত নেই । তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মতো একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গযলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা এর সবটাই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নির্দশন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়, হে আসমানী হাফিয! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকবো। তোমার সাথে শরাব পান করবো। তোমার মতোই প্রেমে আত্মহারা হবো। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।" (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৫২)

আমরা জানি হাফিয প্রেমের গযল লিখে বিশ্বনন্দিত হয়েছেন, যে-গযল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কবিগণও হাফিযের কাব্যধারাকে অনুসরণ করেছেন। হাফিযকে মুল্যায়ন করা সত্যিই কঠিন। তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ বলেন :

"যিনি তোমার-আমার নয়ন হতে প্রচ্ছন্ন, অথচ কখনও কখনও অজানা মুহূর্তের ফাঁক দিয়া আমাদের সকলের

অন্তরে হঠাৎ সাড়া দিয়া উঠেন, ব্যথিতের শান্তিরূপে, হতাশার আশারূপে, নিরবলম্বনের আশ্রয়রূপে যিনি মাঝে

মাঝে দেখা দেন, ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া সেই 'কাছে পেয়ে কাছে না পাই' ভাবে আমাদের সঙ্গে লীলা-খেলার অভিনয় করেন– ভ্রমণে বিহারে, হঠাৎ স্বপ্নের মত চিন্তার কোলে ভাসিয়া উঠিয়া আঁধার প্রাণে একটু অফুটন্ত কিরণ ঢালিয়া অর্ন্তধান করেন– সেই লীলাময় গোপন পুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া হাফিযের নিকট ধরা দিয়েছিলেন। একদিন ইনি-ই ওমর খইয়ামের অমর বাণীর নেপথ্য হইতে সুরালাপ করিয়াছিলেন– ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সজ্ঞানতা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আবার ইনিই আজ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতেছেন- "অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অপূর্ব এ দোল"। এই যে অসীমের সন্ধানী কবি-প্রতিভা যাহা যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া কালের বক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্ব-মানবকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, মরমে পশিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলকে আকুল করিতেছে, পারস্য-প্রসূন হাফিয তাহারই এক অভিনব বিকাশ।" (বরকতুল্লাহ[৩৫] : ২০০০, পৃ: ২১০)

ইরানের একজন বিশিষ্ট জীবনীকার পারভ'ানে তা'হেরী হাফিয সম্পর্কে বলেন :

خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی از بزرگترین شعرای ایران و جهان و والاترین غزلسرای زبان فارسی است. او مردی بود ادیب، عالم به علوم ادبی و شرعی و مطلع از دقایق حکمت و حقایق عرفان و بالاتر از همه اینها استعداد خارق العاده فطری او به وی مجال تفکرات طولانی همراه تخیلات بسیار باریک شاعرانه را می داد و او جمیع این عطایای ربانی را با ذوق لطیف و کلام دلپذیر و استادانه خود در می آمیخت و از آن میان غزلهای بی بدیل خود را می آفرید.(তা'হেরি[২২] : ১৩৮২, হিজরী শামসি, পৃ: ১৪০)

অর্থাৎ খাজা শামস্উদ্দিন মুহাম্মদ হাফিয শিরাযি সারাবিশ্ব ও ইরানের মাঝে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন গযল কাব্যের রচয়িতা ছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যিক এবং শরীয়ত, দর্শন, ও প্রকৃত অধ্যাত্মবাদের পন্ডিত ছিলেন। এ সকল স্বভাবগত অসাধারণ ক্ষমতার জন্যই তিনি তাঁর সুন্দর চিন্তাগুলোকে সুক্ষ্ম কবিসুলভ কল্পনায় নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর এই সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক দানকে (তাঁর জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে) খাঁটি সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা মনোহর বক্তব্য ও দক্ষতার সাথে তাঁর চিন্তা ও কল্পনায় একত্রিত

করে অতুলনীয় প্রেমগীতি রচনা করেছেন।

হাফিয প্রেমসুন্দর সত্যের চিরায়ত প্রবক্তা। তাঁর কবিতা আস্বাদন করার পর বিশ্বকবি গ্যাটে মন্তব্য করেন, হাফিয পড়ার আগে তাঁর প্রেম অনুভূতি লক্ষ্যার্থক ছিলোনা। অথচ হাফিয পৃথিবীর দুর্বোধ্যতম কবি। মোঘল শাসনামলে বাংলাদেশে ফারসি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিলো। তখন সকলেই শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজকার্যে সংশ্লিষ্টতার কারণে ফারসি ভাষা আয়ত্ত করতে হতো। সে কারণে হাফিয শিরাযিও বহু বছর ধরে এদেশের কাব্যরসিক, মরমী ও অধ্যাত্মসেবীদের কাছে অতিশয় প্রিয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) এবং কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) মন্দিরে হাফিযের কবিতা স্তোত্র সংগীত হিসেবে অনুমোদন করেছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক উভয়যুগেই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম বলে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আধুনিক যুগে গ্যাটে ছাড়াও একাধিক জার্মান কবি তাঁর কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ইকবাল কবি হাফিযের কাব্য প্রতিভার বিরূপ সমালোচনা করলেও তিনি কবির প্রাণ চাঞ্চল্যময় রচনারীতির কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মহান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে :

প্রথমত: তিনি ফারসি গযল রচনা শিল্পকে উন্নতির সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং গযল রচনার জন্য একপ্রকার প্রকাশ ভঙ্গি ও বর্ণনা রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন, যার নজীর মেলা অসম্ভব। বহুকাল ধরে অনেকে তাঁর সমকক্ষ গযল রচনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

দ্বিতীয়ত: তিনি ফারসি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও বর্ণনার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রকাশ ভঙ্গি উদ্ভাবন করেছেন। যার জন্য তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যে আক্ষরিক ও রূপক উভয়বিদ অর্থের সুষমাময় সমন্বয় ঘটেছে। কবি ফাগা'নি যখন পৃথক একটি নতুন প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করেন তখন তিনি বলেন "গযল শুধু প্রেমমূলক বিষয়াবলীর জন্য নির্দিষ্ট, এতে তাসাউফের গভীর তত্ত্বাবলী প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।" কিন্তু হাফিযের কবিতা এরূপ শ্রেণীকরণ হতে পবিত্র। বরং তিনি তাঁর কবিতায় সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্বোধিত করেছেন।

তৃতীয়ত: তাঁর মহান মর্যাদার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে তাঁর স্বতন্ত্র জীবনদর্শন। তাঁর রচনাবলী জীবনকে সংযমনীতি ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়, যদিও তিনি নৈরাশ্যবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তুর যে গভীরতা ও সুনিপুণ বর্ণনার সমন্বয় ঘটেছে, ফারসি কবিতায় এর নজীর পাওয়া যায় না। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : ২৫শ খন্ড : ১৯৯৬, পৃ: ২০৪) রাল্ফ ওয়ালডো ইমারসন তার সম্বন্ধে বলেছেন-

> "Hafiz is the prince of Persian poet and in his extraordinary gifts adds to some of the attributes of pinder Anacrcon,Horace and Burns the insight of a mystic, that sometimes affords a deeper glance at nature than belongs to either of these bards."

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ কথাটার অনুবাদ করেন এভাবে :

"হাফিয পারসী কবিগনের রাজা। তাঁহার অসাধারণ কাব্য প্রতিভার পিন্দার, আনাক্রিওন, হোরেস ও বরন্সের কতকগুলি গুণের সহিত একজন মরমিয়ার অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত ছিল। ইহা সময় সময় প্রকৃতির এমন গূঢ়তর ইঙ্গিত দান করে, যাহা এই সমস্ত কবির কাহারও আয়ত্ত হয় নাই।" (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

ইকবাল কবি হাফিযের কাব্য প্রতিভার বিরূপ সমালোচনা করলেও তিনি কবির প্রাণচাঞ্চল্যময় রচনারীতির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন :

> "তোমার কাব্য পেয়ালায় রয়েছে শিরাযের মদিরা"।

তবে হাফিযের প্রতি ইকবালের ভক্তি ও আসক্তি ফারসি ভাষা, পরিভাষা ,বর্ণনাভঙ্গি ও উপমা ইত্যাদি ব্যবহার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। ড. খলীফা আব্দুল হাকীম "ফেক্র ইকবাল"এ লিপিবদ্ধ করেন :

> "ইকবালের ফারসি গযল সমুহের বর্ণনাভঙ্গি এমন যে, তা যদি দিওয়ানে হাফিযে সংযোজন করে দেওয়া
>
> যায়, তবে পাঠকরা তা হাফিযের কালাম থেকে পৃথকই করতে পারবে না"।

ইকবাল হাফিয দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন। (দ্রষ্টব্য : নুরুদ্দীন[২৪] : ১৯৯৬, পৃ: ২৯৪)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইরানে গিয়ে হাফিযের মাজার অন্যান্য পূণ্যার্থীদের ন্যায় দর্শন করে কৃতার্থবোধ করেন। তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল শিরায নগরে তাঁর সমাধিস্থানে উপস্থিত হন । এর আগে তৎকালীন শিরাযের গভর্ণরের সাথে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয়। কবিগুরু যখন সমাধিস্থলে পৌঁছালেন তখন সমাধিরক্ষক একখানি বই আনলেন। সে গ্রন্থটি

ছিলো হাফিযের কাব্যগ্রন্থ। হাফিয সম্পর্কে সাধারণের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুঁজে এই গ্রন্থ খুললে যে কবিতাটি বের হবে তার থেকে ইচছা পূরণ হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইচ্ছা পোষণ করলেন ধর্ম নামধারী অন্ধতা থেকে যেন ভারতবর্ষ মুক্তি পায়। 'দিভা'ন-ই-হাফিয' এর পাতা খুলতেই ভবিষ্যৎ বাণীস্বরূপ যে গযলটি পাওয়া যায়, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'দোর তোদেরি খুলবে' শিরোনামে সে গযলটির অনুবাদ করেছেন এভাবে :

শরাবখানার দোরগুলি কি হায়! মোদেরি খুলবে ?

গেরো মোদের আট্‌কান কি সব কাজেরই খুলবে?

ধর্ম্মধ্বজী সাধুর তরে দোর কি বন্ধ,

ভরসা রাখিস্ খোদার তরে দোর তোদেরি খুল্‌বে।

বন্ধ দুয়ার পানশালার হায়! পছন্দ কে করবে–

ভন্ডামী আর ধোকার শুধু দোর ঘরেরি খুল্‌বে?

খাঁটি মদের মৃত্যু-শোকে চঙ্গেরি কেশ ছিন্ন,

পার্শী বালক দুঃখে অলক-দাম তাদেরি খুল্‌বে।

ভোগ- বিলাসী নেশা-খোরের দিল্ সাফাইয়ের জন্য

রুদ্ধ দুয়ার কুঞ্জিতে গো প্রাথর্নারি খুল্‌বে ।

আঙ্গুর- বালার শোক-গাথা এক লেখ, ওগো বন্ধু

রক্তেরই স্রোত চক্ষু হ'তে সব সখারি খুল্‌বে।

দেখবে হাফিয! কন্থাধারী ভন্ড কত কাল্‌কে

জোর করে লোক গোপন পৈতা সে সবারি খুল্‌বে। (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, পৃ: ২৩)

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর কবিতাগুলোতে হাফিযের প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবনের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ইরান সফর করেন এবং হাফিযের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মাযারে যান। একটি বইতে তাঁর এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ভঙ্গিতেও হাফিযের চিন্তাধারা প্রকট। বিশেষ করে প্রকৃতি প্রেম, প্রেম, ধর্মীয় শব্দাবলীর ব্যবহার, সংস্কার মানসিকতা প্রভৃতি বিষয়ে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হাফিয তাঁর দিভা'নে অসংখ্যবার 'উদ্যান', 'প্রান্তর', 'পর্বত- পাদদেশ', 'নার্গিস ফুল', 'টিউলিপ', 'ঝর্ণাধারা', 'পাহাড়', 'বেগুনি', 'বুলবুল', 'চির হরিৎ লতা' 'লালা ফুল', 'ফুল', 'স্রোতস্বিনী', 'শ্যামল', 'খড়ের স্তুপ', 'চাষাবাদ' প্রভৃতি বিষয়ে কথা বলেছেন। (খান[১৫] : ২০১২, পৃ: ৫৭) যেমন একটি গযলে হাফিয বলেন :

صحن بستان ذوقبخش و صحبت یاران خوشست

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوشست

از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود

آری آری طیب انفاس هواداران خوشست

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افگاران خوشست

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد بگوش

کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوشست

حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست

تا نپنداری که احوال جهانداران خوشست

(শিরাযি[৫২] : ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ২৫)

কাজী আকরম হোসেন এই সুন্দর গযলটির অনুবাদ করেছেন এভাবে :

সুখ জাগানো ফুল বাগানে সঙ্গ সখার বড়ই মধুর,

পুষ্প খুকী হউক সুখী, মসুম নেশার বড়ই মধুর ।

মলয় বায়ে পলে পলে প্রাণের নাসা হয় যে মিঠে,

বটে বটে খোশ্‌বু নিশাস আশ্‌না জনার বড়ই মধুর ।

না ফুটিতেই গোলাপ কলি পা বাড়াল যাত্রা পথে,

বুলবুলি গো জ্বলো তুমি জ্বলন ব্যথার বড়ই মধুর ।

কানে আমার আসে আওয়াজ কণ্ঠ হতে ফুলকুমারীর,

পুরাতনের এ বুৎখানাতে হাল্‌কা ব্যাভার বড়ই মধুর

ধরার লালচ ভোলা হাফিয রীতি জেনো সুখী মনের

ভেবো না ভাই দশা খানি ধরার রাজা বড়ই মধুর । (হোসেন[৭০] : ২০১২, পৃ: ৫৬)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুস সবুর খানের উদ্ধৃতিতে অন্যত্র হাফিয বলেন :

খুশি থাকুক শিরায আর তার অতুলনীয় সৌন্দর্য

খোদা রক্ষা করুন তোমার সৌর্ন্দযের বিলোপ

জাফরাবাদ আর মোসল্লা দিয়ে

তার উত্তরে সুগন্ধ মাখা বাতাস আসে

আমাদের রোকনাবাদ আর সাদ লওহাশাল্লাহ্ হয়ে

লালা ফুল যার সবুজ জীবন করে দান । (খান[১৫] : ২০১২, পৃ: ৫৮)

হাফিয যেমন তাঁর শিরাযের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় রচনা করেছেন অসংখ্য গান ও কবিতা। জোড়া সাঁকোর যে-বাড়িতে তার শৈশব কেটেছে সেটি ছিল বৃক্ষাচ্ছাদিত সবুজ বাগানে ঘেরা। অন্যদিকে শেষ জীবন কাটিয়েছেন শান্তি নিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত পরিবেশে। হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী, নদীতে পাল তোলা নৌকা, নদীর তীরের শুভ্র কাশফুল কবিকে আপ্লুত করতো। তাইতো তিনি গেয়েছেন :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্য করে এ পুষ্পিত কাননে

জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই । (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৫৮)

অন্যত্র বলেছেন :

সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই।

বায়ূ বহে হু হু করি পাতা কাঁপে ঝরঝরি,

স্রোতস্বিনী কুলকুল করিছে সদাই!

বিছায়ে শুকনো পাতা, বটমূলে রাখি মাথা,

দিন রাত্রি পারি সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।

বুকের ভিতর গিয়া কী যে উঠে উথলিয়া

বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি। (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৫৯)

রবীন্দ্রনাথের আগে ফারসি-জানা কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার দিওয়ান-ই-হাফিয অবলম্বনে "সদ্ভাবশতক" নামক একখানা কবিতার বই রচনা করেন। এ গ্রন্থটিতে হাফিযের কয়েকটি গযলের অনুবাদ রয়েছে। তিনি হাফিয সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

"পারসিক মহাকবি হাফিয প্রবর,

যাঁহার জনমে ধন্য শিরায নগর।

বিচিত্র বিচিত্র বাক্য-কুসুম তাঁহার,

নির্মল তত্ত্বরস অমিয়-আঁধার ।" (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হাফিযের কয়েকটি গযলের সুন্দর অনুবাদ করেছেন । এমনকি কবি মোহিতলাল মজুমদার হাফিযের "আগার অন তুর্কে শিরাযি"এ গযলটির অনুবাদের লোভ সামলাতে পারেন নি । কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচিও হাফিযের গযলের অনুবাদ করেছেন । "ওমর খৈয়ামের" রুবাঈয়াতের নিপুণ অনুবাদক কান্তি চন্দ্র ঘোষ হাফিযের রুবাঈয়্যাতের অনুবাদ করেছেন । কবি নরেন্দ্র দেব হাফিযের গযলের মুক্ত অনুবাদ প্রকাশ করেছেন । (শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) আরবেরি (আরবেরি[৭৫] : ১৯৫৮, পৃ: ৩৫৬) হাফিয সর্ম্পকে বলেন :

> "What are the seven poetic wonders of the world? Shakespeare's and Milton's works are certainly two of them.Dante's *Divine Comedy* and Goethe's *Faust* are in all probability two others.May I suggest that Jelaaleddin Mowlavi Rumi's *Masnavi* and Haafez's *Divan* (or collected lyrics) should receive serious consideration in this connection? True, the suggestion comes from one who happens to have the honour of being a compatriot of Rumi and Haafez, but this,let me hope ,will not give rise to a charge of Chauvinism, for no less a scholar-poet than Sir William Jones many decades ago expressed the opinion that Masnavi" was comparable in worth with Shakespeare' s works.After such a verdict it would follow almost automatically that the collected lyrics of Haafez, too, belong to the same exalted company."

অর্থাৎ পৃথিবীর ৭টি কাব্যিক বিস্ময়সমূহ কি কি? নিশ্চিতভাবে শেক্সপিয়র এবং মিল্টনের সাহিত্যকর্ম তাদের অন্তর্ভুক্ত । দান্তের "ডিভাইন কমেডি" এবং গ্যাটের "ফাউস্ট" এই দুটি কর্মও এগুলোর মধ্যে হয়ত থাকবে । আমার মতে জালালউদ্দীন মৌলভী রুমীর "মসনবী" এবং হাফিযের দিভা'ন (সংগৃহীত গযল) এগুলোর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার মতো । ঠিকই, এ কথাটি যে বলেছিলেন তিনি রুমি ও হাফিযের সঙ্গী হওয়ার মতো সম্মান অর্জন করেছিলেন, কিন্তু আমি আশা করি এটা তাঁর মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের রূপ নেয়নি, স্যার উইলিয়াম জোনস যিনি একজন পন্ডিত ছিলেন,অনেক দশক পূর্বে তিনি মতামত দেন যে, "মসনবী" উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্মের সমতুল্য । এই মতামতের পর বোঝা যায় হাফিযের সংগৃহীত গযলগুলো উন্নত সাহিত্যকর্মের সমতুল্য ।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্র (দ্রষ্টব্য : শহীদুল্লাহ্[৪৮] : তদেব, ভূমিকা) উদ্ধৃতিতে চার্লেস স্টুয়ার্ড হাফিয সর্ম্পকে বলেন–

> "হাফিয তাঁহার ধার্মিকতার জন্য উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন । তিনি অধিকাংশ সময় নির্জনে আল্লাহ্র আরাধনায় এবং ঐশি

> গুণাবলীর ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন । তাঁহার স্বদেশীয়গণ কর্তৃক তাঁহাকে অনুপ্রাণিত ও সাধুগণের শ্রেণীভুক্ত করা হয়
>
> এবং তাঁহার রচনা কেবলমাত্র কুরআনের নিম্নস্থানীয় মনে করিয়া গণককারদিগের দ্বারা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়" ।

মনীষী গ্যাটে তাঁর সম্বন্ধে আরও বলেছেন :

> "Sei das wort die Braut genannt
>
> Brauetigam der Geist,

Die Hochzeit hat gekannt,

Wer Hafizen priest."

অর্থাৎ: যদি ভাষা বধূ হয়

এবং ভাব বর হয়

বিয়ে সে-ই জেনেছে

যে হাফিযের আদর করেছে।

হাফিযকে বুঝতে হলে অধ্যাত্মবাদের জ্ঞান থাকা চাই– তা না হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। হাফিয যে সারা বিশ্বে নন্দিত হবেন একথা তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে ঘোষণা করে গেছেন । আবদুস সাত্তারের উদ্ধৃতিতে হাফিয বলেন :

"হাফিয মন্ত্রের মতো খ্যাতি সুদূরের ঐ মিসর-চীনে

কয় আর রোমে জানি, একই কথা বলবে সবাই তোমায় জিনে"

হাফিযের বক্তব্য সফল হয়েছে । শুধু মিসর, চীন, কয় এবং রোম নয় সারা বিশ্বে হাফিয আজ নন্দিত। (সাত্তার[৫৩] : ১৯৮৭, পৃ: ৬৪)

১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান কবি গ্যাটে হাফিযের দিওয়ান কাব্য পাঠ করে মন্তব্য করেন ঃ "হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানী খুশবু এবং ইরানের পথ প্রান্তর থেকে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণ সঞ্জীবনী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক অলৌকিক ব্যক্তিকে চিনতে পারলাম, যাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-দর্শন আমাকে তাঁর জন্য পাগল করেছে"। পরবর্তী কালে কবি গ্যাটে হাফিযের আধ্যত্মিক প্রেমদর্শনের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ৭০ বছর বয়সে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। (নিউজ লেটার[৩২] : ২০১২, পৃ: ৭) নিঃসন্দেহে হাফিয হলেন ফারসি সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দীপ্যমান নক্ষত্র। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আজ পর্যন্ত আর কোন কবিই হাফিযের মতো আমাদের জাতির মন ও মস্তিষ্কের এতো গভীরে ও রন্ধ্রে প্রবেশ করেন নি। তিনি সকল যুগ ও শতাব্দীর কবি। আল্লাহ্‌র তাজাল্লিতে বিগলিত আ'রেফদের থেকে নিয়ে রুচিশীল কবি ও সাহিত্যিক, নাঙ্গা পা ও খোলা মাথার উদ্ভ্রান্ত যোগী ও সর্বস্তরের সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই হাফিযের মধ্যে আপন মনের কথা খুঁজে পেয়েছে। সবাই হাফিযের ভাষাতেই নিজের অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরে। তিনি এমন একজন কবি, যাঁর কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক প্রকাশিত ও বিক্রিত গ্রন্থ। (নিউজ লেটার[৩১] : ২০১০, পৃষ্ঠা-৭)আধুনিক ভারতের জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে "তোহফাতুল মুওয়াহ্‌হেদীন (একেশ্বরবাদীদেরকে প্রদত্ত উপহার) নামে ফারসিতে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। কবি হাফিযের একটি কবিতার দুটি চরণ উদ্ধৃত করে রাজা তাঁর সেই গ্রন্থের ইতি টেনেছিলেন :

مباش در پی آزار وهرچه خواهی کن

که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

মৎকৃত অনুবাদ: আর যাই করো কাউকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করো না।

আমাদের ধর্মে এর মতো পাপ আর নেই। (নিউজ লেটার[৩২] : তদেব, পৃ: ৮)

বাংলাভাষায় "দিভা'নে হাফিয" গ্রন্থটি বেশ কয়েকজন অনুবাদ করেছেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দক্ষিন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ । এ পর্যন্ত এ-গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর "দিভা'নে হাফিয" অনুবাদ প্রকাশ করেন কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬২) । ১৯৬১ সালে ঢাকার ৫১ নং হোসনী দালাল রোড থেকে

"আজাদ প্রকাশনী" বইটি প্রকাশ করে। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবর কবি জসীম উদ্দীনের এক মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, কাজী আকরম হোসেন দশ বছর পূর্বে "দিভা'নে হাফিয" অনুবাদের কাজ শেষ করেন। কিন্তু সেটি মুদ্রণের জন্য কোনো প্রকাশক পাওয়া যায়নি। এক সন্ধ্যায় তিনি কবি জসীম উদ্দীনসহ তাঁর ঘরে আসেন এবং হাফিযের একটি গযল তাঁকে (কবি জসীম উদ্দীনকে) পাঠ করে শোনান। তখন কবি জসীম উদ্দীন অনুভব করলেন ইরানের এমন এক বাগানে তিনি প্রবেশ করেছেন যেখানে বুলবুলিরা গান গাইছিল এবং গোলাপরা রূপকথার সুন্দরী মহিলাদের সৌন্দর্য ও সৌরভ ছড়াচ্ছিল। সম্প্রতি দুজন আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাফিযের কাব্য অনুবাদ করেছেন। এছাড়া বাংলা সাময়িকী সমূহে হাফিযের আরও কয়েকজন অনুবাদক খুঁজে পাওয়া গেছে। তাঁরা হচ্ছেন– দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহ্মদ, চন্ডীচরণ মিত্র, ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ ইসহাক, ইয়াসিন উদ্দীন আহমদ এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। (শাহেদী[৪৯] : তদেব, পৃ: ৪৬)

এছাড়া বাংলা ভাষা ছাড়াও "দিভা'নে হাফিয" দুইটি জার্মান অনুবাদ ও একটি ইংরেজী অনুবাদ রয়েছে। দুটি জার্মান অনুবাদের একটি হচ্ছে Joseph Von Hammer-Porgstall-কৃত অনুবাদ (দুই খন্ডে সমাপ্ত, ১৮১২-১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ) এবং অন্যটি হচ্ছে Vincent Ritter Von Rosenzweig-Schwannau-কৃত অনুবাদ (তিন খন্ডে সমাপ্ত, ভিয়েনা ১৮৫৮-১৮৬৪খ্রিষ্টাব্দ) আর ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে Wilberforce Clarke-কৃত অনুবাদ। এই গ্রন্থটিতে প্রয়োজনীয় টীকাসমূহও সংযোজিত রয়েছে (তিন খন্ডে সমাপ্ত, কলকাতা ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তাছাড়া মীর ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ রচিত "দিভা'নে হাফিয" উর্দূ ভাষ্যগ্রন্থ "লিসানুল-গা'য়ব" অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ[৬] : তদেব, পৃ: ২০৩) হাফিয শুধু এ যুগেই নয় তাঁর সমসাময়িক যুগেও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । বলা যায় ছাত্র অবস্থা থেকেই তাঁর যথেষ্ট কদর ও মূল্য ছিল। তিনি যে কত বড় মাপের একজন আধ্যত্মিক কবি ছিলেন তার প্রমাণ ড. জিয়াউদ্দিন সাজা'দির বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন :

> "হাফিযের শিক্ষক সবসময় তাঁর মজলিসে কবিতা পাঠ করতেন এবং বলতেন এসব ফালতু কথা বাদ দিয়ে দর্শন ও প্রজ্ঞার কথা বল। যখন হাফিয প্রবেশ করতেন, বলতেন হে হাফিয, তোমার উপর কি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে? তোমার গযল পাঠ কর। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করে বলত আপনি কেন আমাদের কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করলেন এবং হাফিয আসা পর্যন্ত তাঁর কবিতার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেন? সাইয়্যেদ উত্তরে বললেন– ঐ কবিতাগুলো আমাদের জন্য প্রত্যাদিষ্ট এবং হাফিযের কবিতা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্র বক্তব্য এবং খাঁটি কোরআনের উক্তি।" (সাজা'দি[৬২] : ১৩৭২ হিজরী শামসি, পৃ: ২০২)

একটা কথা বলা যায় যে, কবি সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেশিরভাগই প্রকৃতিকে ভালবাসে। কিন্তু হাফিয শিরাযি ও রবীন্দ্রনাথের মতো আধ্যাত্মিক পুরুষদের প্রকৃতি-প্রেম সাধারণ মানুষের প্রকৃতি-প্রেম থেকে আলাদা। সাধারণ মানুষ প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। আর কবিগণ বিশেষ করে হাফিয, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ, রস ও সৌন্দর্যের

ভিতর দিয়ে স্রষ্টার সৌন্দর্য অনুসন্ধান করেন। আর তাই আবদুস সবুর খানের উদ্ধৃতিতে হাফিয যখন বলেন :

> "ভোরের বেলায় গেলাম বাগে, একটি কুসুম করতে চরণ,
> কানে এলো হঠাৎ ভেসে বুলবুলির এক করুণ কাঁদন।
> আমার মতোন বুলবুলও ভালবেসে ফুলকুমারী

গুল বাগিচার শাখে শাখে কেঁদে বেড়ায়, হায় বেচারী!" (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৫৯)

বা অন্যত্র যখন বলেন-

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته بموی است هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ی ارم

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست هر دو چو از یک قبیلهاند

ما دل بعشوه ی که دهیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

ای مدعینزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار

معنی عفو و رحمت پروردگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته ی کردگار چیست

(শিরাযি[৫২] : গযল নং- ৫৮, ১৩৬৬ হিজরী শামসি, পৃ: ২৯)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এই গযলটির চমৎকার কাব্যানুবাদ করেছেন এভাবে :

বাগান বসন্ত (বন্ধু) সঙ্গ অপেক্ষা আরামপ্রদ আর কি?

সাকী কোথায়? বল অপেক্ষার কি কারণ?

আ'ব-ই-হায়াত (জীবন-জল) ও বেহেস্তের বাগান

ঝরনার তীর এবং সুন্দর গন্ধী শরাব ব্যতিরেকে আর কি?

আনন্দিত মুহূর্ত যাহা তোমার হস্তগত হয়, লাভ বলিয়া মনে কর

কাহারও জ্ঞান নাই কাজের সমাধা কি হইবে।

জীবনের বন্ধন সামান্য সূত্রে আবদ্ধ, সাবধান হও,

আপনার দুঃখ আপনি হজম কর, কালের দুঃখ কি?

পর্দার অন্তরালের রহস্য প্রম ও রসোন্মাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর,

হে মুদ্দই (দুষমন) পর্দা রক্ষাকারীদের সঙ্গে তোমার কি ঝগড়া?

সাধু ও মাতাল একই পরিবার হইতে উদ্ভূত,

তখন কাহার ছলা কলায় আমার হৃদয় অর্পণ করিব?

বান্দার ভুল ও ভ্রান্তি যদি বিশ্বাস কর

তবে আল্লাহ্‌র মার্জনা ও দয়ার অর্থ কি?

সাধু ব্যক্তি কওসর (স্বর্গের শরাব) এবং হাফিয শরাবের পেয়ালা

প্রার্থী, এই দুইয়ের মধ্যে স্রষ্টার মনোনয়ন কোনটায় রহিয়াছে।

(মনসুরউদ্দীন[৪১] : ১৩৭৫ বাংলা, পৃ: ৫১৯)

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কবিতায় বলেন :

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ

ভুবনে ভুবনে রাজে হে।

কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে

আকাশে সাগরে সাজে হে।

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়

অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,

পল্লবদলে শ্রাবণ ধারায়

তোমারি বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়

তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,

কত প্রেমে হায় কত বাসনায়

কতসুখে দুঃখে কাজে হে ।

সকল জীবন উদাস করিয়া

কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া

তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া

আমার হিয়ার মাঝে হে। (খান[১৫] : তদেব, পৃ: ৬০)

ইরানের অনেক আধুনিক কবিই হাফিযের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত কবি হলেন মুহাম্মদ হোসাইন শাহ্‌রিয়ার। হাফিয সর্ম্পকে তাঁর একটি বিখ্যাত মন্তব্য ছিল 'هرچه دارم از دولت حافظ دارم' অর্থাৎ যা কিছু অর্জন করেছি হাফিযের সম্পদ থেকে অর্জন করেছি। তাই শাহ্‌রিয়ারের কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। শাহ্‌রিয়ার হাফিযের গযলকে جويبار خلد، نواى جاويدان، نغمه اى قدوس، سحر، خم مى، سرود ملاء اعلى প্রভৃতি নামকরণ করেছেন। দিভা'নে শাহ্‌রিয়ারের বহু জায়গায় হাফিযের প্রশংসায় লেখা কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। শাহ্‌রিয়ারের মতে হাফিয শিরাযি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি তাঁর ভাষায়– 'এই জগতে আর কোথাও হাফিযের মতো কবি খুঁজে পাওয়া যাবে না'। তিনি হাফিযকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আ'রেফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ হাফিয যা কিছু করেছেন কোরআনের ভিত্তিতে করেছেন। কবি হাফিয সম্পর্কে তিনি আরও বলেন– 'হাফিযের পর জামি ছাড়া অন্য কাউকে কবি হিসেবে মনে করি না'। শুধুমাত্র হাফিযের প্রতি শাহ্‌রিয়ারের গভীর ভালবাসা থাকার কারণে তিনি হাফিয দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । শাহ্‌রিয়ার নিজেকে দ্বিতীয় হাফিয বলে বিশ্বাস করতেন। মোহাম্মদ আহসানুল হাদীর উদ্ধৃতিতে শাহরিয়ার বলেছেন :

شهريار را چه آورد تو بود از شيراز

كه جهان هنرت حافظ ثانى دانست

"ওহে শাহ্‌রিয়ার তুমি শিরায থেকে কি পাথেয় নিয়ে এসেছিলে,

জগৎ তোমার শিল্পকে দ্বিতীয় হাফিয হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।" (হাদী[৭৪] : ২০১৫, পৃ: ১৩১)

শাহ্‌রিয়ার হাফিযকে একজন যোগ্য পীর বা মোর্শেদ হিসেবে জানতেন এবং তাকে خود الگوى، مرشد، پير، مسيحايى، مقتدار প্রভৃতি নামে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"হাফিয তুমি এই পবিত্র সঙ্গীতের মসিহ,

গির্জাগুলোতে সুর-ছন্দে এগুলো পড়া উচিত।"(হাদী[৭৪] : তদেব, পৃ: ১৩২)

শাহরিয়ার নিজেকে হাফিযের মুরিদ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে জীবনকে গঠনের চেষ্টা করে গেছেন। নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলোকে কাব্যে তুলে ধরেছেন, তিনি নিজেকে হাফিযের গোলাম ভাবতেন। তিনি বলতেন :

"শাহ্‌রিয়ার ও তাঁর হৃদয় ও কলমের রাজ্যে,

খাজা শিরাযির গোলামে পরিণত হয়ে গেছে।" (হাদী[৭৪] : তদেব, পৃ: ১৩৩)

হাফিযের সুমধুর গযলগুলোতে অধ্যাত্মবাদের প্রকৃত শিক্ষা নিহিত রয়েছে। শাহরিয়ারের মতে :

"সে সময়ে খা'জা তাঁর অবিনশ্বর সুর দ্বারা আমাদের ধন্য করলেন,

আর তা ছিল আধ্যাত্মিক বাদ্যযন্ত্রে তাওহীদের সংগীত পরিবেশন।

হাফিযের সিংহাসনে শাহরিয়ার নিঃস্ব,

ইরানীদের অবক্ষয় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে॥"(হাদী[৭৪] : পৃ: ১৩৪)

খোদাকে জানার সর্বোত্তম রাস্তা হলো হাফিযের কবিতা। শাহ্‌রিয়ার বলেন

شعر حافظ همه دیباچه ای دیوان خداست

هر که این گل طلبد سعی گلندام کند

شهریار انکند درس بدیع استاد

آن چه شعر تو به تشبیه و به ایهام کند

হাফিযের কবিতা পুরোটাই খোদার কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা

যারা এই ফুলকে খোঁজ করতে চায় তাদের গোলান্দামের মত চেষ্টা করা উচিত।

হাফিয কখনোই এলমে বাদি' এর শিক্ষক হতে পারতো না,

যদি না তোমার কবিতায় এই ঈহাম ও তাশবীহ্‌ থাকতো। (হাদী[৭৪] : তদেব, পৃ: ১৩৪)

হাফিয ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী একজন কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কোন সারির কবি সে-সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকরা আলোচনা করেছেন। কোন কোন সমালোচকের মতে, তিনি পারস্যের কবিকুলের প্রথম সারির কবি। বিদগ্ধ সমালোচক

মির্জা মুহাম্মদ কাজভিনির মতে ফেরদৌসী, খৈয়াম, আনওয়ারী, রুমি, সাদি এবং হাফিয ফারসি সাহিত্যের প্রথম সারির কবি।এদের সাথে নাসির খসরুর নামও সংযোজন করা যায়। তবে হাফিয ছাড়া অন্যান্য কবির সাহিত্যকর্মের সাথে নাসির খসরুর সাহিত্যকর্ম সমতার দাবীদার। মির্জা মুহাম্মদ কাজভিনিকে তাঁর এক কাব্য বিদগ্ধ সমালোচক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কোন বিদেশী রাষ্ট্র, ধরুন ইংল্যান্ড প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবির মর্মর মূর্তি হাইড পার্কে স্থাপন করার জন্য আমাদের উপর কবির নাম নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন, তবে উল্লেখিত ছয় জনের মধ্যে আপনি কার নাম বলবেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন "সমস্ত কবির কাব্যকর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে একটা নামই সূর্যের মতো ভাস্কর হয়ে উঠে, সে নামটা হলো শামসুদ্দিন হাফিয" । (হাফিজ[৬৪] : তদেব,পৃ: ১৪)

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অধ্যাত্মবাদের কবি, সাম্যবাদের কবি, প্রেমের কবি, ইসলামের কবি আবার কখনো বিদ্রোহের কবি । তিনি হাফিযের এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, ৭৩ টি রুবাঈ (চতুষ্পদী কবিতা) ফারসি থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছেন । তিনি যেদিন অনুবাদ শেষ করেন সেদিন তাঁর পুত্র বুলবুল মারা যান । কবি তাই বেদনার সাথে বলেছিলেন "আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাযের বুলবুল কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি । ইরানের কবি সম্রাট হাফিয বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি কিন্তু আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারতেন না " । (নিউজ লেটার[৩৩] : ২০১৫, পৃ: ৪০) তাঁর কাব্য সাধনার ফসল প্রায় চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ছন্দবদ্ধ পংক্তি, চারশত থেকে পাঁচশত গীতি-কবিতা, কিছু শোকগাঁথা ও কিছু দ্বিপদী কবিতা । এই মহান কবির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এত বেশি যে, প্রায় প্রতি ঘরেই দিভা'ন খুঁজে পাওয়া যায় । ফারসি সাহিত্যে হাফিযের কবিতার মতো অন্য কারো কবিতা মানুষের মাঝে এতো আর্কষণ সৃষ্টি করে নি । তাঁর সাহিত্যিক সৌন্দর্যের স্বাতন্ত্র্য, ব্যাখ্যার চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনা অতি উচ্চমানের ও সাবলীল । যারা সঠিকভাবে হাফিযকে অনুধাবন করতে পেরেছেন তারাই কেবল তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে সত্যিকারের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করতে পেরেছেন । যদিও তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই মানুষের বোধগম্যের অতীত । কারণ হাফিয খোদায়ী অনুপ্রেরণা থেকে তাঁর দিভা'ন রচনা করেন । হাফিয তাঁর বাগ্মিতা ও অর্থপূর্ণ গীতি-কবিতার আকারে পৃথিবীর সর্বোত্তম সাহিত্য ও সুফিতত্ত্ব উপস্থাপন করে গেছেন । তাঁর চমৎকার কবিতাসমূহ তাঁর কালে প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে লেখা হয় নি, তারপরেও তা ফারসি সাহিত্যের ভান্ডারে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত । তিনি তার কবিতায় রূপক, রূপকালংকার, নীতিবাদী রূপক কাহিনী ও অন্যান্য উপমার চমৎকার ব্যবহার করেছেন,যা তাঁর আগে ও পরে কখনও হয় নি । মহাকবি হাফিয সর্ম্পকে ব্রাউন (ব্রাউন[৭৯] : ১৯২৯, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩০২) বলেন :

"This authorized version" of the the *Diwan* of Hafiz (which could probably be much improved by a fresh and careful collation of all the best and oldest manuscripts) contains in all 693 separate poems; to wit, 573 odes (*ghazaliyyat*); 42 fragments (*muqattaat*); 69 Quatrains (*rubaiyyat*) ; 6 *mathnawis* ; 2 *qasidas* , and one five some" or *mukhammas*. Of all these poems German verse translation are given by Rosenzweig-Schwannau and English prose translations by Wilberforce Clarke. There exist also many translations of individual odes or groups of odes in English, German, Latin, French etc.either in verse or prose. Of English verse translations the largest and most sumptuous collection is that of Herman Bicknell, who was born in 1830."

অর্থাৎ:"দিভা'ন-ই-হাফিয" এই অনুমোদিত সংস্করণে (এটি একটি উন্নত, অভিনব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জাগরুক প্রাচীনতম পান্ডুলিপি) ৬৯৩টি স্বতন্ত্র কবিতা রয়েছে । যেগুলোর মধ্যে ৫৭৩টি গীতি কবিতা, ৪২টি মুকাতাত, ৬৯টি রুবাঈয়্যাত, ৬টি দ্বিপদী কবিতা, ২টি কাসিদা এবং একের অধিক মুখাম্মা রয়েছে । এই সকল কবিতাসমূহ জার্মান ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করেছেন রোউসেন্স উয়াইগ শোয়ানাউ এবং ইংরেজী ভাষায় গদ্যাকারে অনুবাদ করেছেন উইলবার ফোর্স ক্লার্ক । এছাড়াও আরও অনেক প্রকারের স্বতন্ত্র অথবা

শ্রেণীবদ্ধ অনুবাদ ইংরেজী, জার্মান, ল্যাটিন এবং ফরাসি ভাষায় গদ্যাকারে অথবা পদ্যাকারে রয়েছে । ইংরেজী ভাষায় সর্ববৃহৎ এবং অতীব ব্যয়বহুল কাব্যিক অনুবাদ করেন হারম্যান বিকনল (জন্ম ১৮৩০ খ্রি:) ।

শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি কে? এটি এমন এক বির্তক, এ পর্যন্ত যার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি । সম্ভবতঃ এরপরেও তা জবাববিহীন থেকে যাবে । কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যাবে যে, হাফিযের বক্তব্যের ঔৎকর্ষ অর্থাৎ হাফিযের কথায় যে-উচ্চতা রয়েছে, অন্য কোনো

Dhaka University Institutional Repository

বক্তাই সে-স্তরে পৌঁছাতে পারেন নি। এমন নয় যে, কাব্য ও গীতি কবিতার সকল শাখায় হাফিযের কবিতার ঔৎকর্ষ অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চতায় রয়েছে বরং এ অর্থে যে, এ অমূল্য কথামালার মধ্যে কিছু বক্তব্যের ঔৎকর্ষ এতখানি, অন্যদের রচনায় তার সাদৃশ্য দেখা যায় না। এ কথা অনাসায়েই বলা যায় যে, হাফিয হলেন একজন মহাকবি এবং ফারসি কাব্যের দু'জন শ্রেষ্ঠ গযল গায়কের অন্যতম। অপরজন হলেন শেখ সাদি। ফারসি ভাষায় প্রেমসিক্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারার সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম গযল-গীতি হাফিযেরই সৃষ্টি। রূপক কাহিনী নির্মাণে হাফিযের প্রতিভা বিস্ময়কর। হাফিয হলেন একজন শিল্পী ও দূরদর্শী মুসলমানের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তিনি তাঁর জীবনের এই প্রতিচ্ছবিকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম পন্থায় শিল্পকীর্তিতে চিত্রিত করেছেন। এ কারণেই তাঁর দিভা'ন 'দিলনামা','রুহ্নামা', 'অর্ন্তজগত' ও 'বিশ্ব দর্শনের আয়না' প্রভৃতি নামে অভিহিত ও সমাদৃত। এক কথায় হাফিয আমাদের মানসপট।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ফারসি এবং সেই ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কবি হাফিয শিরাযি। পারস্য থেকে শুরু করে তাঁর নাম-যশ-খ্যতি ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে। শৈশবে পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করে 'হাফিয' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই কোরআনের বাণী আজীবন ধারণ করে রেখেছিলেন অন্তরে। প্রাণের মাধুর্য আর মনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন চারপাশের সবকিছু এবং স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টিকে। তাই শৈশব-কৈশোরের অর্থকষ্ট-দুর্দশাকে জয় করে প্রচার করে গেছেন তাঁর মর্ম-নিকষিত জীবনের বাণী। তাঁর *দি'ভান* নামক ঝর্ণাধারা থেকে উৎসারিত অফুরন্ত ধারার প্রবহমানতা আজও রুদ্ধ হয় নি। গযল-গীতি, রুবাঈ এইসব বিভিন্ন আঙ্গিকে বস্তুত এক অনন্ত প্রেমের বাণী হাফিয ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে-দিগন্তে।

হাফিযের কাব্য বহুমাত্রিক। তাঁর অধ্যাত্ম প্রেমময় এবং তাঁর প্রেম অধ্যাত্মময়– একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা দুরূহ। জগতের নানা বিষয় নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন– কিন্তু এক পরম লক্ষ্য বা অভিমুখের অন্বেষায় ছিলেন অবিচল। ব্যক্তিপ্রেম এবং সমষ্টির প্রেম দুইয়ের বাণী প্রচারেই তিনি তুলনাহীন। আসলে মানবের প্রেম তাঁর গযল-কাব্য এসবের মূল সুর আর সেই মানব উৎস অর্থাৎ শেকড়শূন্য নয়। এক অমোঘ অস্তিত্বের সর্ববিরাজিত মহিমাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর কাব্যে।

মানুষের সত্তার, জীবনের নানা পরিস্থিতি ও অবস্থার বিবরণ তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আনন্দে-সংকটে, দু:খে-আশায়, হতাশায়-চেতনায় হাফিয তাই সর্বদা সেই শেকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে লগ্ন ছিলেন। তাঁর সেই শক্তি ও সুষমার বন্দনা গেয়েছেন তাঁর গুণমুগ্ধ বিশ্বের বরেণ্য কবিগণ। মহাকবি গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁর কাব্যের অপরিসীম সৌকর্যের প্রশংসা করেছেন। হাফিয তাঁর কাব্যে যে-প্রেম যে-অধ্যাত্মজগতের ছবি এঁকেছেন তা নির্মল-পরিশুদ্ধ এক অতীন্দ্রিয় জগত। বাস্তবের উপাদানে সেসব আমরা উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু তাঁর কাব্যের অতল রহস্যময়তার সম্পূর্ণ আবিষ্কার দু:সাধ্য কর্ম। মরমী-সুফিবাদী-প্রেমিক-সমালোচক-ব্যঙ্গশিল্পী-স্রষ্টাভক্ত ইত্যাদি বহু কুশলতার কারিগর হাফিযের অধ্যাত্ম-প্রেমিক সত্তা তাঁর কাব্যচেতনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণ মানুষ যেভাবে বাস্তবকে দেখে থাকে, তাদের দেখার চাইতে কবি হাফিয শিরাযির পর্যবেক্ষণ-অবলোকন ভিন্নধর্মী। সেই পর্যবেক্ষণে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকে এমন এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা যা কবি হাফিযের ন্যায় মহাত্মা ও উচ্চ স্তরের রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব।

কবি হাফিয শিরাযির অধ্যাত্মপ্রেম এমনই এক অনুভূতির প্রকাশ যা কেবল ইরান বা মুসলমানদের জন্যে নয়, জগতের সকল সৃষ্টি ও মানবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই তাঁর অনুপম সৌন্দর্যের বাণীবহ কাব্যের গুণমুগ্ধ ভক্ত। হাফিয শিরাযির কাব্য শত-শত বছর ধরে মানুষের আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পেরেছে এর অধ্যাত্মপ্রেমের বিশেষ নান্দনিকতার কারণে। হাফিযের কাব্য আমাদের এমন এক পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করে যেখানে অভাব-জ্বালা-যন্ত্রণা দৈনন্দিন জীবনের এইসব বিষয়কে আমরা তুচ্ছ ভেবে এক পরমারাধ্য জীবনাতিরেকের স্বপ্ন আঁকবার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাই।

গ্রন্থপঞ্জি : সহায়কগ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা, বিশ্বকোষ

১. আলম, ড. রশীদুল, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ারপ্রকাশন, ২০১২খ্রি:।

২. আহ্মাদ, মোস্তাক, *দিওয়ান-ই-হাফিজ*, ঢাকা : রোদেলাপ্রকাশনী, ২০১৪খ্রি:।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামীবিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা :ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ১৯৮৮খ্রিঃ ।

৪. ইসলামীবিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড, ঢাকা :ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ১৯৯১খ্রিঃ ।

৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, *নজরুলরচনাবলী*, ২য় খন্ড, ঢাকা :বাংলাএকাডেমী, ১৯৯৩খ্রিঃ ।

৬. ইসলামীবিশ্বকোষ, ২৫শ খন্ড, ঢাকা :ইসলামিক ফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ১৯৯৬খ্রিঃ ।

৭. ইসলাম, ড. আমিনুল, *ইসলামধর্ম ও মুসলিম দর্শন*, ঢাকা :উত্তরণপ্রকাশ, ২০০৪খ্রিঃ ।

৮. ইসলাম, ড. আমিনুল, *মুসলিমধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা :মাওলাব্রাদার্স, ২০১৩খ্রিঃ ।

৯. ইকবাল, আবু, *পারস্য সভ্যতা*, ঢাকা :সমতট, ২০১৫খ্রিঃ ।

১০. করিম, ড. আবদুল, *সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ*, ঢাকা :নওরোজকিতাবিস্তান, ১৯৬৯খ্রিঃ ।

১১. কলিমউল্লাহ, ড. নাজমুলআহসান, জালালউদ্দীন, ড. এ. কে. এমরিয়াজুলহাসান, *সুফিদর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গে*, ঢাকা :আহমদ পাবলিশিংহাউস, ২০১৩খ্রিঃ ।

১২. করাচী, মুফতীমাহমূদ আশরাফউসমানী, মালেক, মাওলানামুহাম্মদ আবদুল, অনুবাদ- মাওলানামুতীউররহমান,*তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*,ঢাকা :মুত্তাহিদাপ্রিন্টার্স, ১৪২৮ হিজরী

১৩. খলিলউল্লাহ, এস.,*সুফিবাদ পরিচিতি*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩খ্রিঃ ।

১৪. খান, এ. এইচ. এম. আবদুসসামাদ, *সূফিমতবাদঃমূলকথা, ইহারইতিহাসএবংইসলাম*, ঢাকা :জামানপ্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং, ২০১০খ্রিঃ ।

১৫. খান, আবদুসসবুর, *রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজ*, ঢাকা :মূর্ধন্য গ্রাফিক্স, ২০১২খ্রিঃ ।

১৬. খলিল, ড. মোঃইব্রাহীম, *সূফীবাদ এবংপ্রধানপ্রধানসূফী ও তাঁদের অবদান*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ারপ্রকাশন, ২০১৩খ্রিঃ ।

১৭. গায্যালী (রঃ), মহাত্মাইমামগাযযালী, *কিমিয়ায়েসা'আদত*, অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুররহমানজাহেরী, ঢাকা : সোলায়মানিয়াবুকহাউজ, ২০০৯খ্রিঃ ।

১৮. চিশ্তী, সাজ্জাদ হোসেনরনি, *সূফীবাদের মর্মবাণী*, ফরিদপুর : ওসমানকম্পিউটারওয়ার্ল্ড, ২০০৯খ্রিঃ ।

১৯. চিশ্তী (রঃ), হজরতখাজামুঈনুদ্দিনচিশ্তী, অনুবাদ, সম্পাদনা ও টীকাভাষ্য- জেহাদুলইসলাম ও ড. সাইফুলইসলামখান, *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন*, ঢাকা : সদও প্রকাশনী, ২০১১খ্রিঃ ।

২০. জওহর, সুফি মৌলানা মোবারককরীম, *পারস্য সাহিত্য সম্ভার*, কলকাতা : নবপত্রপ্রকাশন, ২০১৩খ্রিঃ ।

২১. তামীমদারী, ড. আহ্মাদ, অনুবাদ- তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী, *ফার্সী সাহিত্যেও ইতিহাস*, ঢাকা :আলহুদাআর্ন্তজাতিকপ্রকাশনাসংস্থা, ২০০৭খ্রিঃ ।

২২. তাহেরি, পারভা'নে, *সেতা'রগা'নআ'সমা'নআদবইরান*, ইরান :চা'পখা'নে রেফা', ১৩৪২ হিজরীশামসি

Dhaka University Institutional Repository

২৩. দা'দ, সিমা, *ফারহাঙ্গে এসতেলা'হা'তেআদাবি*, ইরান : চা'প গুলশান, ১৩৮২ হিজরীশামসি

২৪. নুরদ্দীন, ড. আবুসাঈদ, *মহাকবিইকবাল*, ঢাকা : আল্লামাইকবাল সংসদ, ১৯৯৬খ্রিঃ।

২৫. নকশবন্দী (রহঃ), আল্লামাআবদুর রাহীম, আল-জাওযিয়াহ (রহঃ), আল্লামাইবনেকাইয়িম, অনুবাদ ও সম্পাদনায়-মাওলানামুহাম্মদ আবদুররহমান খন্দকার, *এলমেতাসাউফ ও মা'রেফাতের গোপনরহস্য বাসূফিতত্ত্বের মূলকথা*, ঢাকা : সোলেমানিয়াবুকহাউস, ২০০৯খ্রিঃ।

২৬. নূরী, অধ্যাপকআবদুলালেক,*সুফীবাদ*,ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৩খ্রিঃ।

২৭. নিউজলেটার, ২৪ তম বর্ষ : ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলর দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, মে-জুন ২০০২খ্রিঃ।

২৮. নিউজলেটার, ২৫তম বর্ষ : ৯ম-১০ম সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৩খ্রিঃ।

২৯. নিউজলেটার, ২৭তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৫খ্রিঃ।

৩০. নিউজলেটার, ৩১তম বর্ষ : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, জুলাই-অক্টোবর ২০০৯খ্রিঃ।

৩১. নিউজলেটার, ৩২তম বর্ষ : ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, জুলাই-অক্টোবর ২০১০খ্রিঃ।

৩২. নিউজলেটার, ৩৪তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২খ্রিঃ।

৩৩. নিউজলেটার, ৩৭তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, জুলাই-আগস্ট ২০১৫খ্রিঃ।

৩৪.পাল, শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র, *পারস্য সাহিত্যেও ইতিহাস*, কলকাতা : ১৩৬০ বাংলা।

৩৫. বরকতুল্লাহ্, মোহাম্মদ, *পারস্য প্রতিভা*, ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র,২০০০খ্রিঃ।

৩৬. বারী, মুহম্মদ আবদুল, *মুসলিম দর্শনধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : হাসানবুকহাউস, ২০০৮খ্রিঃ।

৩৭. বাংলাপিডিয়া, অষ্টম খন্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১খ্রিঃ।

৩৮. ভিক্ষু, ড. জিনবোধি, সূফীদর্শনে নৈতিকতা : সুফিবাদ ও বিশ্বশান্তি, বাংলাদেশ দর্শনপত্রিকা, খন্ড : ৮,চট্টগ্রাম : দি খতিয়ানপ্রিন্টার্স, ২০০৮খ্রিঃ।

৩৯. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *হাফিজেরকবিতা*, কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেটলিমিটেড, ১৯৮৪খ্রিঃ।

৪০. মোতাহ্হারী, শহীদ আয়াতুল্লাহ্মূর্তাজা, *হাফিযেরআধ্যাত্মিক দর্শন ওহাফিযসম্পর্কে রাহবারসাইয়্যেদ আলী খোমেনী'রঐতিহাসিকভাষণ*, অনুবাদ- মোহাম্মদ আব্দুলকুদ্দুসবাদশা, ঢাকা :কালচারালকাউন্সেলরের দফতর, ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০১২খ্রিঃ।

৪১. মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ, *ইরানেরকবি*, ঢাকা : বাংলাএকাডেমী, ১৩৭৫ বাংলা

৪২. রশিদ, ফকিরআব্দুর, *সূফী দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ১৯৮৪খ্রিঃ।

৪৩. রুমী, মওলানাজালালউদ্দীনমুহাম্মদ, *মসনবীশরীফ*, অনুবাদ-মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী, প্রথমখন্ডের প্রথমার্ধ, ঢাকা : খায়রুনপ্রকাশনী, ২০০৮খ্রিঃ।

৪৪. রুমী (র), আল্লামাজালালুদ্দীন, *মছনবীশরীফ*, অনুবাদ- মাওলানামুজিবররহমান ও মাওলানা নুরুদ্দীন, ঢাকা : মীনাবুকহাউস, ২০০৮খ্রিঃ।

৪৫. রহমান, চৌধুরীশামসুর, *সুফিদর্শন*, ঢাকা : দিব্য প্রকাশন, ২০১২খ্রিঃ।

৪৬. রসুল, ড. মোহাম্মদ গোলাম, *সুফীতত্ত্বেরইতিকথা*, ঢাকা : জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৩খ্রিঃ।

৪৭.লাহিড়ী, দীপংকর, *বিলুপ্তজনপদ : প্রচলিতকাহিনী*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪খ্রিঃ।

৪৮. শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ, *দীওয়ান-ই-হাফিয*, ঢাকা : রেনেসাঁসপ্রিন্টার্স, ১৯৫৯খ্রিঃ।

৪৯. শাহেদী, মুহাম্মদ ঈসা, *ইরানেরবুলবুলহাফেজশিরাজী*, ঢাকা : ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণএকাডেমী, ১৯৯০খ্রিঃ।

৫০. শহীদুল্লাহ্, ড.মুহম্মদ, *বাঙ্গালা সাহিত্যেরইতিবৃত্ত*, ঢাকা : মাওলাব্রাদার্স, ১৯৯৯খ্রিঃ।

৫১. শূর, শিবপ্রসাদ, *সূফীজীবন দর্শন প্রেক্ষিতচট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম : মননপ্রকাশন, ২০১০খ্রিঃ।

৫২. শিরাযি, হা'ফেয, *দিভা'নেমাওলানাশাম্সউদ্দীন মোহাম্মদ*, ইরান : চা'পখা'নেমার্রভি, ১৩৬৬ হিজরীশামসি

৫৩. সাত্তার, আবদুস, *ফারসীসাহিত্যেও কালক্রম*,ঢাকা : ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ১৯৮৭খ্রিঃ।

৫৪. স্বপন, আানিসুররহমান, *বাংলাদেশ ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা :বুকভিউ, ১৯৯৫খ্রিঃ।

৫৫. সিরাজী, তারিকজিয়াউররহমান, হাফিজেরকবিতায়প্রকৃত ও রূপক প্রেমের স্বরূপসন্ধান, ঢাকা : দর্শন ও প্রগতি : ২১শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০০৪খ্রিঃ।

৫৬. সাঈদ, শামসুলআলম, *হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন,২০১২খ্রিঃ।

৫৭. সালমান, আবু, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০১ মুসলিমনীষী*, ঢাকা : সমাচার, ২০১৩খ্রিঃ।

৫৮. সিরাজী, ড. তারিকজিয়াউররহমান, *ইকবালকাব্যে মুসলিমমানস ও মানবতা*, ঢাকা : ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ২০১৩খ্রিঃ।

৫৯. সিরাজী, অধ্যাপক ড. তারিকজিয়াউররহমান, *ফারসিসাহিত্যেও ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : বাড পাবলিকেশন্স, ২০১৪খ্রিঃ।

৬০. সরকার, মোঃ সোলায়মানআলী, *ইবনুলআরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, ঢাকা : সদও প্রকাশনী, ২০১৪খ্রিঃ।

৬১. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *ইরান*, ঢাকা : বুক্কুশাহ্ ক্রিয়েটিভপাবলিশার্স, ২০১৪খ্রিঃ।

৬২. সাজা'দি দোকতোরজিয়াউদ্দিন, *মোকাদ্দোমেয়েবারমাবা'নিএরফান ও তাসাউফ*, ইরান; কোম, ১৩৭২ হিজরীশামসি

৬৩. সাফা', দোকতোরযাবিহ্ল্লাহ্, *ত'ারিখেআদাবিয়্যাত দার ইরান*, জেলদ সেভভোম- বাখ্শ দোভভোম, তেহরান : চা'পেদিবা, ১৩৯০ হিজরীশামসি

৬৪. হাফিজ, আবদুল, *হাফিজেরগযলগুচ্ছ*, ঢাকা : বাংলাএকাডেমী, ১৯৮৪খ্রিঃ।

৬৫. হক, ছৈয়দ আহমদুল, *মুরলীরবিলাপ*, চট্টগ্রাম : আল্লামা রুমী সোসাইটি, ১৯৯৬খ্রিঃ।

৬৬. হক, আলহাজ্ব ছৈয়দ আহমুদুল, *মসনবীশরীফেরপয়গাম ও তফসীরবাণী ও ভাষ্য*, চট্টগ্রাম : আল্লামা রুমী সোসাইটি,২০০৪খ্রিঃ।

৬৭. হাবিব, ইরফান, *সিন্ধুসভ্যতা*, কলকাতা : ন্যাশনালবুকএজেন্সিপ্রাইভেটলিমিটেড,২০০৭খ্রিঃ।

৬৮. হাযারী, *সূফীতত্তের আত্মকথা*, ঢাকা : নবরাগপ্রকাশনী, ২০০৮খ্রিঃ।

৬৯. হামিদ, ড. মোঃ আবদুল, ঢালী, ড. মুহাম্মদ আবদুলহাই, *মুসলিম দর্শনপরিচিতি*, ঢাকা : অনন্যাপ্রকাশনী, ২০১০খ্রিঃ।

৭০. হোসেন, কাজীআকরম, *দীউয়ান-ই-হাফিজ*, ঢাকা :সদও প্রকাশনী, ২০১২খ্রিঃ।

৭১. হালিম, মোঃআবদুল, *মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ*, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০১২খ্রিঃ।

৭২. হোসেন, ড. মো. শওকত, *আল-ফারাবী, ইমাম- আলগাযালী, ইবনে রুশ্দ*, ঢাকা : তিথি পাবলিকেশন, ২০১৩খ্রিঃ।

৭৩. হক, সৈয়দ শামসুল, *হাফিজেরকবিতাসরাইশরাবসাকি : তৃষিতের ঠোঁট*, ঢাকা : শুদ্ধস্বর, ২০১৪খ্রিঃ।

৭৪. হাদী, মোহাম্মদ আহসানুল, *ইরানেরআধুনিককবিমুহাম্মদ হোসাইনশাহ্রিয়ার*, ঢাকা : ইসলামি দর্শন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, ২০১৫খ্রিঃ।

৭৫. Arberry, A. J. *Classical Persian Literature,*London : George Allen and Unwin Ltd, 1958.

৭৬. Ahamad, Tanwir, *A Short History of Persian Literature*, Calcutta :Naaz book depot, 1991.

৭৭. Browne, Edward G. Browne, *A Literary History of Persia*, Volume- II, Cambridge : at the

University press, 1928.

৭৮. Browne, Edward G. ,*A Literary History of Persia*, Volume-I, Cambridge : at the University press, 1929.

৭৯. Browne, Edward G. ,*A Lliterary History of Persia*, Volume- III, Cambridge : at the University press 1929.

৮০. Lal, Joel Waiz, *An Introductory History of PersianLliterature*, Delhi :Atam Ram and sons.

৮১. Tamimdari, Ahmad, *A History of Persian Literature*, Translated by Ismail Salami, Tehran-Iran : The Center for International-Cultural Studies, 2002.

৮২.Wells, H. G. ,*A Short History of the World*, England : Pelican books, 1946.

যে সমস্তওয়েবসাইটেরসাহায্য নেওয়াহয়েছেতানিম্নরূপঃ

http: //books.google.com

http://www.hafizonlove.com

http://penlit.sailorsite.com

http://poemsintranslation.blogspot.com

Wikepedia